পৃথিবীর শেষ স্টেশন

পৃথিবীর শেষ স্টেশন

প্রফুল্ল রায়

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭

PRITHIBIR SESH STATION
A novel by PRAFULLA ROY.
Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College St. Mkt. Cal-7
INDIA.

প্রথম প্রকাশ
১৩৬৬

পরিবেশক ঃ
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩ (দ্বিতলে)

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

ISBN—81-7334 004-8

মুদ্রাকর ঃ
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

তপন রায়
স্নেহাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত

এই লেখকের অন্যান্য বই

আকাশের সীমা নেই

সসাগরা

হঠাৎ বসন্ত

কিন্নরী

মধ্যবর্তিনী

দীঘা থেকে লাক্সারি বাসে প্রথমে এসপ্ল্যানেড। সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে সাউথ ক্যালকাটার অনাথ পালিত রোডে সমরেশ যখন তাদের হাই-রাইজ বিল্ডিংটার সামনে এসে নামল, রাত খুব বেশি হয়নি। সবে সাতটা বেজে পাঁচ।

গরম কালের দিন লম্বা বলে, সন্ধ্যে নামতে বেশ দেরি হয়ে যায়। এই তো কিছুক্ষণ আগে উঁচু উঁচু বাড়ি, কারখানার চিমনি, এবং গাছপালা ইত্যাদি দিয়ে আঁকা হাওড়ার যে স্কাই-লাইন, তার ওধারে সূর্যটা ধীরে ধীরে ডুবে গেল। তারপর বড় জোর আধ ঘণ্টা কেটেছে। অন্ধকার এখনও তেমন গাঢ় হয়নি, কেমন যেন জলো কালির মতো কলকাতার ওপর ছড়িয়ে আছে। অবশ্য রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের আলো-গুলো জ্বলে উঠেছে, সেই সঙ্গে মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং আর বড় বড় শপিং কমপ্লেক্সের মাথায় দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের রঙিন নিওন সাইন।

সমরেশ একটা নাম-করা দৈনিক পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার। খুনী, ধর্ষণকারী, চোরাই চালানদার, ড্রাগের কারবারী, ওয়াগন-ব্রেকার, এদের পেছনে ঘুরে ঘুরে উত্তেজক 'স্টোরি' বার করাই তার কাজ। তা ছাড়া নানা আদালতে হানা দিয়ে বিভিন্ন টাইপের ক্রিমিন্যাল কেসের খবর তাকে যোগাড় করতে হয়। মোট কথা, এইসব গরগরে মশলা দিয়ে পাঠকদের জন্য রোজ তাকে কিছু সেনসেসানাল 'খাদ্য' তৈরি না করলেই নয়। গোগ্রাসে গেলার মতো খাবার না পেলে লোকে কাগজ কিনবে কেন? পত্রিকার চাহিদা বাড়াতে ঝাঁঝালো ক্রাইম রিপোর্টিংটা অব্যর্থ মুষ্টি-যোগ। সেই সঙ্গে সেক্সের ঝাঁজ মেশাতে পারলে তো কথাই নেই, কাগজ ব্ল্যাকে বিক্রি হবে।

ইদানীং সোসাইটিতে অপরাধ প্রবণতা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আজ একটা মার্ডার কেস পাওয়া গেল তো কাল দুটো রেপ ঘটে গেল, তার পরদিন হয়তো চারটে ডাকাতি কি ব্যাঙ্ক-লুঠ। এ ছাড়া কিডন্যাপিং, হাইওয়ে রবারি তো আকছার ঘটে চলেছে। ফলে ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই সমরেশের। এক-একদিন মারাত্মক কোনো ঘটনার খবর পেয়ে মাঝরাতে তাকে বেরিয়ে পড়তে হয়। আসলে দিনরাত ঊর্ধ্বশ্বাসে ক্রাইমের পেছনে ছুটছে সে।

অদৃশ্য এক জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে মাঝে মাঝেই হাঁপিয়ে ওঠে সমরেশ। মনে হয় দম আটকে আসছে। কাঁহাতক আর ক্রাইম ঘাঁটা যায়! পাঁচ-ছ' মাস পর পর তাই দিন পাঁচ-সাতেকের ছুটি নিয়ে সে কোথাও উধাও হয়ে যায়। মাথার ওপরকার প্রবল চাপ, শারীরিক ক্লান্তি এবং টেনসান কাটানোর জন্য এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ফিরে এসে অবশ্য ফের সেই জাঁতাকলে ঢুকে পড়তে হয়।

এ বছরের গোড়া থেকেই এমন একটার পর একটা খুন-জখম-ডাকাতি এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটে গেছে যে টানা সাত মাস ছুটি পায়নি সমরেশ। রবিবার তার অফ-ডে। কাজের চাপে সেদিনও তাকে বেরুতে হয়েছে।

আসলে ক্রাইম রিপোর্টিংয়ে দারুণ সুনাম সমরেশের। আজকাল তদন্তমূলক প্রতিবেদন বা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং বলে একটা কথা খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে। কোনো ঘটনার সাদামাঠা আলুনি বিবরণ পড়ে এখন আর পাঠক খুশি হয় না। ঘটনাটির ব্যাক-গ্রাউণ্ড হিস্ট্রি এবং কারা কিভাবে এর সঙ্গে জড়িত ইত্যাদি খুঁজে বার করে, নানা লোকের ইণ্টারভিউ নিয়ে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করা হয়।

কোনো মার্ডার কি রেপের ঘটনা ঘটলে সমরেশ ঝানু গোয়েন্দার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। নানা জায়গায় ছোটাছুটি করে খুঁটিনাটি যাবতীয় খবর যোগাড় করে। তারপর রিপোর্টটি নিখুঁত করে সাজায়। তার লেখার স্টাইল চমৎকার। ভাষার ওপর প্রচণ্ড দখল। পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হবে দমবন্ধ-করা রহস্য কাহিনী পড়ছে। সমরেশের মতো ক্রাইম রিপোর্টার সারা দেশে দু-চারজনের বেশি নেই। তার জন্যই যে তাদের কাগজের সার্কুলেসান অনেক বেড়ে গেছে, সেটা মানতেই হবে।

খবরের কাগজ যারা পড়ে তারা রোজই কিছু না কিছু সেনসেসান অর্থাৎ চাঞ্চল্যকর খবরের জন্য মুখিয়ে থাকে। সকালে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজের সেনসেসানটি না পেলে মনে হয় দিনটাই পানসে যাবে। কিন্তু এত সেনসেসান সমরেশ ছাড়া যোগাবে কে? তাই তাকে পারত-পক্ষে ছুটি নিতে দেওয়া হয় না। অবশ্য পাওনা ছুটি নিলে কার কী করবার থাকে! কিন্তু এডিটর এবং নিউজ এডিটর এমনভাবে অনুরোধ করেন যা এড়াতে পারে না সমরেশ। তা ছাড়া কাজটা সে ভালোবাসে। একবার কোনো ঘটনা পেয়ে গেলে প্রায় নেশার ঘোরে ছুটতে থাকে, তখন আর সময়ের হিসেব থাকে না। কত রাত না ঘুমিয়ে খবর যোগাড়

করতে চরকির মতো ঘুরে ঘুরে সে কাটিয়ে দেয় তার হিসেব নেই।

অন্যান্য বার একটানা পাঁচ-ছ'মাস কাজের পর সে ছুটি নিতে পারে। এবার তাকে আরো পরে ছাড়া হয়েছে।

সাত মাস বাদে দিন চারেকের ছুটি পেয়ে দীঘায় উধাও হয়ে গিয়েছিল সমরেশ। কলকাতার বাইরে কোথাও গেলে মাকে এবং সুচিত্রাকে ছাড়া আর কাউকে জানিয়ে যায় না। দু'জনকেই বলা আছে তারা যেন তার হদিস না দেয়। কলকাতা থেকে একবার বেরুলে কেউ তাকে ধরতে পারুক, এটা সে চায় না।

ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে একটা মাঝারি সাইজের সাফারি সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে সমরেশ। কোথাও বেরুলে এই সুটকেসটাই তার একমাত্র সঙ্গী। ওটার ভেতর খানকয়েক শার্ট আর ট্রাউজার্স ঢুকিয়ে নেয় শুধু। 'ট্র্যাভেল লাইট'—এ কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সে মেনে চলে। অকারণে জবড়জং বোঝা বাড়িয়ে কী লাভ!

সমরেশদের এই মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংটা আটতলা। ওদের ফ্ল্যাট সাত তলায়। সব মিলিয়ে এ বাড়িতে চব্বিশটা ফ্ল্যাট। কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি করে এই বাড়িটা করিয়েছে সমরেশরা।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ঢুকলেই মাঝামাঝি জায়গায় ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি। সেটার দু'ধারে দুটো লিফট। লিফট ছাড়াও নানা রকমের সুবিধা আছে এখানে। কলকাতায় যা লোডশেডিং, তাই জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা অঢেল জল। স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় উপকরণ এখানে মজুত।

সিঁড়ির ডান পাশের লিফটটা দরজা বন্ধ করে খানিকটা ওপরে উঠে গিয়েছিল। সমরেশকে দেখে লিফটম্যান তাড়াতাড়ি সেটা নামিয়ে এনে দরজা খুলে দেয়। সসম্ভ্রমে বলে, 'আসুন দাদা—'

লিফটম্যানের বয়স বেশি নয়, বড়জোর বাইশ-তেইশ। নেহাতই ছেলে-ছোকরা। দারুণ চটপটে, হাসিখুশি এবং চালাকচতুর। যথেষ্ট স্মার্টও। সমরেশ খবর নিয়ে জেনেছে, রীতিমত ভাল ঘরের ছেলে। নাম অজয়। লেখাপড়াও খানিকটা করেছে, স্কুল ফাইনাল পাশ। বি. এ, এম. এ'র ডিগ্রি পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। দুম করে বাবা মারা যাওয়ায় রোজগারের ধান্দায় বেরুতে হয়েছে। দু-তিন বছর ডালহৌসি পাড়ায় এ-অফিস সে-অফিসে ঘোরাঘুরি করে আর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ধরনা

দিয়ে যখন কিছুই করা গেল না তখন কিভাবে যেন সমরেশদের কো-অপারেটিভ সোসাইটির সেক্রেটারি চারুমাধব সেনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে যায়। চারুমাধব সোসাইটির সব মেম্বারের সঙ্গে কথা বলে তাকে লিফটম্যানের চাকরিটা দেন।

স্কুল ফাইনাল পাশ করে এরকম একটা চাকরি করতে হচ্ছে বলে অজয় কোনোরকম হীনমন্যতায় ভোগে না। বাজে কমপ্লেক্স নেই তার। যে কাজটা পেয়েছে তাতেই সে সন্তুষ্ট।

অজয় সম্পর্কে সোসাইটির মেম্বারদের আদৌ কোনো অভিযোগ নেই। সবার সঙ্গে সে সসম্ভ্রমে কথা বলে, বিনীত ব্যবহার করে। তবে সমরেশকে একটু বেশিই খাতির করে থাকে। এই বাড়তি খাতিরের কারণ সমরেশ খবরের কাগজের লোক। প্রায় রোজই তার নাম মাথায় নিয়ে চাঞ্চল্যকর সব রিপোর্ট বেরোয়। এই সব রিপোর্ট গোগ্রাসে গেলে অজয়। সে সমরেশের দুর্দান্ত ফ্যান।

এই সোসাইটির কাজের লোকেরা মেম্বারদের 'স্যার' কি 'ম্যাডাম' বলে থাকে। সমরেশ প্রথম দিনই বলে দিয়েছিল, তাকে যেন 'সমরেশদা' বলা হয়। অজয় তাতে অভিভূত।

সমরেশ ভেতরে ঢুকে যেতেই দরজা বন্ধ করে সুইচ টিপে দেয় অজয়। ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো একটানা আওয়াজ করে লিফট ওপরে উঠতে থাকে।

ভেতরে বিপুল চেহারার মিসেস পারেখ এবং রোগা ঢ্যাঙা মধ্যবয়সী রমেশ সামতানিকে দেখা যায়। মিসেস পারেখ গুজরাটি এবং সামতানি সিন্ধি। মিসেস পারেখের স্বামী বড় বিজনেসম্যান। পার্ক স্ট্রিটে ফ্রিজ, টিভি, টেপরেকর্ডার, ওয়াটার-কুলার ইত্যাদি নানা জিনিসের বিরাট শো-রুম তাঁর। আর নিউ মার্কেটে সামতানির ফ্যাশনেবল পোশাকের বিরাট দোকান।

মিসেস পারেখ এবং রমেশ সামতানি দু'জনেই পরিষ্কার বাংলায় বলেন, 'ভাল আছেন?'

অল্প হেসে সমরেশ বলে, 'হ্যাঁ। আপনারা?'

'চলে যাচ্ছে।'

এই হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ে শুধু বাঙালিরাই নেই। বাঙালি, পাঞ্জাবি, গুজরাতি, কোঙ্কনি, মাড়োয়ারি, তামিল, সিন্ধি—দেশের সব প্রভিন্সের মানুষ রয়েছে। একেবারে নিখিল ভারতীয় কসমোপলিটান পরিবেশ।

অবাঙালি যারা এখানে ফ্ল্যাট কিনেছেন তাঁরা দু-তিন পুরুষ ধরে এ শহরের বাসিন্দা। চমৎকার বাংলা বলেন, বিন্দুমাত্র জড়তা নেই।

মিসেস পারেখ বলেন, 'আপনার কাজ কেমন চলছে?' সমরেশ যে একজন নাম-করা ক্রাইম রিপোর্টার সেটা এ বাড়ির সবাই জানে।

সমরেশ মজার গলায় বলে, 'ফাইন। যতদিন ক্রাইম আছে আমার কাজ চুটিয়ে চলবে।'

সামতানি বলেন, 'আপনার প্রফেসানটা খুব থ্রিলিং মিস্টার মুখার্জি।'

সমরেশ হাসির একটা ভঙ্গি করে বলে, 'বলছেন?'

'সার্টেনলি। তবে রিস্কও আছে।'

সমরেশ উত্তর দেয় না।

এ বাড়ির কে কোন ফ্লোরে থাকে, অজয়ের সব মুখস্থ। চারতলায় আসতেই বোতাম টিপে লিফট থামিয়ে দেয় সে।

'আবার দেখা হবে—' বলে মিসেস পারেখ নেমে যান।

ফিফথ ফ্লোরে থাকেন সামতানি। তাঁকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে অজয় বলে, 'আপনি কি কলকাতায় ছিলেন না দাদা? ক'দিন দেখতে পাইনি।'

সমরেশ বলে, 'একটু বাইরে গিয়েছিলাম।'

আগ্রহে চোখ চকচক করতে থাকে অজয়ের। বলে, 'কোনো কেসের ব্যাপারে?'

সমরেশ বলে, 'না। স্রেফ বেড়াতে।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় অজয়ের। বলে, 'বিনয়দা আজ তিন বার আপনার খোঁজে এসেছিলেন।'

'কোন বিনয়দা?'

'ঐ যে আপনাদের অফিসের।'

প্রথমটা খেয়াল করতে পারেনি সমরেশ। এবার মনে পড়ে যায়। বিনয় তাদের কাগজের ট্রেনী সাব-এডিটর, মাস আটেক হল ঢুকেছে। খুব কাছেই থাকে। মাঝে মাঝে তাদের ফ্ল্যাটে আসে। হঠাৎ কী এমন হল যে তিন বার এসেছে! নিশ্চয়ই জরুরি কোনো ব্যাপার।

সমরেশদের ফ্ল্যাটে যারা আসে তাদের প্রায় সবাইকেই চেনে অজয়। নামও জানে। মোট কথা, সমরেশকে ঘিরে যাবতীয় ব্যাপারেই তার

অফুরন্ত কৌতূহল। বিনয় হঠাৎ কেন এতবার করে হানা দিল, সে সম্পর্কে অজয় কি কিছু জানে? সমরেশ একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে, কিন্তু একটু পরেই তো মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। তাঁর কাছ থেকেই সব জানা যাবে। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সে মাথা নাড়ে, 'ও, আচ্ছা।'

আর কিছু বলে না অজয়।

সমরেশ একবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি দেখেছ সুচিত্রা দিদিমণি আজ এসেছেন কিনা?'

অজয় ঘাড় হেলিয়ে জানায়, 'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই এসেছেন। আমিই ওপরে পৌঁছে দিয়েছিলাম। এখনও আছেন।'

একটা কাজের লোকের ভরসায় মাকে ফ্ল্যাটে রেখে ছুটিছাটায় কয়েক-দিনের জন্য বাইরে যায় সমরেশ। তা ছাড়া তার যা কাজ তাতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চারিদিকে ছুটতে হয়। ফলে মায়ের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা থেকেই যায়। অজয়কে বলা আছে, যখন সে থাকবে না তখন তাদের ফ্ল্যাটে কারা আসে যেন একটু নজর রাখে। ছেলেটা অত্যন্ত বিশ্বাসী, তার দায়িত্ববোধ যথেষ্ট। অজয়ের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে একটা মাছি গলার উপায় নেই।

লিফট আটতলায় পৌঁছে যায়।

দুই

সাত তলার সিঁড়ির ডান পাশের ফ্ল্যাটটা সমরেশদের। কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়ায় সুচিত্রা।

ঘাড় হেলিয়ে রগড়ের একটা ভঙ্গি করে সমরেশ বলে, 'গুড ইভনিং ম্যাডাম।'

সুচিত্রা উত্তর দেয় না। সমরেশের দিকে চোখ রেখে একধারে সামান্য সরে ভেতরে যাবার জায়গা করে দেয়। ধীরে ধীরে তার ভুরু কুঁচকে যেতে থাকে।

সুচিত্রার বয়স সাতাশ-আটাশ। কিন্তু চব্বিশ-পঁচিশের বেশি দেখায় না। গায়ের রং ফর্সাও না কালোও না, দুইয়ের মাঝামাঝি। টান টান

মসৃণ ত্বক। মুখ ডিম্বাকৃতি। কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা নরম সিল্কের মতো চুল। হাইট বেশ ভালই। ফ্যাশনেবল চশমার পেছনে উজ্জ্বল চোখ। নিভাঁজ গোল হাত দুটো সটান কাঁধ থেকে নেমে এসেছে।

আলাদা করে খুঁটিয়ে দেখলে নাক বা মুখের গড়নে কিছু খুঁত নিশ্চয়ই বার করা যাবে কিন্তু সুচিত্রার স্বাস্থ্য এমন চমৎকার যে এসব ত্রুটি চোখে পড়ে না।

দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়, সুচিত্রা ধীর স্থির এবং বুদ্ধিমতী। এক ধরনের ব্যক্তিত্বও রয়েছে তাকে ঘিরে। কিন্তু সে যে একজন দুর্ধর্ষ ল-ইয়ার, কোনো কেসে সওয়াল করতে উঠলে অভিজ্ঞ ঝানু জর্জদেরও যে নড়েচড়ে বসতে হয় সেটা কিন্তু তাকে দেখলে বোঝা যাবে না।

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সমরেশ বলে, 'আমার জন্যে চারটে দিন তোর ভীষণ কষ্ট হল। কোর্ট করে আবার এতদূর এসে মা'কে দেখাশোনা করা ঝামেলি খুব স্ট্রেন হয়—'

ভুরু আরো কুঁচকে যায় সুচিত্রার। মাথা অল্প হেলিয়ে সে বলে, 'কষ্ট আর স্ট্রেনটা এবার বুঝি নতুন হলো?'

সুচিত্রার কথার মধ্যে সূক্ষ্ম একটা খোঁচা ছিল। সমরেশ হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'সরি ম্যাডাম, মাফি মাংতা হ্যায়। আমার ভুল হয়ে গেছে। তোর ওপর আমি কতটা ডিপেণ্ড করি, নিশ্চয়ই বুঝিস। তোর কর্তব্যবোধ দায়িত্ববোধ—'

হাত তুলে সমরেশকে থামিয়ে দেয় সুচিত্রা, 'খুব হয়েছে। স্টপ।'

মুখ মুচকে হাসতে হাসতে সমরেশ বলে, 'ও কে, ও কে—'

আসলে সুচিত্রা সমরেশের বন্ধু। এক সঙ্গে তারা এম. এ এবং ল' পড়েছে। ল-এর ডিগ্রি নেবার পর সোজা কোর্টে গিয়ে বছর দুই একজন বিখ্যাত প্লিডারের জুনিয়র হিসেবে কাজ করেছিল সুচিত্রা। এক বছর হল সে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিশ করছে। মক্কেলদের সঙ্গে তার ব্যবহার ভাল, কোর্টে দাঁড়িয়ে যে কোনো কেস চমৎকার সওয়াল করে। তার চলা-ফেরায় এবং কথাবার্তায় রয়েছে শালীনতা এবং ব্যক্তিত্ব, টাকা-পয়সার খাঁই নেই, গরিবদের জন্য বিনা ফীতে সে মামলায় দাঁড়ায়, ইত্যাদি নানা কারণে তার পসার এবং খ্যাতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে।

ল' পাশ করার পর সমরেশ কিন্তু কোর্টে যায়নি। মামলা-মোকদ্দমা সওয়াল-জবাবের কচকচি তার ভালো লাগে না। বরাবরই তার ঝোঁক

সাংবাদিকতার দিকে। ল' কলেজ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রাইম রিপোর্টারের চাকুরিটা সে পেয়ে যায়। আইনের ডিগ্রি থাকায় এই ধরনের কাজে তার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে।

যুবক-যুবতীর বন্ধুত্ব নাকি দু'মাসের বেশি টেকে না। পুরনো উপমা দিয়ে বলা যায়, ওটা নাকি ঘি এবং আগুনের মতো ব্যাপার। দু' মাস পর বন্ধুত্ব উবে গিয়ে দৈহিক সম্পর্কটাই আসল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সমরেশ এবং সুচিত্রা বন্ধুত্বটা এখনও অটুট রাখতে পেরেছে, তার সঙ্গে অন্য কোনো খাদ মেশাতে দেয়নি। অন্তত বাইরে থেকে তা বোঝা যায় নি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় 'তুই' করে বলার অভ্যাস এখনও তারা বজায় রেখেছে। স্বাভাবিক নিয়মে কখনও সখনও তারা যে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েনি তা নয়। কিন্তু মুখ ফুটে এ নিয়ে কেউ কখনও কিছু বলেনি। তাদের মনের একটা বিশেষ দিক গাঢ় কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে।

সুচিত্রাদের বাড়ি লেক গার্ডেনসে। ছিমছাম ছোটখাটো ফ্যামিলি। বাবা, মা, একটা ছোট ভাই আর সে নিজে। বাবা বিরাট সরকারি অফিসার ছিলেন, বছর দেড়েক আগে রিটায়ার করেছেন। মা বারো মাস আর্থরাইটিস আর হাঁপানিতে ভোগেন। ছোট ভাই রাজু এ বছর ইংরেজিতে এম. এ পরীক্ষা দেবে। এদিকে বিধবা মা ছাড়া সমরেশের আর কেউ নেই।

দু বাড়িরই ইচ্ছা সমরেশের সঙ্গে সুচিত্রার বিয়েটা হয়ে যাক। এভাবে চিরকাল কাটে না। কিন্তু যাদের নিয়ে দু বাড়ির মা-বাবার এত চিন্তা-ভাবনা এত উৎকণ্ঠা তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত বন্ধুত্বের ওপরেই জোরটা বেশি দিচ্ছে।

যত দিন যাচ্ছে সুমিত্রা এবং সমরেশের পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা এবং বিশ্বাস বেড়েই চলেছে। নানা ধরনের ক্রাইম নিয়ে সমরেশের কাজ। সেই সূত্রে বহু কেস সে সুচিত্রাকে দেয়। কোনো জটিল ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের সময় চুল-চেরা আলোচনা করে সুচিত্রা তাকে সাহায্য করে। সমরেশও সুচিত্রার নানা মামলায় বিভিন্ন ল' জার্নাল আর আইনের বই ঘেঁটে ঘেঁটে তথ্য যুগিয়ে দেয়।

এ তো গেল প্রফেসানের ব্যাপার। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সব রকম সমস্যাতেই তারা পরস্পরের পরামর্শ নিয়ে থাকে। কোনো কেস নিয়ে

সুচিত্রা বাইরে গেলে সমরেশকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। অবশ্য এরকম ঘটনা একবারই ঘটেছে। এদিকে সমরেশ ছুটিছাটায় বাইরে গেলে তার মাকে দেখাশোনার দায়িত্ব নেয় সুচিত্রা। কোর্টের পর কয়েক ঘণ্টা সমরেশের ফ্ল্যাটে এসে কাটিয়ে যায়। সমরেশের মা হিরন্ময়ী বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাত্তিরে এখানে থেকেও যায় সে।

এদের সম্পর্কের কথা বন্ধু-বান্ধবরা সবাই জানে। সমরেশদের কাগজের ডেপুটি নিউজ এডিটর নিরঞ্জন বসাকের আদি বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরে। চল্লিশ বছর আগে দেশ ছেড়ে তারা এপারে চলে এসেছিল কিন্তু নিরঞ্জন এখনও জবরদস্ত ঢাকাইয়া ডায়ালগে কথা বলে। শুনলে মনে হবে, এইমাত্র সে বাংলাদেশ থেকে এপারে এসে নামল।

নিরঞ্জন একদিন বলেছিল, 'আর কতদিন 'প্ল্যাটোনিক কারবারটা চালাইবা চান্দু ?'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে সমরেশ বলেছে, 'প্লেটোনিক-টেটোনিক না, আমাদের সম্পর্কে স্রেফ বন্ধুত্বের। যেমন আপনার সঙ্গে আমার।'

'ছ্যামরা (ছোকরা) বানরামি (বাঁদরামি) মাইরো না। যুবক-যুবতীর মইধ্যে বন্ধুত্ব! সোনার পাথর বাটি! ফাতরামি না কইরা মালাবদলখান সাইরা ফেলাও। আমরা একদিন পুলাও কালিয়া খাই।'

এইভাবে চলে যাচ্ছে।

সমরেশ ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সুচিত্রা। দরজার পর ছোট একটা প্যাসেজ। তারপর প্রকাণ্ড হল। সেটা একসঙ্গে ডাইনিং কাম-সিটিং রুম। যে দিকটায় বসার জন্য সোফা-টোফা সাজানো রয়েছে সেখানে একটা উঁচু স্ট্যাণ্ডের ওপর কালার টিভি। আরেক দিকে ছোট নিচু টেবিলে রঙিন টেলিফোন।

ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ই, মোট পনের শ' স্কোয়ার ফিট। ডাইনিং-কাম-সিটিং হল'টার দু'ধারে তিনটে বড় বড় বেডরুম। সবগুলোর সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ আর ব্যালকনি। এ ছাড়া কিচেন, স্টোর ইত্যাদি তো আছেই।

কো-অপারেটিভ বলে ফ্ল্যাটটা বেশ সস্তাতেই পেয়েছিল সমরেশরা। ব্যাঙ্কে বাবার গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর এল. আই. সি'র কিছু টাকা ছিল। তার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের হাউস বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে ষাট হাজার টাকা লোন নিয়ে ফ্ল্যাটটা কিনেছে।

সুচিত্রার সঙ্গে প্যাসেজ পেরিয়ে হল-এ আসতেই সমরেশের চোখে পড়ল হিরন্ময়ী একটা সোফায় বসে আছেন, তাঁর কোলে রাজশেখর বসুর অনুবাদ করা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত। খানিক দূরে টিভি চলছে, তবে সেটার আওয়াজ কমানো। ওধারের রান্নাঘরে মাঝবয়সী কাজের মেয়ে লক্ষ্মী গ্যাসের উনুনে কিছু ভাজাভুজি করছে। তার ছ্যাঁকছোঁক শব্দ ভেসে আসছে।

সমরেশ গলা চড়িয়ে বলল, 'লক্ষ্মীদি, দু'কাপ চা—কুইক। গলার ভেতরটা একেবারে মরুভূমি হয়ে আছে।' হাতের সুটকেস একটা সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে মায়ের পাশে আরেকটা সোফায় বসে সে। ওদের মুখোমুখি সুচিত্রাও আস্তে আস্তে বসে পড়ে।

চার দিন পর ছেলেকে দেখে হিরন্ময়ীর চোখেমুখে খুশির আভা ফুটে বেরোয়। মানুষটি খুবই চাপা ধরনের। সুখ-দুঃখ শোক বা আনন্দ কোনো কিছুই সমারোহ করে হৈচৈ বাধিয়ে প্রকাশ করতে পারেন না। ধীরে ধীরে একটা হাত সমরেশের পিঠে রেখে গভীর স্নেহে বুলোতে বুলোতে বলেন, 'সেই যে গেলি, এর ভেতর না একটা চিঠি, না টেলিফোন। চিন্তায় ভাল করে ক'রাত ঘুমোতে পারিনি।' তাঁর কণ্ঠস্বর খুব নরম এবং মৃদু।

সমরেশ বলে, 'তুমি তো জানোই মা, চিঠি ফিঠি লিখতে আমার একদম ইচ্ছে করে না।· আর অফিসের কাজ ছাড়া টেলিফোন দেখলে গায়ে জ্বর আসে।' একটু থেমে বলে, 'এত চিন্তা করো কেন? তোমার ছেলে একজন ফেমাস জার্নালিস্ট। তেমন কিছু হলে ঠিক খবর পেয়ে যাবে।'

'আজেবাজে কথা বলতে হবে না। যে সব খুনে ডাকাত নিয়ে তোমার কাজ, আমার তো ভয়ই করে। রোজই কেউ না কেউ ফোনে শাসাচ্ছে।'

'মাথা থেকে এ সব চিন্তা টিন্তা বার করে দাও তো। ক'দিন ছিলাম না, তুমি কেমন আছ বল? রাতের ওষুধগুলো ঠিকমতো খেয়েছিলে?'

'না খেয়ে উপায় আছে!' সুচিত্রার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হিরন্ময়ী বলেন, 'রোজ পাঁচটায় কোর্ট থেকে এসে ওর প্রথম কাজটি হল আমাকে ওষুধ খাওয়ানো। ওকে ফাঁকি দেবার জো আছে! শুধু ওষুধ? নিজের হাতে গা ম্যাসাজ করা, চুল আঁচড়ে দেওয়া, কিছুক্ষণ সামনের পার্কে ঘুরিয়ে আনা, কী না করছে! তারপর সামনে বসে রাতের খাওয়া খাইয়ে তবে বাড়ি গেছে!'

'তোমার জন্যে একজন কড়া পাহারাদার জুটিয়েছি, কি বল মা?' সমরেশ মজার গলায় বলে।

হিরন্ময়ী বলেন, 'যা বলেছিস! পাহারাদারই বটে।'

এতক্ষণ চুপচাপ মা এবং ছেলেকে লক্ষ্য করছিল সুচিত্রা। এবার বলে, 'তুই এসে গেছিস। এবার আমার ছুটি। নিজের মায়ের দায়িত্ব বুঝে নে। তার আগে মা'কে যেমন রেখে গিয়েছিলি উনি তেমনটিই আছেন, না আমার হাতে পড়ে শরীর-টরীর খারাপ হয়ে গেছে, সেটি দেখে নাও।'

সমরেশ বলে, 'খুব হয়েছে। আর নকশাবাজি করতে হবে না।' মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে রগড় করার জন্য রকের ছোকরাদের মতো দু-একটা' মজাদার শব্দ লাগিয়ে দেয় সে। ফের বলে, 'তোর হাতে মা'কে পার্মানেণ্টলি তুলে দিতে পারলে আমার কোনো চিন্তা থাকত না।'

'পারবি তুই মাসিমাকে একেবারে দিয়ে দিতে? তা হ'লে কালই চল, কোর্টে গিয়ে রেজিষ্ট্রি করে নিই।'

ফি বারই ছুটিছাটা থেকে ফিরে এসে হিরন্ময়ীকে নিয়ে এরকম মজার টানাপোড়েন চলতে থাকে দু'জনের মধ্যে। সমরেশ কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হিরন্ময়ী সুচিত্রাকে বলেন, 'এই মেয়ে, তোরা কি 'তুই' 'তুই' করে বলিস! আমার শুনতে খুব খারাপ লাগে।'

হিরন্ময়ীর এই মৃদু বিরক্তি এবং ধমক নতুন কিছু না। দুটি অনাত্মীয় তরুণ-তরুণী পরস্পরকে 'তুই' করে বলবে, এটা তাঁর প্রাচীন রুচিতে বাধে। বার বার তিনি এটা শোধরাতে বলেছেন। কিন্তু দু'জনেই জানিয়েছে, অনেক দিনের অভ্যাস, দুম করে ওটা পাল্টানো যায় না। আজও হেসে সেই পুরনো উত্তরটাই দেয় সুচিত্রা।

হিরন্ময়ী এবার রেগে যান। কিন্তু তাঁর স্বভাবের মতোই রাগের প্রকাশও ভারি নরম। তিনি বলেন, 'অনেক দিন হয়ে গেছে, আর 'তুই' 'তুই' নয়। যেভাবে তোমরা চলছ, সেটা ঠিক না। এবার বিয়েটা করে ফেল।'

লক্ষ্মী চা দিয়ে গিয়েছিল। কাপে আলতো চুমুক দিয়ে সুচিত্রা অবাক হবার ভঙ্গি করে বলে, 'কী বলছেন মাসিমা! যাকে 'তুই' করে বলি সে আমার স্বামী হবে কেমন করে!' হেসে হেসে সমরেশের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'কিরে, স্বামী হতে পারবি?'

সমরেশ জোরে জোরে প্রবল উচ্ছ্বাসে হাসতে থাকে।

হিরন্ময়ী এবার বেশ ক্ষুব্ধই হন, 'তোমাদের একালের ছেলেমেয়েদের কিছুই বুঝতে পারি না বাপু। কী যে মতিগতি!'

সমরেশের হাসির তোড় একসময় থামে। আর তখনই কিছু মনে পড়ে যায় তার। হিরন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'লিফটে ওঠার সময় অজয় বলছিল, আমাদের অফিসের বিনয় নাকি আজ তিন বার এসেছে!'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।' হিরন্ময়ী হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন, 'ও বলল, খুব জরুরি কাজ আছে। ফিরে এসেই তোকে অফিসে ফোন করতে বলেছে।'

সমরেশ কিন্তু খুব একটা ব্যস্ততা দেখায় না। বলে, 'ঠিক আছে, পরে করব'খন।' আসলে আজ পর্যন্ত তার ছুটি। এইমাত্র ফিরে এসেই অফিসের কোনো ঝঞ্ঝাটে সে জড়িয়ে পড়তে চায় না।

হিরন্ময়ীর আরো কিছু মনে পড়ে যায়। তিনি বলেন. 'বিকেলে, সুচিত্রা আসার আগে তাপস ফোন করেছিল।'

তাপস এখানকার থানার ও. সি.। সরাসরি ক্রাইম ওয়ার্ল্ডের মূল ঘাঁটিতে সে বসে আছে। তার কাছ থেকে রিপোর্টিংয়ের জন্য নানা খবর পায় সমরেশ। নিজের গরজেই তাপসের সঙ্গে আলাপ করেছিল সে। দু'জনে প্রায় সমবয়সী। নিয়মিত যোগাযোগ রাখার কারনে খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সমরেশ যেমন প্রায়ই থানায় যায় তেমনি তাপসও মাসে দু-একবার তাদের ফ্ল্যাটে আসে। সৎ, পরিশ্রমী এবং সাহসী অফিসার হিসেবে তার দারুণ সুনাম। পুলিশকে নানারকম অদৃশ্য চাপের মধ্যে থাকতে হয়। কিন্তু তাপস কোনো কিছুর কাছেই এখনও পর্যন্ত মাথা নোয়ায়নি। মাঝে মাঝে এমন সব কাজ তাকে করতে হয় যাতে মারাত্মক ঝুঁকি থেকে যায়। বন্ধু হিসেবে সে চমৎকার—আমুদে, মিশুকে এবং টগবগে। হিরন্ময়ী তাকে খুব পছন্দ করেন।

অফিসের ব্যাপারে তেমন গরজ না দেখালেও এবার কিন্তু সমরেশের পক্ষে ততটা নিরাসক্ত থাকা সম্ভব হয় না। আড্ডা টাড্ডা দিতে হলে তাপস সোজা এখানে চলে আসে। চাঞ্চল্যকর কোনো খবর থাকলে তবেই সে ফোন করে।

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'তাপস কেন ফোন করেছে, জানো?'

হিরন্ময়ী বলেন, 'না। বলেছে আটটার পর আবার ফোন করবে।'

এ প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করে না সমরেশ। বাকি চা এক চুমুকে

শেষ করে বলে, 'ধুলোয় আর ঘামে গা চটচট করছে। স্নানটা না করলে বিশ্রী লাগছে।' হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সে, সুচিত্রার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুই হুট করে চলে যাস না। আমি স্নানটা করে আসি। ওনলি টেন মিনিটস ম্যাডাম।'

সুচিত্রা কিছু বলে না, হাসির একটি ভঙ্গি করে শুধু।

স্নান সেরে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি পরে আবার সমরেশ যখন হল-এ চলে এল, টিভিতে বাংলা খবর শুরু হয়েছে। টিভির আওয়াজ কমিয়ে দেওয়া ছিল। সমরেশ সুচিত্রাকে বলে, 'সাউন্ডটা একটু বাড়িয়ে দে তো। চার দিন নিউজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। দেশের হালচালটা একটু জেনে নেওয়া যাক।'

চাবি ঘুরিয়ে আওয়াজ বাড়িয়ে দেয় সুচিত্রা। স্মার্ট, ঝকঝকে চেহারার একটি তরুণী খবর পড়ছে। তার উচ্চারণ পরিষ্কার, কোথাও এতটুকু জড়তা নেই। খবরের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আবেগ বা নিরাসক্তি মিশিয়ে কণ্ঠস্বরকে সে নামাতে বা উঁচুতে তুলতে পারে। পড়ার ভঙ্গীটি চমৎকার। তাড়াহুড়ো নেই, সঠিক জায়গায় থেমে, ধীরে ধীরে সে পড়ে যায়।

প্রথম দিকে নতুন কোনো খবর ছিল না। ইদানীং কিছুকাল ধরে যা যা ঘটে চলেছে আজকের তালিকায় প্রায় সেই সব ঘটনাই রয়েছে। পাঞ্জাবে চার জন উগ্রপন্থী সমেত এগার জন খুন, শ্রীলঙ্কার জাতিদাঙ্গায় তিরিশ জনের প্রাণহানি, ত্রিপুরায় চাকমা উদ্বাস্তুদের আগমন অব্যাহত, ফিলিপাইনসে ঘূর্ণিঝড়ে দেড়শ' উপকূলবাসীর মৃত্যু, বরো ছাত্রদের ডাকে অসমে একশ কুড়ি ঘণ্টা অসম বন্ধ ইত্যাদি সংবাদের পর হঠাৎ গলার স্বর ভারী করে মেয়েটি পড়তে থাকে, বিশিষ্ট সমাজসেবী নিশানাথ সামন্ত আজ দুপুরে তাঁর বাসভবনে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ চলছে। আততায়ী একজন মহিলা। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এখন সে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।'

সমরেশ ভীষণ হকচকিয়ে যায়। হিরন্ময়ী এবং সুচিত্রাও চমকে ওঠে। কেননা, নিশানাথ সামন্ত একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর সুনাম শুধু ও শহরেই না, সারা দেশ জুড়ে। তিনি অজাতশত্রু, পরোপকারী এবং হৃদয়বান। বহু জনসেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। দেশের মানুষের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি বা ইমেজ খুবই উজ্জ্বল, সবাই তাঁকে

শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

সমরেশের সঙ্গে নিশানাথের ভালই আলাপ রয়েছে। তিনি তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। সমরেশের এই ফ্ল্যাটে কয়েক বার এসেছেন। তাঁর ব্যবহারে কথাবার্তায় হিরন্ময়ী মুগ্ধ। সুচিত্রার সঙ্গেও এখানেই পরিচয় হয়েছিল। তার ধারণা এমন ভদ্র সহৃদয় মানুষ খুব কম চোখে পড়ে।

সংবাদ-পাঠিকা নিশানাথের গুলিবিদ্ধ হওয়ার সংবাদের পর আরো অনেক খবর পড়ে যায়। কিন্তু সেসব কিছুই মাথায় ঢুকছে না সমরেশের। টিভি'র স্ক্রিনটাও চোখের সামনে যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। নিশানাথের মতো আদর্শবাদী একজন সমাজসেবীর ওপর কেউ গুলি চালাতে পারে, এটা ভাবা যায় না। আক্রমণকারী মেয়েমানুষটি কি উন্মাদ? নিশানাথের ওপর তার এই আক্রোশ কেন? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাথার ভেতর খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত একটা চাকা ঘুরে যাচ্ছে যেন।

খবর পড়া হয়ে গিয়েছিল। এবার অন্য একটা ঘোষিকা নিরুদ্দেশ সম্পর্কে খবর জানিয়ে দিচ্ছে। এক-একজনের নাম-ধাম ইত্যাদি জানাবার সঙ্গে সঙ্গে টিভির পর্দায় তার ছবি ফুটে উঠছে।

কিছুই ভাল লাগছিল না সমরেশের। সে বলে, 'সুচিত্রা, টিভি'টা বন্ধ করে দে তো।'

হল-ঘরে বিষাদ নেমে এসেছিল। এমন একজন মানুষের ওপর অভাবনীয় আক্রমণ এবং তাঁর এমন নিষ্ঠুরভাবে জখম হওয়ার ঘটনা সবাইকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছে।

সুচিত্রা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দেয়।

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বিষণ্ণ মুখে হিরন্ময়ী বলেন, 'এমন মানুষেরও শত্রু থাকে!'

সুচিত্রা ফিরে এসে সোফায় বসতে বসতে বলে, 'আমাদের সোসাইটিতে ভালো কাজ করার কোনো দাম নেই। নিশানাথবাবুকে যে গুলি করতে পারে সে যে কী জঘন্য টাইপের ক্রিমিন্যাল, ভাবতে পারি না।'

সমরেশ কিছু বলে না। দীঘায় যাবার দুদিন আগে নিশানাথবাবুর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন, গরীবদের জন্য একটা হাসপাতাল বানাবেন। অনেক জায়গা থেকে 'ডোনেশান'-এর প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। একজন এর জন্য বেশ খানিকটা জমি দিতে চেয়েছেন। নিশানাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, ফ্রাঙ্কফুর্ট বা দুবাইতে যে

সব অনাবাসী ভারতীয় অর্থাৎ নন-রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান আছেন তাঁদের অনেকের কাছ থেকে ভালরকম সাহায্য পাবেন।

দেশের সীমানা ছাড়িয়ে নিশানাথের খ্যাতি নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! বিদেশে যে সব ভারতীয় রয়েছেন তাঁদের কারো কারো বিশ্বাস, নিশানাথকে টাকা দিলে ভাল কাজেই খরচ করা হবে।

সুচিত্রা বলে, 'এই টাইপের ক্রিমিন্যাল মেয়েদের ফাঁসি হওয়া উচিত।'

বোঝা যায়, আততায়ী মহিলাটির সম্পর্কে বলছে সুচিত্রা। কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ সমরেশের মনে হয়, বিনয় যে তিনবার এই ফ্ল্যাটে এসেছে এবং তাপস থানা থেকে ফোন করেছে তার কারণ নিশ্চয়ই নিশানাথকে গুলি করে জখম করার এই মারাত্মক ঘটনাটি।

এমন ঘটনা ক্বচিৎ কখনও পাওয়া যায়। সমরেশের ভেতরকার দুর্দান্ত ক্রাইম রিপোর্টারটি একটানে তাকে সোফা থেকে দাঁড় করিয়ে দেয়। আগে অফিসে, তারপর তাপসকে ফোন করা দরকার। আক্রমণকারী মেয়েটি কোন থানায় এবং নিশানাথ কোন হাসপাতালে রয়েছেন তার খোঁজ নিয়ে এখনই তাকে বেড়িয়ে পড়তে হবে।

রুদ্ধশ্বাসে সমরেশ যখন হল-এর এক কোণে টেলিফোন স্ট্যান্ডটার দিকে পা বাড়াতে যাবে, ফোনও তার আগেই বেজে ওঠে। সে প্রায় দৌড়ে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে বলে, 'হ্যালো—'

লাইনের ওধার থেকে ভবতোষ সমাদ্দারের গলা ভেসে আসে, 'হ্যালো, কে? সমরেশ?' ভবতোষ সমরেশদের কাগজের নিউজ এডিটর। তাঁর ওপর সেনসেশানাল কোনো ঘটনা ঘটে গেলে তাঁর মানসিক চাপ এতই বেড়ে যায় যে মনে হয়, স্ট্রোক হয়ে যাবে।

সমরেশ বলে, 'হ্যাঁ, ভবতোষদা।'

'কখন ফিরলে?'

'এই কিছুক্ষণ আগে।'

'তুমি আজ না ফিরলে, কী যে করতাম, ভেবে উঠতে পারছি না। জানো, তিনবার বিনয়কে তোমার ফ্ল্যাটে পাঠিয়েছি।'

'খবর পেয়েছি।'

'জানো এদিকে কী কাণ্ড হয়েছে?'

'এইমাত্র টিভিতে শুনলাম। নিশানাথবাবুর ব্যাপারটা তো?'

'হ্যাঁ। শোনার পরও আমাকে কনট্যাক্ট করোনি?'

'করতে যাচ্ছিলাম। তখনই আপনার ফোনটা এল।'

সমরেশ টের পায়, সে ফিরে আসায় ভবতোষের টেনসান অনেকটা কেটে গেছে। তিনি বলেন, 'তোমার এই এক বদভ্যাস, ছুটি নিয়ে কোথাও গেলে জানিয়ে যাও না। তাই না ফিরলে কী করে তোমাকে ধরতাম বল তো?' একটু দম নিয়ে বলেন, সে যাক। কেসটা তোমাকেই ভাই হ্যাণ্ডেল করতে হবে। কাল ফার্স্ট পেজ নিউজ করা দরকার। ভেতরকার কিছু স্টোরি চাই। আই ওয়াণ্ট চটক—সেনসেশান।

সমরেশ বলে, 'টিভিতে বললে, দুপুরে ঘটনাটা ঘটেছে।'

'হ্যাঁ। তাই তো।

'কাউকে পাঠাননি?'

'রাজনকে পাঠিয়েছিলাম। মোটামুটি খবর এনেছে, কিন্তু তাতে হবে না। অন্য মালমশলা চাই। বুঝতে পারছ, আমি কী "মীন" করছি?'

'তা পারছি।'

'নিশ্চয়ই তুমি খুব টায়ার্ড। কিন্তু ব্রাদার, সমরেশ মুখার্জী ছাড়া আমার যে গতি নেই। আর কেউ ইনসাইড স্টোরি বের করে আনতে পারবে না। তা ছাড়া সেটা একটা চ্যালেঞ্জ। তুমি ছাড়া সে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করার মতো আর কোনো ক্রাইম রিপোর্টার কলকাতায় আছে বলে আমার জানা নেই।'

'খুব তোল্লাই দিচ্ছেন ভবতোষদা।'

'না রে ভাই, না। ট্রুথ ইজ ট্রুথ। তুমি ব্রাদার স্টার্ট করে দাও। আমি প্রেসকে বলে রাখছি, তোমার কপি পেতে দেরি হবে। ম্যাটার পাওয়া মাত্র কম্পোজ করে দেবে। কখন তোমাকে এক্সপেক্ট করব?'

'কাজই তো শুরু করিনি। আগে খোঁজখবর নিই, মেটিরিয়াল জোগাড় করি, তারপর তো কপি। আরে, আসল কথাটাই জানা হয়নি। নিশানাথবাবু কোন হাসপাতালে রয়েছেন?

'সাউথ ক্যালকাটা হাসপাতালে!'

'আমাদের বাড়ির কাছেই। ঠিক আছে, ওখানেই প্রথম হানা দিচ্ছি। আর ঐ মহিলা, যে গুলি চালিয়েছে?'

'সে থানায় আছে।'

'কোন থানায়?'

'এক মিনিট ধরো। রাজেনকে জিজ্ঞেস করে জানিয়ে দিচ্ছি।'

সমরেশ টেলিফোনটা ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে ভবতোষের গলা আবার ভেসে আসে। বিপন্নভাবে বলেন, 'এই তো রিপোর্টারদের টেবিলে ছিল। এখন দেখতে পাচ্ছি না। ভারি ফ্যাসাদে ফেলে দিলে। আরেকটু ধরো ভাই, ক্যানটিনে কাউকে পাঠিয়ে দেখি ওখানে আছে কিনা।'

সমরেশ বলল, 'দরকার নেই ভবতোষদা। লালবাজারে ফোন করে থানাটা জেনে নিচ্ছি। আপনার কাছাকাছি কোনো ফোটোগ্রাফার আছে?'

'ভাস্কর আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কেন?'

'ওকে ক্যামেরা নিয়ে সাউথ ক্যালকাটা হাসপাতালের মেইন গেটে চলে যেতে বলুন। ওখানে যেন আমার জন্যে ওয়েট করে।'

'এক্ষুণি বলে দিচ্ছি।'

লাইনটা কেটে দিতে দিতে সমরেশের মনে হয় নিশ্চয়ই নিশানাথের ব্যাপারে ফোন করেছিল তাপস। হিরন্ময়ীকে সে জানিয়ে দিয়েছে, আটটার পর আবার ফোন করবে। আটটা বাজতে যদিও খুব বেশি বাকি নেই, তবু তার জন্য আর অপেক্ষা করে না সমরেশ। ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাপসকে ধরে ফেলে।

তাপস বলে, 'যাক, তুমি এসে গেছ। কোথায় ডুব দিয়েছিলে?'

সমরেশ জানিয়ে দেয় কোথায় গিয়েছিল। বলে, 'ফোন করেছিলে কেন?'

'এই তোমার এক ব্যাড হ্যাবিট, কোথাও গেলে কাউকে জানিয়ে যাও না। এদিকে কী কাণ্ড হয়েছে শুনেছ?'

'শুনেছি। নিশানাথবাবুকে একটি মহিলা গুলি করেছে?'

'আর সেই মহিলাটি এখন আমার থানাতে রয়েছে। হাজতে পুরে রেখেছি। এক্ষুণি চলে এসো।'

'আমি কিন্তু মহিলাটিকে এক্সক্লুসিভ ইণ্টারভিউ করতে চাই।'

'চলে তো এসো, তারপর দেখা যাবে।'

অস্থিরভাবে সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'আর কেউ মহিলার সঙ্গে দেখা করেছে?' ইঙ্গিতটা পরিষ্কার সে জানতে চায়, অন্য কোনো কাগজের লোক মহিলার সঙ্গে দেখা করে কিছু চাঞ্চল্যকর ব্যাকগ্রাউণ্ড স্টোরি বের করে নিয়ে গেছে কিনা। তা হলে সমরেশ যে রিপোর্ট করবে তার চমক এবং আকর্ষণ অনেক কমে যাবে। কেননা একই 'ইনসাইড স্টোরি' যদি

সব কাগজে বেরোয় তাদের কাগজ সম্পর্কে আলাদা আগ্রহ থাকবে না পাঠকের। ক্রাইম রিপোর্টিংয়ে তাদের পত্রিকার যে আলাদা একটা সুনাম রয়েছে সেটাও আর ধরে রাখা যাবে না।

তাপস বলে, 'টেলিফোনে আমি কিছু বলব না। লাইন ছেড়ে দিলাম। আধ ঘণ্টার ভেতর তোমাকে এক্সপেক্ট করছি।'

সমরেশ বুঝতে পারে, এখন পর্যন্ত মহিলার সঙ্গে কাউকেই দেখা করতে দেয়নি তাপস। সে বলে, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে যেতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না। আগে হাসপাতালে গিয়ে নিশানাথবাবুর সঙ্গে দেখা করব। ওখানে কতক্ষণ লাগবে বুঝতে পারছি না। যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসছি।' লাইনটা নামিয়ে রেখে হিরন্ময়ীকে বলে, 'মা, আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে।'

সমরেশের কাজটা কী ধরনের, হিরন্ময়ী তা জানেন। কাগজে ঢোকার পর গোড়ার দিকে হঠাৎ হঠাৎ এভাবে বেরিয়ে যাবার জন্য ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়তেন। আজকাল অনেকটা সয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'সে তো বুঝতেই পারছি। খেয়ে যা।'

পোশাক বদলাবার জন্য হল্-এর ডান দিকে নিজের ঘরে যেতে যেতে সমরেশ বলে, 'এখন আর খাওয়ার সময় নেই।'

'কখন ফিরবি ?'

'তার কি কিছু ঠিক আছে ? এখন হাসপাতালে আর থানায় যাব। দু' জায়গায় কী খবর পেয়ে আবার কোথায় ছুটতে হবে, কে জানে। দেড়টা দুটোর আগে ফিরতে পারব বলে মনে হয় না।'

নিজের ঘরে ঢুকে গিয়েছিল সমরেশ। পাজামা-পাঞ্জাবি পালটে জীনসের প্যান্ট আর শার্ট পরে, নোটবুক এবং ডটপেন পকেটে গুঁজে বেরিয়ে এসে বলে, 'আমার জন্যে বসে থেক না মা। তোমরা খেয়ে নিও। খুব বেশি রাত হয়ে গেলে আমি না-ও ফিরতে পারি। অফিসেই থেকে যাব।'

সুচিত্রা বলে, 'আটটা বেজে গেছে। এবার বাড়ি ফিরব। চল, তোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে নেব।' হিরন্ময়ীর উদ্দেশে বলে, 'আজ চলি মাসিমা। কাল কোর্টের পর আবার আসব।'

সমরেশ বলে, 'তুই আরেকটু থেকে যা না। একেবারে খেয়ে-দেয়ে দশটা নাগাদ যাস।'

'আজ আর থাকতে পারব না। কাল একটা ডাকাতির কেস আছে। কেস হিস্ট্রি ভাল করে পড়া হয়নি। রাত জেগে পড়ে নোট তৈরি করতে হবে।'

'তা হলে আর তোকে আটকানো যাবে না। চল—'

দু'জনে বেরিয়ে পড়ে। অজয় লিফটে করে তাদের নীচে নামাতে নামাতে বলে, 'দাদা, চার দিন পর এই তো সবে ফিরলেন। আবার এখনই বেরুচ্ছেন।' সে বেশ অবাক হয়ে গেছে।

উত্তর না দিয়ে সমরেশ অল্প হাসে।

লিফটে সুচিত্রা আর সমরেশ ছাড়া অন্য কেউ নেই। তবু গলা নামিয়ে এবার অজয় জিজ্ঞেস করে, 'কোনো জরুরি কেস আছে নাকি দাদা?'

সমরেশ আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়। বলে 'হুঁ—'

'তাহলে কাল সকালে দারুণ একটা খবর থাকছে, কি বলেন?' উৎসাহে এবং উত্তেজনায় অজয়ের চোখ চকচক করতে থাকে।

সমরেশ সংক্ষেপে বলে, 'দেখা যাক।'

'দাদা কেসটা কী? মার্ডার, না ব্যাঙ্ক ডাকাতি?

'কাল কাগজে দেখতে পাবে।'

কৌতূহলের সীমা কতদূর পর্যন্ত হওয়া উচিত অজয় তা জানে। সে আর কোনো প্রশ্ন করে না।

লিফট থেকে বাইরের রাস্তায় আসতেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। সমরেশ বলে, 'উঠে পড়। তোকে লেক গার্ডেনসে নামিয়ে দিয়ে আমি হাসপাতালে যাব।'

'না না, তোর আর দেরি করা ঠিক হবে না। লেক গার্ডেনসে যেতে অনেকটা সময় লেগে যাবে। তুই স্ট্রেট হাসপাতালে চলে যা। দু-চার মিনিট দাঁড়ালেই আমি ট্যাক্সি পেয়ে যাব।'

ঠিকই বলেছে সুমিত্রা। লেক গার্ডেনস ঘুরে হাসপাতালে পৌঁছতে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে যাবে। নষ্ট করার মতো যথেষ্ট সময় এখন সমরেশের হাতে নেই। হাসপাতালে কাজ চুকিয়ে তাকে ছুটতে হবে থানায়। সেখান থেকে অফিস। তারপর রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। ট্যাক্সিতে উঠে দরজা বন্ধ করতে করতে সমরেশ বলে, 'ঠিক আছে।'

সুচিত্রা বলে 'কী খবর-টবর পেলি, ফোন করে আমাকে জানাস।'

'বারোটা নাগাদ ফোন করব।'

'আচ্ছা।'

তিন

ট্যাক্সি সাউথ ক্যালকাটা হসপিটালের মেন গেটে এসে থামতেই ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ে সমরেশ। তখনই তার চোখে পড়ে, একধারে ক্যামেরা-সুদ্ধ ঢাউস ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভাস্কর। সমরেশকে দেখে সে এগিয়ে আসে।

ভাস্করের বয়স তেইশ-চব্বিশ। ধারাল পাতলা চেহারা। গায়ের রং একসময় টকটকে ছিল, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে তামাটে হয়ে গেছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গালে দাড়ি। ওকে দেখলে যিশুখ্রিস্টের কথা মনে পড়ে যায়।

বছরখানেক হলো ভাস্কর সমরেশদের কাগজে ঢুকেছে। এর মধ্যেই ফোটো জার্নালিস্ট হিসেবে তার বেশ নাম হয়েছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অ্যান্টি-সোসালদের বোমাবাজি, পুলিশের সঙ্গে ওয়াগনব্রেকারদের বন্দুকের লড়াই, ইত্যাদি নানা মারাত্মক ঘটনার সময় দারুণ ঝুঁকি নিয়ে সে দুঃসাহসিক সব ছবি তুলেছে। বারকয়েক বুলেট আর বোমা লাগতে লাগতে কোনোরকমে বেঁচে গেছে। কাজ ছাড়া ছোকরার মাথায় অন্য কিছু একেবারেই ঢোকে না। দুর্দান্ত কোনো ছবির জন্য ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত কলকাতার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ায় ভাস্কর। স্বভাবের দিক থেকে সমরেশের সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে। ঝুঁকি না নিতে পারলে ভাল ফোটো-জার্নালিস্ট হওয়া যায় না।

সমরেশ বলে, 'কখন এসেছ?'

ভাস্কর বলে, 'মিনিট দশেক।'

'তাহলে বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখিনি। এসো।'

হাসপাতালের কমপাউণ্ডে একটা কালো পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন আর্মড পুলিশকেও দেখা গেল।

পাশাপাশি চলতে চলতে সমরেশ বলে, নিশানাথবাবুকে নিশ্চয়ই এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে, তাই না?'

ভাস্কর বলে, 'ঠিক জানি না সমরেশদা। এতক্ষণ আপনার জন্যে গেটের কাছে ওয়েট করছিলাম। ভেতরে ঢুকে খোঁজ নিইনি।'

'চল, আগে এমার্জেন্সিতেই যাওয়া যাক।'

এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টটা গ্রাউন্ড ফ্লোরের শেষ মাথায়। সেখানে আসতেই দেখা গেল ডাক্তার শুভাশিস দত্ত তাঁর চেম্বারে বসে পুলিশ অফিসার মনোজিৎ সাহার সঙ্গে কথা বলছেন। চেম্বারের বাইরে দু'জন আমর্ড গার্ড হাতে রাইফেল নিয়ে টান টান দাঁড়িয়ে আছে।

চেম্বারের একটা পাল্লা খোলা। শুভাশিস দত্ত সমরেশকে দেখতে পেয়েছিলেন। হাত তুলে বলেন, 'আসুন, আসুন।'

শুভাশিস এবং মনোজিতের সঙ্গে সমরেশের বেশ ঘনিষ্ঠতাই রয়েছে। দু'জনেই অবশ্য তার চেয়ে বয়সে বড়। শুভাশিস পঞ্চাশের কাছাকাছি। মনোজিৎ তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ। শুভাশিসের হাইট ছ' ফিটের ওপরে, রগের কাছে চুল পাকতে শুরু করেছে, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মনোজিতের হাইট অতটা নয়। গায়ের রং তামাটে, চওড়া কপাল। শুভাশিসের মতো অবশ্য তার চোখে চশমা নেই। দু'জনেরই পেটানো মজবুত স্বাস্থ্য। সমরেশের যে ধরনের কাজ, তাতে হাসপাতালের ডাক্তার এবং পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতেই হয়।

ভাস্করকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে চেম্বারের ভেতর চলে আসে সমরেশ। বড় গ্লাস-টপ টেবলের দু'ধারে মুখোমুখি বসে আছেন শুভাশিস আর মনোজিৎ। সমরেশ মনোজিতের পাশে বসে পড়ে।

শুভাশিস বলেন, 'এত দেরিতে যে? নিশানাথবাবু উণ্ডেড হয়েছেন দুপুরে। এর মধ্যে সব নিউজপেপার থেকে দশ বার করে রিপোর্টাররা হানা দিয়ে গেছে। দশ মিনিট পর পর ফোন করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে অথচ আপনার পাত্তা নেই। কোথায় ছিলেন?'

সমরেশ জানায়, সে কলকাতার বাইরে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে ফিরে নিশানাথের খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছে।

শুভাশিস বলেন, 'ও, তাই—'

মনোজিৎ পাশ থেকে বলে ওঠেন, 'আমারও একবার মনে হয়েছিল, সমরেশবাবুকে দেখছি না কেন?'

সমরেশ বলে, 'আপনাদের দু'জনকে একসঙ্গে পেয়ে ভালো হলো। আগে বলুন নিশানাথবাবুর খবরটা আপনারা কখন পান?'

মনোজিৎ জানান, তাঁরাই খবরটা আগে পেয়েছেন। বেলা দুটো নাগাদ নিশানাথ সামন্তর ভাইপো লালবাজারে ফোন করে বলে, একটি মহিলা তাঁকে গুলি করে মারাত্মক জখম করেছে। খবরটা পেয়েই লোকাল

থানায় জানিয়ে দেন মনোজিৎ। নিজেও তক্ষুণি নিশানাথবাবুর বাড়ি চলে আসেন। ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। পরিষ্কার বোঝা যায়, নিশানাথবাবুর মতো শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত ব্যক্তিকে খুনের জন্যেই আক্রমণ করা হয়েছিল। ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অ্যাড-মিনিস্ট্রেসান থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা পর্যন্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। সবারই ধারণা, নোংরা চক্রান্তের সঙ্গে শুধু এক মহিলাই না, অনেকে জড়িত। তারা কারা, সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বার করার জন্য ওপর থেকে অনবরত চাপ আসছে। অন্যান্য স্টেট, এমন কি দিল্লী থেকেও তাঁর খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এমন একজন অজাতশত্রু সমাজসেবীর ওপর এ জাতীয় হামলায় সকল স্তরের মানুষ খুবই ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ।

শুভাশিস বলেন, 'আড়াইটায় নিশানাথবাবুকে পুলিস পাহারায় অ্যাম্বুলেন্স করে এখানে নিয়ে আসা হয়। তাঁর পাঁজরে ঘাড়ে আর ডান হাতে তিনটে বুলেট লেগেছে। অপারেসান করে বুলেটগুলো বার করা হয়েছে।'

সমরেশ বলে, 'উনি কি বেঁচে আছেন?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে শুভাশিস বলেন, 'আছেন।'

'আপনাদের দু'জনের কাছে একটা ফেভার চাই।'

'কী?'

নিশানাথবাবুর সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করিয়ে দিতে হবে। ফর ফাইভ মিনিটস ওনলি। তার বেশি এক সেকেণ্ড নেব না।'

'ইমপসিবল।'

সমরেশ উঠে দাঁড়িয়ে শুভাশিসের একটা হাত ধরে প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলতে থাকে, 'আমার আসতে দেরি হয়ে গেছে। নিশানাথবাবুর ব্যাপারে স্পেশাল কিছু খবর দিতে না পারলে কাল আমার কাগজ মার খেয়ে যাবে। আমাকে এই সাহায্যটুকু করতেই হবে আপনাদের।'

শুভাশিস এবং মনোজিৎ একসঙ্গে বলেন, সেটা একেবারেই সম্ভব না সমরেশবাবু।'

'কেন! আগেও তো আপনারা এই টাইপের কেসে কত হেল্প করেছেন।'

শুভাশিস বলেন, 'আপনি নিশানাথবাবুকে ইণ্টারভিউ করে কিছু সেনসেশানাল মেটিরিয়াল বার করতে চান তো?'

বিমূঢ়ের মতো তাকায় সমরেশ। বলে, 'তা তো চাই-ই। নইলে কাল আমাদের কাগজ কেউ ছোঁবে! আমার চাকরি যাক এটাই কি আপনারা চান?'

'কিন্তু যাঁর ইন্টারভিউ করতে চাইছেন, তিনি বুলেট লাগার পর থেকেই অজ্ঞান হয়ে আছেন। ভেরি ভেরি ক্রিটিক্যাল কণ্ডিশান। অক্সিজেন চলছে। বাহাত্তর ঘণ্টার আগে সারভাইভ করবেন কিনা, বলা যাচ্ছে না। সেন্স যাঁর নেই তাঁকে ইন্টারভিউ করবেন কী করে?' বিষণ্ণ একটু হাসেন শুভাশিস।

এবার রীতিমত হতাশই দেখায় সমরেশকে। শুভাশিসের হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে ফের চেয়ারে বসতে বসতে বলে, 'আই সী।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সমরেশ মনোজিৎকে বলে, 'যে মহিলা নিশানাথবাবুকে গুলি করেছে, আপনি নিশ্চয়ই তাকে দেখেছেন।'

মনোজিৎ বলেন, 'দেখেছি।'

'কেন এমন একজন রেসপেক্টেবল মানুষকে সে খুন করতে চেয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলেছে?'

'না। আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তার কোনো কথা হয়নি। মেয়েমানুষটি যে থানার লক-আপে এখন রয়েছে সেখানকার ও. সি. কোনো কনফেসান আদায় করতে পেরেছে কিনা, বলতে পারব না। এটা ওরই কাজ।' আমি তাকে সাহায্য করার জন্যে এখানে এসেছি কমিশনারের হুকুমে। নিশানাথ সামন্তর ওপর মার্ডারের অ্যাটেমপ্ট। গুরুত্বটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সব দিক থেকে অল-আউট চেষ্টা করে ক্রিমিনালদের ধরতে হবে।' এই কেসে জড়িয়ে পড়ার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় মনোজিতের, 'আরে ঐ থানার ও. সি. তাপস তো আপনার গ্রেট ফ্রেণ্ড, ওর কাছে তো যাবেনই, তাকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নেবেন।'

ঠিকই বলেছেন মনোজিৎ। এই 'অ্যাটেমপ্ট অফ মার্ডার' অর্থাৎ হত্যা প্রচেষ্টার পেছনে কী উদ্দেশ্য, কারা এর সঙ্গে জড়িত, যাবতীয় তথ্য খুঁজে বের করার দায়িত্ব তাপসের। মহিলাটির স্বীকারোক্তি আদায় করা থেকে শুরু করে তার মারাত্মক দুষ্কর্মের সঙ্গী এবং উস্কানিদাতাদের ধরে কোর্টে তাকেই চালান করতে হবে। কেসের রায় বেরুনো পর্যন্ত তাপসের রেহাই নেই, এই কেসের সঙ্গে তাকে জুড়ে থাকতে হবে।

মনোজিৎ বাইরে থেকে যতটা পারেন তাকে সাহায্য করবেন।

সমরেশ বলে, 'আমি তাহলে এখন থানাতেই চলে যাই।' শুভাশিসকে বলে, 'নিশানাথবাবুর সেন্স ফিরলেই যেন জানতে পারি। অবশ্য দু-তিন ঘণ্টা পর পর ফোন করে খবর নেব।' বলতে বলতে উঠে পড়ে সমরেশ।

শুভাশিস বলেন, 'ঠিক আছে।'

দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় সমরেশ। বলে, 'হাসপাতালে এসে একেবারে খালি হাতে ফিরে যাব? একটা অনুরোধ কিন্তু রাখতেই হবে।'

'কী?'

'তার আগে বলুন অন্য কোনো কাগজ থেকে নিশানাথবাবুর ফোটো তুলে নিয়ে গেছে কিনা?'

'না।' তবে তুলতে চেয়েছে। তখন অপারেসান চলছিল, কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি!'

'ফাইন। আমাদের একটা ফোটো তুলতে দিন।'

দ্বিধান্বিতভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকেন শুভাশিস। তারপর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন, 'দু মিনিটের বেশি সময় দেব না।'

সমরেশ বলে, 'ম্যাক্সিমাম এক মিনিট। তার বেশি নেব না।'

ভাস্কর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে এবং সমরেশকে সঙ্গে করে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের ভেতরে একটা কেবিনে চলে আসেন শুভাশিস।

লোহার বেড-এর ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছেন নিশানাথ সামন্ত। সমস্ত শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। শুধু মুখটা বেরিয়ে আছে। চোখ দু'টি বোজা। দেহের কোথাও কোনো স্পন্দন নেই। বেঁচে আছেন কিনা বোঝা যায় না।

ছবি তোলার পর কেবিনের বাইরে এসে শুভাশিস বলেন, 'একটা কথা বলতে একেবারে ভুলে গেছি। আপনার কাজে লাগবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

সমরেশকে খুবই উৎসুক দেখায়। যে কোনো সামান্য সূত্র থেকে খবরের কাগজের জন্য 'চমক' তৈরি হয়ে যেতে পারে। সে বলে, 'কী কথা?'

'নিশানাথবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর ভি. আই. পি থেকে শুরু করে খুব সাধারণ মানুষ তাঁর খোঁজখবর নিয়েছেন। কেউ সোজা

এখানে চলে এসেছেন, কেউ বা ফোন করেছেন। এর মধ্যে একটা মিস্টিরিয়াস ফোন এসেছিল।

'মিস্টিরিয়াস কেন?'

শুভাশিস বলেন, 'সব শুনলে বুঝতে পারবেন কেন মিস্টিরিয়াস। মিনিটে মিনিটে যেখানে নানা লোক ফোন করছে সেখানে একটা পার্টিকুলার ভয়েস মনে রাখা সম্ভব নয়, যদি না তাতে আলাদা কোনো বিশেষত্ব থাকে। নিশানাথবাবুকে আনার পর একটি লোক পনের কুড়ি মিনিট পর পর অন্তত দশ-বারো বার ফোন করেছে। গলাটা ভাঙা ভাঙা, ভোঁতা আর খসখসে। সর্দি জমলে যেমন হয় অনেকটা তাই। তবে আমার ধারণা গলা চেপে ডিসটর্ট করে কথা বলেছিল লোকটা। সেই জন্যেই ভয়েসটা মনে আছে।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'কী বলছিল সে?'

'বার বার জানতে চাইছিল, নিশানাথবাবু বেঁচে আছেন কিনা, তাঁর প্রাণের আশা আছে কিনা, ইত্যাদি। তবে শেষ বার যে প্রশ্নটা করেছিল, তাতে আমি চমকে উঠেছি। সে জানতে চাইছিল, নিশানাথবাবুর মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে কিনা। মনে হচ্ছিল, লোকটা চাইছে নিশানাথ সামন্তর মৃত্যু ঘটুক। তিনি মারা গেলে কোনো দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা থেকে সে যেন মুক্তি পায়। আমি প্রায় ধমকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কে আপনি?' কী নাম? ঠিকানা বলুন। আমার কথা শেষ হতে না হতেই লাইন কেটে দেয় লোকটা।'

'স্ট্রেঞ্জ।' হাসপাতালে আসার পর এই প্রথম উত্তেজনা বোধ করতে থাকে সমরেশ। ফোনটা সত্যিই রহস্যময়। সে বলে, 'তারপর আর লোকটা ফোন করেনি?'

'না। দ্যাটস লাস্ট কল।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন শুভাশিস।

একটু চিন্তা করে সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা কি বাঙালি?'

'দিজ ইজ আ গুড পয়েণ্ট। আগেই জানানো উচিত ছিল।' দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে সমরেশের দিকে তাকান শুভাশিস, 'না, না, বাঙালি না। নন-বেঙ্গলিরা যেভাবে টেনে টেনে বাংলা বলে লোকটা সেইরকম বলছিল।'

'ধোঁকা দেবার জন্যে এখানে ডিসটরসান করেনি তো?'

শুভাশিসের মনে কোথায় যেন একটু খটকা লাগে। চোখ কুঁচকে তিনি কিছু ভাবেন। তারপর বলেন, 'হতে পারে। এটা যদি করে থাকে

তাহলে বলব, এত বড় অ্যাক্টর খুব বেশি জন্মায়নি।'

সমরেশ ভাবে, এই রহস্যময় লোকটা নিশানাথকে খুন করার জন্য কি সেই মহিলাটিকে পাঠিয়েছিল ? এরকম একটা সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নিশানাথ হত্যার পরিকল্পনার সঙ্গে লোকটা নিশ্চয়ই গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। তাকে নিয়ে একটা চমকপ্রদ 'স্টোরি' আজ তৈরি করতে হবে। সকালে এই 'স্টোরি' বাজার গরম করে দেবে।

সমরেশ বলে, 'এই ফোনের খবর অন্য কাগজকে দিয়েছেন ?'

'না। তখন নিশানাথবাবুর অপারেসান নিয়ে আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম যে ফোনের ব্যাপারটা মাথায় ছিল না।'

'তাহলে দয়া করে আজ আর কাউকে জানাবেন না।'

শুভাশিস হাসেন, 'ঠিক আছে।'

সমরেশ বলে, 'অনেক ধন্যবাদ। আমার দারুণ উপকার হলো। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।' শুভাশিস তাঁর চেম্বারে ফিরে যান। সেখানে মনোজিৎ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

আর ভাস্করকে নিয়ে সমরেশ হাসপাতালের বাইরে চলে আসে।

চার

একটা ট্যাক্সি ধরে সমরেশরা যখন থানায় পেঁাছয়, ঘড়িতে ন'টা বেজে সতের।

তাপস তার কামরায় বসে একজন সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলছিল। সমরেশরা দরজার সামনে দাঁড়াতেই ব্যস্তভাবে বলে, 'এসো, এসো। তোমার জন্যেই ওয়েট করছি।'

সমরেশ এবং ভাস্কর ঢুকে তাপসের মুখোমুখি বসে। তাপস সাব-ইন্সপেক্টরকে বলে, 'বিমল, তোমার সঙ্গে ঐ ব্যাপারে পরে ডিসকাস করব। এদের সঙ্গে আমার একটা জরুরি কাজ আছে।'

ইঙ্গিতটা বুঝে উঠে পড়ে বিমল। সমরেশকে সে ভালই চেনে এবং কী উদ্দেশ্যে রাত সোয়া ন'টায় তারা এখানে হানা দিয়েছে সেটাও তার জানা। সমরেশের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে বেরিয়ে যায়।

তাপস বলে, 'এখন কোত্থেকে আসছ ?'

সমরেশ জানায়, 'স্ট্রেট ফ্রম হসপিটাল। একটু চা কি কফি খাওয়াতে পার?'

'সিওর।'

একটা কনস্টেবলকে দিয়ে তিন কাপ কফি আনায় তাপস। নিজের কাপে আলতো চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'হাসপাতালের খবর কী? নিশানাথবাবুর জ্ঞান তো এখনও ফেরেনি। ঘণ্টা দেড়েক আগে এমার্জেন্সির ডক্টর দত্তর সঙ্গে কথা হয়েছিল। উনি জানালেন, আজ আর ফেরার আশা নেই।'

'হুঁ।' সমরেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

'তোমার রিপোর্টের জন্যে কিছু মেটিরিয়াল পেলে?'

'তেমন কিছু না। জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত নিশানাথবাবুকে ইণ্টারভিউ করা যাবে না। তবে—'

'কী?'

সেই রহস্যময় ফোনটার কথা জানায় সমরেশ।

শুনতে শুনতে শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায় তাপসের। সে বলে, 'কই, ডক্টর দত্ত তো আমাকে এটা বলেননি।'

নিশানাথকে নিয়ে ব্যস্ততা এবং টেনসানের কারণে শুভাশিসের যে এই ব্যাপারটা একেবারেই মাথায় ছিল না, আর সেই জন্যই কাউকে বলতে পারেননি, সেটা জানিয়ে দেয় সমরেশ।

'তা হবে। কিন্তু এই কেসে এটা একটা জোরালো ক্লু।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'যাই হোক, ডক্টর দত্তকে ফোন করে আমি ডিটেল জেনে নেব। লোকটাকে যেভাবে হোক ধরতেই হবে।'

'হ্যাঁ। তারপর মহিলাটির খবর বল।'

তাপস বলে, 'এমন ক্রিমিনাল কখনও আমি আর দেখিনি।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'কিরকম?'

'দারুণ নার্ভের জোর। বলে কিনা নিশানাথের ওপর গুলি চালিয়ে তার কোনো আফসোস নেই। তার একটাই দুঃখ, লোকটাকে একেবারে শেষ করে ফেলতে পারেনি। যদি নিশানাথ বেঁচে থাকেন আর সে পুলিশের কব্জা থেকে বেরুতে পারে, আবার অ্যাটেম্প্ট করবে। নিশানাথ সামন্তকে সে মার্ডার করবেই।'

'ঐরকম একজন পরোপকারী সোসাল ওয়ার্কারের ওপর মেয়েমানুষ-টার এত আক্রোশ কেন ?'

'সেটাই তো বার করতে পারছি না। যা বলার সে কোর্টে বলতে চায়। দু'জন ফিমেল পুলিশ অফিসারকে হেড কোয়ার্টার থেকে আনিয়েছি, যদি তারা কোনো কনফেসান আদায় করতে পারে।'

'ফিমেল পুলিশ অফিসাররা কোথায় ?'

'এতক্ষণ ঐ মেয়েমানুষটার সঙ্গে কথা বলছিল। হয়ত হাজতের পাশে কোনো ঘরে আছে।'

সমরেশ বলে, 'আর দেরি করতে পারব না। এবার মহামানবীটিকে দর্শন করার ব্যবস্থা করে দাও।'

বাকি কফি এক চুমুকে শেষ করে উঠে পড়তে পড়তে তাপস বলে, চ'ল।

'ফোটো তুলতে হবে। ভাস্করকে সঙ্গে নেব ?'

'এখন না। ও এখানেই ওয়েট করুক। তুমি কথাবার্তা বলে নাও। তারপর ও গিয়ে ছবি তুলবে।'

ও. সি'র ঘরের সামনে দিয়ে লম্বা সরু প্যাসেজ সোজা ডান দিকে চলে গেছে। প্যাসেজটার শেষ মাথায় মেয়েদের হাজত।

সোজা সেখানে এসে লোহার গরাদের এপাশে দাঁড়ায় সমরেশরা। বাইরে একটা ঢাউস তালা ঝুলছে।

ভেতরে মাঝারি পাওয়ারের আলো জ্বলছে। তাতে দেখা যায়, একটি মেয়ে খালি মেঝেতে পেছন ফিরে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। পিঠময় চুল ছড়ানো। সে ছাড়া হাজতে আর কেউ নেই।

তাপস ডাকে, 'এই যে শুনছেন—'

মেয়েটি মুখ তোলে না। একইভাবে ঠায় বসে থেকে বলে, 'কেন বিরক্ত করছেন ? যা বলার তা তো বলেই দিয়েছি।' তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ এবং তীক্ষ্ণ।

তাপস বলে, 'এদিকে ঘুরে বসুন।'

মেয়েটি অসহিষ্ণুভাবে এবার বলে, 'আপনাদের চিন্তা নেই, কোর্টে গিয়ে অন্যরকম বলব না।'

'আমি সেজন্যে আসিনি।'

'তবে কী জন্যে ?' বলতে বলতে শরীরে ক্ষিপ্র একটা মোচড় দিয়ে

ঘুরে বসে মেয়েটি। আর তখনই সমরেশকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের কালো তারা দুটো একেবারে স্থির হয়ে যায়। মনে হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

সমরেশ থমকে গিয়েছিল। নিশানাথের ওপর গুলি চালানোর কারণে যে দুর্ধর্ষ বেপরোয়া মেয়েমানুষটিকে ধরা হয়েছে সে যে জয়তী, থানায় আসার আগে কে ভাবতে পেরেছিল। তার আর জয়তীর মাঝখানে ছ-সাত ফুটের দূরত্ব। নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সমরেশ।

যতই অভাবনীয় হোক, মেয়েটি নির্ভুলভাবেই যে জয়তী সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। বসার ঐ ভঙ্গিটি সমরেশের বহুদিনের চেনা। ডান গালের মাঝখানে মসুর ডালের মতো লালচে তিল, ছোট কপাল, নিটোল চিবুক, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, পাতলা ঠোঁট, ঈষৎ মোটা নাক এবং টান টান মেদশূন্য চেহারা, তুলিতে টানা ভুরু, ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় চোখ—সব আগের মতোই আছে।

কতদিন বাদে জয়তীকে দেখল সমরেশ? আট বছর তো নিশ্চয়ই। কিন্তু এতটুকু বদলায় নি সে। শুধু এই মুহূর্তে তার চুল এলোমেলো এবং রুক্ষ, চোখ প্রায় রক্তবর্ণ, পরনের শাড়িটা কোঁচকানো, দৃষ্টি কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত। চেহারা আর পোশাকে এতটুকু পরিপাট্য নেই। থাকার কথাও নয়।

জয়তীকে দেখতে দেখতে মাথার ভেতর চাকার মতো কিছু একটা যেন দুরন্ত গতিতে ঘুরতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে একসঙ্গে হাজার ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে। সমরেশের চোখের সামনের দৃশ্যাবলী ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে। সে পড়েই যেত, কোনোরকমে হাত বাড়িয়ে হাজতের গরাদ ধরে নিজেকে সামলে নেয়।

বয়স বেশি না হলেও তাপস তুখোড় অফিসার। দিনরাত নানা ধরনের মানুষ আর ক্রাইম ঘেঁটে এর মধ্যেই তার প্রচুর অভিজ্ঞতা। পাশে দাঁড়িয়ে জয়তী এবং সমরেশের প্রতিক্রিয়া সে লক্ষ করেছিল। কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়ে সমরেশের কানের কাছে মুখ এনে চাপা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'মহিলাটিকে চেনো নাকি!'

সমরেশ হকচকিয়ে যায়। মুখ না ফিরিয়ে আধফোটা গলায় ফিসফিস করে, 'তোমাকে পরে বলব।'

তাপস আর কোনো প্রশ্ন করে না। দু'জনের আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দিয়ে জয়তীকে বলে, 'আমার এই বন্ধুটি আপনাকে দু-চারটে প্রশ্ন করতে চান। আশা করি ওঁর সঙ্গে কো-অপারেট করবেন। আপনারা কথা বলুন। আমি আধ ঘণ্টা পর আবার আসব।'

তাপস চলে গেল।

তারপর অনেকটা সময় কেটে যায়। হাজতের ভেতর অনড় পাথরের মূর্তি হয়ে শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে আছে জয়তী। আর গরাদের এপারে দাঁড়িয়ে তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে রয়েছে সমরেশ।

একসময় সমরেশ কাঁপা গলায় ডাকে, 'জয়তী—'

তক্ষুণি সাড়া দেয় না জয়তী। কিছুক্ষণ পর তার ঠোঁট আস্তে আস্তে নড়ে ওঠে, 'বল।'

'কতদিন বাদে তোমাকে দেখলাম!'

'আট বছর বাদে।'

চোখ দুটো চকচক করে ওঠে সমরেশের। গরাদের ওপর মুখটা ঝুঁকিয়ে বলে, 'মনে আছে তোমার!' সে টের পায় তার কণ্ঠস্বরে খানিকটা আবেগ কিভাবে যেন মিশে গেছে।

জয়তী বলে, 'আছে। কিন্তু অনেক আগেই আমি ভুলে যেতে চেয়েছিলাম।'

সমরেশ চমকে ওঠে। লক্ষ করে, তাকে দেখার পর জয়তীর যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা হয়েছিল সেটা এতক্ষণ কাটিয়ে উঠেছে সে। আগের সেই বিহ্বলতা এবং বিস্ময় আর নেই। তার মুখে ফুটে বেরিয়েছে এক ধরনের রুক্ষতা আর কাঠিন্য। চোখ দুটো শানানো ছুরির ফলার মত তীব্র দেখাচ্ছে।

সমরেশ উত্তর দেবার আগেই জয়তী ফের বলে, 'পুলিশ হাজতে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছ, না? ভীষণ ঘেন্না হচ্ছে?'

'ঘেন্না' শব্দটা খট করে কানে ধাক্কা দিয়ে যায় সমরেশের। বিব্রতভাবে সে বলে, 'এসব কথা বলছ কেন? অবাক নিশ্চয়ই হয়েছি, কিন্তু ঘেন্নার কথা আসছে কিসে?'

জয়তী ধারাল গলায় বলে, 'সেটাই তো স্বাভাবিক। মুখ ফুটে বলতে পারছ না। সে যাক। ও. সি বলে গেলেন তুমি 'দৈনিক মহাভারত'-এর রিপোর্টার। তুমি যে ঐ কাগজে কাজ কর, সেটা আমি অনেক আগে

থেকেই জানি।'

বিমূঢ়ের মতো সমরেশ বলে, 'জানো!'

'নিশ্চয়ই। তোমার অনেক রিপোর্ট আমি পড়েছি।' জয়তী না থেমে বলে যায়, 'রিপোর্টার হিসেবে তোমার কথা লোকের মুখে প্রায়ই শুনি।'

সমরেশ বলে, 'আমার সম্বন্ধে এত খবর যদি জেনেই থাকো, একবার তো আমাদের অফিসে আসতে পারতে। অন্তত ফোন-টোন করলে, কি চিঠি লিখলে আমি গিয়ে দেখা করতাম।'

'তার কি কোনো দরকার ছিল?'

এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই সমরেশের। বুকের ভেতর চিনচিন ব্যথার মতো একটা কষ্ট টের পেতে থাকে সে। বলে, 'তুমি কি সমস্ত পাস্টটা অস্বীকার করতে চাইছ?'

নিস্পৃহ মুখে জয়তী বলে, 'হ্যাঁ, তাই।'

'কিন্তু—'

হাত তুলে সমরেশকে থামিয়ে দিতে দিতে জয়তী বলে, 'তুমি একজন দুর্দান্ত ক্রাইম রিপোর্টার, তাই না?'

সমরেশ হকচকিয়ে যায়। এমন একটা আচমকা প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। বলে, 'দুর্দান্ত কিনা জানি না, তবে আমাদের কাগজের জন্য ক্রাইম ওয়ার্ল্ডের খবর যোগাড় করতে হয়। ওটা আমার চাকরি।' একটু থেমে বলে, 'সেই যে সমশেরগঞ্জ থেকে কাউকে না জানিয়ে একদিন চলে এলে, তারপর তোমাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। অনেকের কাছে খোঁজ করেছি কিন্তু কেউ তোমাদের খবর দিতে পারেনি।'

শব্দহীন তীব্র হাসিতে ঠোঁট দুটো বেঁকে যায় জয়তীর। সে বলে, একজন বাঘা সাংবাদিক একটা মারাত্মক খুনী মেয়ের অতীত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, এ কিন্তু ভাবা যায় না।'

সমরেশ এবার নিজেকে অনেকখানি ধাতস্থ করে নেয়। তার মধ্যে প্রফেসানাল সাংবাদিকটি আবার ফিরে আসে যেন। শান্ত আবেগশূন্য গলায় এবার সে বলে, 'এমনও তো হতে পারে, যে কারণে আজ তোমাকে ধরা হয়েছে তার বীজ সেই অতীতের মধ্যেই ছিল।'

'না না না—' হঠাৎ মুখটা ডান পাশের নিরেট দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিচু গলায় জয়তী বলে, 'আমি একটা সরল মেয়ে ছিলাম। পাপ কাকে বলে জানতাম না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সমরেশ সহানুভূতির গলায় বলে, 'তোমার বাবার খবর আমি জানি, কিন্তু মাসিমা এখন কোথায়? তিনি কি তোমাকে দেখতে এসেছিলেন?'

'বছর দেড়েক আগে ক্যান্সারে মারা গেছে।' ধীরে ধীরে দেওয়ালের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে জয়তী বলে, 'বুঝতেই পারছ, মায়ের পক্ষে আমাকে দেখতে আসা সম্ভব না। পুলিশের লোকেরা ছাড়া আর কেউ আমার কাছে আসেনি।' একটু চুপ করে থাকার পর বলে, 'তুমি অবশ্য এসেছ।'

জয়তীর শেষ কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছিল না সমরেশ। সে বলে, 'আর তোমার ছোট ভাই বিশু—' এই পর্যন্ত বলে থেমে যায়।

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে জোরে জোরে উন্মাদের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে জয়তী বলে, 'জানি না, জানি না, জানি না। বিশু বেঁচে আছে কি মরে গেছে, বলতে পারব না।'

বিশুর কথায় জয়তীর এরকম প্রতিক্রিয়া ঘটে যাবে, সমরেশের পক্ষে তা ছিল অভাবনীয়। বিমূঢ়ের মতো সে বলে, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

আস্তে আস্তে মুখ থেকে হাত সরায় জয়তী। তার চোখ এখন লাল টকটকে। মনে হয় শরীরের সব রক্ত সেখানে জমা হয়েছে। সে বলে, 'বিশু সম্পর্কে যা বললাম, এর বেশি আর কিছু আমার জানা নেই। তবে—'

'কী?'

'বিশুর জন্যেই আজ আমি নিশানাথ সামন্তকে খুন করতে গিয়েছিলাম।'

সমরেশের হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন পলকে বন্ধ হয়ে যায়। বিভ্রান্তের মতো সে বলে, 'কী বলছ তুমি! নিশানাথবাবুর মতো শ্রদ্ধেয়, পরোপকারী সোসাল ওয়ার্কার বিশুর কী এমন ক্ষতি করেছে যে তাঁকে তুমি গুলি করলে!'

'শ্রদ্ধেয়! পরোপকারী! সোস্যাল ওয়ার্কার!' টেনে টেনে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে ওঠে জয়তী। ঘৃণায় বিদ্রূপে তার মুখ বেঁকেচুরে হিংস্র দেখায়, 'লোকটা চমৎকার মুখোশ এঁটে এত কাল মানুষের চোখে

ধুলো দিয়েছে। এত বড় শয়তান, ক্রিমিনাল পৃথিবীতে আর একটাও জন্মায়নি। সে আমাদের কী সর্বনাশ করেছে, তা শুধু আমিই জানি।'

সমরেশের দম আটকে আসছিল। রুদ্ধ জড়ানো গলায় সে বলে, 'কী করেছেন নিশানাথবাবু ?'

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জয়তী জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা বেঁচে আছে না মরে গেছে, বলতে পারো ?'

'এখনও মারা যাননি। হাসপাতালে বেহুঁশ হয়ে আছেন।'

'বেঁচে থাকতে ওকে দেব না। নিশানাথকে আমি শেষ করবই।'

জয়তী যা বলল, সমরেশের তা অজানা নয়। তাপস আগেই তাকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে। একটু ভেবে সমরেশ বলে, 'নিশানাথবাবু তোমাদের কী ক্ষতি করেছেন, এখনও কিন্তু বলো নি।'

এবার নিজেকে গুটিয়ে নেয় জয়তী। উদাসীন ভঙ্গিতে বলে, 'তা শুনে কোনো লাভ নেই।'

'লাভ লোকসানের কথা নয়, আমি জানতে চাই। যদি লোকটা সত্যি সত্যিই খারাপ হয়, তাকে তো এক্সপোজ করা দরকার।'

'কিছুই করতে পারবে না। লোকটা যা ইমেজ করে রেখেছে, তার গায়ে আঁচড় কাটার ক্ষমতা তোমার নেই। যা করার আমিই করব।'

'কিন্তু—'

হাত নেড়ে সমরেশকে থামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় জয়তী। দূরে এক কোণে কম্বল পাতা রয়েছে। সেদিকে যেতে যেতে বলে, 'দয়া করে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না।'

সমরেশ বুঝতে পারছিল, জয়তীর মুখ থেকে আর একটি কথাও বের করা যাবে না। অথচ নিশানাথকে হত্যার জন্য যে আক্রমণটি আজ করা হয়েছে, তার সঙ্গে বিশু যে জড়িয়ে আছে তাতে এতটুকু সংশয় নেই। নিশানাথের মতো মানুষ কী এমন ক্ষতি করতে পারেন যাতে জয়তী প্রতিহিংসা নেবার জন্য এমন উন্মাদ হয়ে উঠেছে! সেটা না জানা পর্যন্ত ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করতে থাকে সমরেশ।

নিশানাথকে সে শ্রদ্ধা করে, গরীব নিরাশ্রয় মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ব এবং মহানুভবতায় সমরেশ অভিভূত। এদিকে জয়তীকে একদিন ভাল করেই চিনত সমরেশ। বহুকালের মেলামেশা আর ঘনিষ্ঠতায় জেনেছে, এই মেয়েটার মধ্যে সারল্যের পাশাপাশি এক ধরনের দৃঢ়তাও রয়েছে।

ছলচাতুরি, কপটতা বা মিথ্যাচার ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সে জানত না। সাত-আট বছর বাদে এই মুহূর্তে থানার হাজতে দেখার পরও সমরেশের মনে হয়, জয়তী আদৌ বদলায়নি। মনে হয়, একটি বর্ণও সে মিথ্যে বলছে না। অথচ নিশানাথ সম্পর্কে সে যা জানিয়েছে তার সঙ্গে সমরেশের ধারণা একেবারেই মিলছে না। তবে কি নিশানাথের ব্যাপারে কোথাও ভুল হয়েছে জয়তীর, নাকি সমরেশই তাঁকে বুঝতে পারেনি? সত্যিই কি বাইরের দিকে ভালমানুষি এবং মহত্ত্বের ঠাট বজায় রেখে ভেতরে ভেতরে তিনি একজন অতি চতুর ক্রিমিনাল? নিশানাথ সম্পর্কে জয়তীর ধারণা যদি ঠিক হয়, তা হলে বলতে হবে, এমন দুর্ধর্ষ অভিনেতা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি জন্মায়নি।

গরাদের ফাঁক দিয়ে ব্যগ্র ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে সমরেশ ডাকে, 'জয়তী যেও না—'

জয়তী থমকে যায়। বলে, 'কী হলো? তোমাকে যা বলার তা বলেই দিয়েছি। আমার আর কিছু জানাবার নেই।' তার চোখেমুখে এবং গলার স্বরে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

সমরেশ বলে, 'তুমি তো আমাকে কিছুই বলো নি। সত্যিই যদি নিশানাথবাবু ক্রিমিনাল হন, তাঁকে তোমার পক্ষে এক্সপোজ করা সম্ভব না।'

'কেন নয়?'

'কারণ, যে চার্জে তোমাকে ধরা হয়েছে তাতে সহজে ছাড়া পাবে বলে মনে হয় না। হাজত থেকে বেরুতে না পারলে নিশানাথবাবুর আসল স্বরূপ লোককে কী করে জানাবে?'

অদ্ভুত হাসে জয়তী। বলে, 'পুলিশ আমাকে চিরকাল হাজতে আটকে রাখতে পারবে না। আদালতে নিয়ে যেতেই হবে। তখন নিশানাথ সম্পর্কে আমার যা বলার জজের সামনে বলব। তুমি তো ক্রাইম আর ল কোর্ট রিপোর্ট করো। আমার স্টেটমেণ্ট তখন কাগজে ছেপে দিও। লক্ষ লক্ষ রীডার নিশানাথের চরিত্রটি কেমন, জেনে যাবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সমরেশ বলে, 'আমাকে তুমি কিছুই বলবে না তা হলে?'

'বুঝতে পারছি, বললে তোমার চাকরির পক্ষে সুবিধা হতো। অ্যাটেম্প্ট অফ মার্ডারের চার্জে যে ধরা পড়েছে তার ইণ্টারভিউ বেরুলে

কাল হই চই পড়ে যেত, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। তোমাকে সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।'

বুকের ভেতর কোনো একটা অদৃশ্য গোপন জায়গায় প্রচণ্ড ধাক্কা খায় সমরেশ। এতক্ষণ নিজের প্রফেসান এবং চাকরির কথা মাথায় রেখে সে যে জয়তীর কাছ থেকে চাঞ্চল্যকর কিছু আদায়ের জন্য দাঁতে দাঁত চেপে দড়ি টানাটানি করে যাচ্ছিল, জয়তী তা ধরে ফেলেছে। এতকাল বাদে তার সঙ্গে দেখা। অথচ মোটা দাগের স্বার্থ ছাড়া সমরেশের আর কিছুই মনে পড়ল না! হঠাৎ ভেতরে ভেতরে একেবারে কুঁকড়ে যায় সে। জয়তীর প্রতি গভীর সমবেদনায় তার মন ভরে যেতে থাকে।

ব্যাকুলভাবে সমরেশ স্বীকার করে, 'তুমি যা বলেছ তার সবটাই ঠিক। তোমার ইণ্টারভিউ বেরুলে সেনসেসান হয়ে যাবে। শুধু সে জন্যেই কিন্তু সব কথা জানতে চাইনি।'

একটু যেন থতিয়ে যায় জয়তী। দু'পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে?'

'বেইলের ব্যবস্থা করে হাজত থেকে তোমাকে বের করে নিতে হলেও আমার সমস্ত কিছু জানা দরকার।'

সেই অদ্ভুত হাসিটা নিঃশব্দে জয়তীর সমস্ত মুখে ছড়িয়ে যায়। সে বলে, 'বেইলের কথাটা নিশ্চয়ই এইমাত্র ভাবলে?'

মিথ্যে বলে জয়তীর কাছে পার পাওয়া যাবে না। আট বছর আগেও সমরেশ লক্ষ করেছে, এই মেয়েটার সরল নিষ্পাপ চোখে এমন দূরভেদী দৃষ্টি রয়েছে যা মনের গভীর পর্যন্ত দেখতে পায়। কোনোরকম অজুহাত খাড়া না করে সে সোজাসুজি স্বীকারই করে, 'হ্যাঁ, তাই। তবে তোমাকে এখানে দেখামাত্রই আমার ভাবা উচিত ছিল।'

জয়তী প্রথমটা উত্তর দেয় না, স্থির চোখে সমরেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বলে, 'দয়া!'

জয়তীর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা সমরেশের হৃৎপিণ্ড ধারাল ফলার মতো ঢুকে যায়। সে বিপন্ন মুখে বলে, 'এভাবে বলছ কেন?'

জয়তী যেন তার কথা শুনতেই পায় না। আগের স্বরেই বলে, 'কারো দয়া বা করুণা চাই না। সারাদিন আমার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। মাথাটা একেবারে ছিঁড়ে পড়ছে। এখন আমি একটু ঘুমোতে চাই।'

পরিষ্কার ইঙ্গিত, জয়তী তাকে চলে যেতে বলছে! একদিন তার সঙ্গে যে একটা গভীর সম্পর্ক ছিল সেটা আর মনে রাখতে চায় না জয়তী। তার সহানুভূতির প্রয়োজনও বোধ করছে না। আট বছর আগের সেই অতীত তার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিছুক্ষণ আগে পুরনো সম্পর্ক ভাঙিয়ে সমরেশ সত্যিই কিছু উত্তেজক এবং চাঞ্চল্যকর মশলা বের করতে চেয়েছিল কিন্তু এখন জয়তীর জন্য প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা বোধ করছে। আর এই উৎকণ্ঠার সবটুকুই আন্তরিক। মেয়েটার জন্য দুশ্চিন্তায় তার শ্বাস আটকে আসতে থাকে। হঠাৎ সুচিত্রার মুখটা মনে পড়ে যায় সমরেশের। সে বলে, 'কাল সকালে আমার এক ল-ইয়ার বান্ধবীকে নিয়ে আসব। সে তোমার বেইলের ব্যবস্থা করবে।'

কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকে জয়তী। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'তোমাকে কতবার বলব বেইলের দরকার নেই। যা করার আমি নিজেই করব।' কণ্ঠস্বর সামান্য উঁচুতে তুলে বলতে থাকে, 'বান্ধবী টান্ধবী কাউকেই আনতে হবে না।'

জয়তী অতীতকে যতই অস্বীকার করুক বা ভুলে যেতে চাক, সমরেশ কিন্তু তার মধ্যে জড়িয়ে যেতে থাকে। জয়তীর সঙ্গে কোনোদিন দেখা না হলে কী হতো বলা যায় না। এতকাল পর হাজতের ভেতর তাকে দেখতে দেখতে সে টের পায়, বুকের মধ্যে কোথায় যেন ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে। মনে হয়; এই মেয়েটা যে এখানে এসে পৌঁছেছে সে জন্য তার দায়িত্বও কম নয়। এতক্ষণ নিজের ভেতর গুটিয়ে গিয়েছিল, এবার তার মধ্যে খানিকটা দৃঢ়তা ফিরে আসে। সে বলে, 'তোমার দরকার না থাকতে পারে, আমার আছে। কাল ল-ইয়ার এনে জামিনের ব্যবস্থা আমি করবই।'

'জোর করে?'

'তুমি যদি বাধা দাও, জোর করতেই হবে।'

জয়তী উত্তর দেয় না, স্থির দৃষ্টিতে সমরেশকে লক্ষ করতে থাকে।

সমরেশ বলে, 'তোমাকে আজ আর বিরক্ত করব না। যাও শুয়ে পড়। কাল দেখা হবে।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় তার! ব্যগ্র ভঙ্গিতে বলে, 'আজ শুধু আর একটা প্রশ্নই করব।'

কপাল কুঁচকে যায় জয়তীর। সতর্ক ভঙ্গিতে সে বলে, 'কী?'

'যে রিভলবারটা দিয়ে নিশানাথবাবুকে গুলি করেছ, সেটা তোমাকে

কে দিয়েছে ?'

এবার বিস্ফোরণ ঘটে যায়। গলার শির ছিড়ে চিৎকার করে ওঠে জয়তী, 'অনেকে অনেকে। তাদের মধ্যে তুমি, তোমার বাবা—সবাই রয়েছে। সকলে মিলে তোমরা ঐ অস্ত্রটা আমার হাতে তুলে দিয়েছ। দয়া করে এবার তুমি যাও।' বলেই দূরে কম্বলের বিছানাটার দিকে চলে যেতে থাকে সে।

জয়তীর কথাগুলো সমরেশের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে আগুনের স্রোতের মতো ছুটতে থাকে। তীব্র অপরাধবোধে তার ঘাড় ভেঙে মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে। সত্যিই তো, আট বছর আগে সমরেশ আরেকটু সাহসী আর তার সামান্য সদয় হলে জয়তীকে আজ হাজতে আসতে হতো না।

এদিকে চেঁচামেচি শুনে হাজতের পাশের কামরা থেকে দু'জন মহিলা পুলিশ অফিসার এবং ও. সি'র চেম্বার থেকে তাপস ছুটে আসে। তাছাড়া পুরুষদের হাজতের গরাদের ওপর অনেকগুলো চোর মাতাল পকেটমারের মুখ দেখা যায়। কয়েকজন কনস্টেবলও দূরে লম্বা প্যাসেজের মাথায় এসে দাঁড়ায়।

তাপস জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে সমরেশ ?'

সমরেশ বলে, 'তোমার ঘরে চলো।'

তাপস কিছু একটা আন্দাজ করে নেয়। মহিলা অফিসার, কনস্টেবল ইত্যাদি সবাইকে যে যার জায়গায় ফিবে যেতে বলে সমরেশকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে চলে আসে সে।

এতক্ষণ জয়তীর সামনে প্রাণপণে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সমরেশ, দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করেছিল। এখন প্রায় টলতে টলতে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। তাকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

সমরেশের মতো স্মার্ট ঝকঝকে বন্ধুকে এভাবে ভেঙেচুরে পড়তে আগে আর কখনও দ্যাখেনি তাপস। কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়ে সে ভাস্করকে বলে, 'তুমি মেয়েদের হাজতের সামনে গিয়ে কয়েদী জয়তী সান্যালের ছবি তুলে নাও। তোলা হয়ে গেলে বাইরে ওয়েট করো। আমি না ডাকলে এ ঘরে এসো না।'

ভাস্করকে আগে থেকেই চেনে তাপস। অনেক বার এই থানায় এসে

নানা ক্রিমিনালের ছবি তুলে গেছে। সে ঘরে থাকলে সমরেশ হয়ত কিছু বলতে চাইবে না, তাই এখান থেকে তাকে বাইরে সরানো দরকার। একটা কনস্টেবলকে ডেকে তাপস তার সঙ্গে মেয়েদের হাজতে ভাস্করকে পাঠিয়ে দেয়। তারপর সমরেশের দিকে ফিরে বলে, 'আমার ধারণা জয়তীর সঙ্গে তোমার ভালই পরিচয় আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে সমরেশ।

'কতদিন ওকে চেনো?'

'অনেক দিন। তোমাকে সমশেরগঞ্জের কথা বলেছি। আমার কুড়ি বছর বয়েস পর্যন্ত ওখানে থেকেছি। জয়তীরাও ওখানে থাকত। কলকাতায় আসার পর ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সমরেশ হঠাৎ বলে ওঠে, সুচিত্রাকে তো তুমি চেনো—'

তাপস বলে, 'তোমার সেই ল-ইয়ার বান্ধবীর কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। কাল তাকে নিয়ে তোমার এখানে আসব। জয়তীর বেইলের ব্যবস্থা করতে হবে।'

রীতিমত অবাক হয়েই তাপস বলে, 'থানা থেকে তো বেইল দেওয়া যায় না জয়তীকে কোর্টে প্রডিউস করব কাল। তুমি ওর বেইলের জন্যে সুমিত্রাকে ওখানে অ্যাপীল করতে বলো। কোর্ট রাজী হলে জামিন পেয়ে যাবে।'

সমরেশ জানায়, আইন নিয়ে সেও পড়াশোনা করেছে। জামিন সংক্রান্ত যাবতীয় পদ্ধতি তার জানা। সে শুধু চায় পুলিশ যেন জয়তীকে 'ইনভেস্টিগেশনে'র কারণে কিছুদিন থানায় আটকে রাখার জন্য জোরজার না করে। এটুকু করলেই জামিনের অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে জয়তীকে বের করে নেওয়া যাবে।

তাপস চমকে ওঠে, 'তা কী করে সম্ভব? ইটস নেক্সট টু ইমপসিবল। তোমার ল-য়ের ডিগ্রি আছে। জয়তীর বিরুদ্ধে অ্যাটেমপ্ট অফ মার্ডারের কেস উঠবে। এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে নিশানাথবাবুকে মারাত্মক জখম করেছে সে। ভদ্রলোক বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া জয়তী বার বার বলেছে, কোনো রকমে একবার এখান থেকে বেরুতে পারলে নিশানাথ-বাবুকে শেষ করে ফেলবে। এই অবস্থায় কোর্ট কিছুতেই ওকে জামিন দিতে পারে না।' একটু থেমে আবার বলে, জয়তী নিজের চরম ক্ষতি

নিজেই করে রেখেছে।'

টেবলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় সমরেশ। তাপসের একটা হাত আঁকড়ে ধরে বলে, 'একটা কিছু তোমাকে করতেই হবে তাপস। প্লীজ না বলো না।' তার চোখমুখে কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা ফুটে বেরোয়।

সমরেশের সঙ্গে কয়েক বছরের আলাপ। এমন ভদ্র রুচিশীল চমৎকার ছেলে খুব কমই দেখেছে তাপস। কখনও কোনো কারণেই অন্যায় সুযোগ নেয় না, এমন কোনো অনুরোধ করে না যাতে তাপসের অস্বস্তি হয় বা সে বিপন্ন বোধ করে। এরকম একজন বন্ধু পেয়ে তাপস গর্বিত।

কিন্তু এই মুহূর্তে সমরেশ যা বলছে তাতে মনে হয়, তার ভেতর কোথাও একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। তাপসের পক্ষে কোনটা সম্ভব আর কোনটা অসম্ভব তা বোঝার মতো মানসিক সুস্থতা তার নেই।

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাপস বলে, 'একটা কথা বুঝতে চেষ্টা করো সমরেশ—'

'কী?' সোজা তাপসের চোখের দিকে তাকায় সমরেশ।

তাপস বলে, 'সমস্ত ব্যাপারটা কি আমার হাতে? তুমি আইন জানো। কোর্টে গভর্নমেণ্টের উকিল দাঁড়াবে, সে জয়তীকে সহজে ছাড়বে না।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'তোমার দেওয়া ডকুমেণ্টের জোরেই তো সে কোর্টে যা বলার বলবে।'

সমরেশ কী বলতে চায় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না তাপসের। অর্থাৎ ডকুমেণ্ট কারচুপি করলে জয়তী জামিন পেয়ে যেতে পারে। তাপস বলে, 'আমি চাকরি করি সমরেশ। জয়তী যা করেছে, সাপ্রেসান অফ ডকুমেণ্টস বা ইনফরমেশানস তার চেয়ে ছোট ক্রাইম নয়। বিশেষ করে যেখানে মার্ডার চার্জ রয়েছে।'

সমরেশ হকচকিয়ে যায়। ফের তাপসের দুই হাত জড়িয়ে ধরে বলে, 'সরি তাপস, এক্সট্রিমলি সরি। জয়তীকে এতদিন বাদে হাজতে দেখে আমার মাথায় ঠিক ছিল না, তাই অন্যায় আবদার করেছিলাম। প্লীজ এ ব্যাপারটা ভুলে যাও।'

সমরেশ বুঝতে পেরেছে বন্ধুর কাছে তার দাবি কতটা হওয়া উচিত

এবং কোন সীমারেখা পর্যন্ত পা ফেললে সে বিব্রত হবে না। সমরেশ যে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে, এতে খুশিই হয় তাপস। নিজের হাতটা এবার আর ছাড়িয়ে নেয় না। খুব নরম গলায় বলে, 'জয়তীকে কোর্ট বেইল দেবে কিনা বলতে পারছি না। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, কনফেসান আদায়ের জন্যে থানায় তার ওপর জোরজুলুম করা হবে না। হাজতে যতটা আরামে থাকা সম্ভব, আমি তার ব্যবস্থা করব।'

'এটুকু করলেই যথেষ্ট। মেয়েটা খুবই দুঃখী, লাইফে অনেক কষ্ট পেয়েছে।'

একটু চিন্তা করে তাপস বলে, 'তুমি ওর সম্বন্ধে কতটা জানো?'

সমরেশ বলে, 'সমশেরগঞ্জে যতদিন ছিলাম, তখনকার কথা সবটাই জানি। কলকাতায় আসার পর লাস্ট আট বছরের কথা কিছু বলতে পারব না।'

'এতক্ষণ কথা বললে, কিছুই বের করতে পারলে না?'

'না।' সমরেশকে খুবই হতাশ দেখায়। ক্লান্তভাবে সে বলতে থাকে, 'যা বলার ও নাকি কোর্টেই বলবে।'

তাপস জিজ্ঞেস করে, 'কেন নিশানাথবাবুকে জয়তী গুলি করেছে তা জানতে পারলে?'

'না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর তাপস বলে, 'যদি অন্যভাবে না নাও, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ধরো এটা আমার নিছক কৌতূহল—'

সমরেশ বলে, 'ঠিক আছে, কী জানতে চাইছ বলো—'

'জয়তীর ব্যাপারে তোমার যা সিমপ্যাথি তাতে মনে হচ্ছে তোমাদের সম্পর্কটা একসময় খুব গভীর ছিল, তাই না?' একটু থেমে ফের বলে, 'নইলে ওকে বাঁচাতে চাইবেই বা কেন?'

তাপসের হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ দূরমনস্কের মতো বসে থাকে সমরেশ। একসময় আস্তে আস্তে বলে, 'হ্যাঁ, তাই। আমাদের বিয়েও হতে পারত। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

সমরেশ আট বছর আগের পুরনো স্মৃতির মধ্যে ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ সামনের দেওয়ালে বড় চৌকো ওয়াল-ক্লকটার দিকে তাকিয়ে ভীষণ

ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ওসব এখন থাক, পরে শুনো। পৌনে দশটা বেজে গেল। আর দেরি করা যাবে না। অফিসে গিয়ে রিপোর্ট লিখে দিলে তবে ছাপা হবে। কাউকে দিয়ে খবর দাও, এক্ষুণি যেন ভাস্কর চলে আসে। আর একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলো।'

তাপস দু'জন কনস্টেবলকে দু'দিকে পাঠায়। একজন ভাস্করকে ডেকে আনে, আরেক জন পাঁচ মিনিটের ভেতর একটা টাক্সি ধরে দেয়।

সমরেশদের সঙ্গে থানার গেটের দিকে যেতে যেতে তাপস বলে, 'কাল তোমার ল-ইয়ার বান্ধবীকে নিয়ে নিশ্চয়ই আসছ ?'

সমরেশ বলে, 'হ্যাঁ।'

'কখন আসবে ?'

'সকালের দিকেই চলে আসব। ধরো আটটা, সাড়ে আটটায়।'

'তাই এসো। দুপুরে আমরা জয়তীকে কোর্টে প্রডিউস করব। তার আগে তোমাদের দেখা হওয়া দরকার।'

সমরেশ উত্তর দেয় না। কেননা এরকম একটা ব্যাপার মনে মনে সে ঠিক করেই রেখেছে।

তাপস এবার বলে, 'জয়তীর জামিন পাওয়ার পসিবিলিটি নেই বললেই চলে। এটা নন-বেইলেবল ক্রাইম। তবু জানি তোমরা চেষ্টা কববে। এখন কথা হচ্ছে, জয়তীর হয়ে কাউকে তো জামিন দাঁড়াতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারো তেমন কাউকে ঠিক করে ফেলো।'

সমরেশ এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলে, 'কাউকেই ঠিক করতে হবে না, আমিই ওর হয়ে জামিন দাঁড়াব।'

তাপস আস্তে আস্তে বলে, 'আমার মনে হয়েছিল তুমিই হয়ত দাঁড়াবে। কিন্তু—'

'কী ?'

সোজা সমরেশের চোখের দিকে তাকিয়ে তাপস জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি সিওর, বেইল পাওয়ার পর জয়তী পালিযে যাবে না ?'

সমরেশ ভেতরে ভেতরে থমকে যায়। এদিকটা সে ভেবে দ্যাখেনি।

আট বছর পর আজ প্রথম জয়তীর সঙ্গে তার দেখা। আর দেখাটা হলো কোথায় ? না, থানার হাজতে। আটটা বছর তো কম সময় নয়। বাইরে থেকে দেখে কিছুক্ষণ আগে তার মনে হয়েছিল, জয়তী হয়ত বদলায় নি, সেই আগের মতোই আছে। কিন্তু এটা তার নিজের তৈরি

করা ধারণা। আট বছরে ভেতরে ভেতরে জয়তী কতটা বদলে গেছে, তিরিশ-পঁয়তিরিশ মিনিট তার কাছে থেকে এবং সামান্য ক'টি কথা বলে তা কি জানা যায়? এটা তো ঠিক, একটা মানুষকে হত্যার উদ্দেশ্যে সে আজই হাতে মারণাস্ত্র তুলে নিয়েছিল যা আট বছর আগের জয়তী ভাবতেও পারত না। জামিন পাওয়ার পর সে যে পালিয়ে যাবে না, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। তখন পুলিশ আর আদালত টানা হ্যাঁচড়া করে তার জিভ বের করে ছাড়বে।

ঠিক একই রকম খটকা দেখা দিয়েছে তাপসের মনেও। সে বলে, 'যা করার খুব ভেবেচিন্তে করবে। নইলে পরে তোমাকে কিন্তু ঝামেলায় পড়তে হবে।'

সমরেশ গলার ভেতর আধফোটা শব্দ করে। কী বলে, পরিষ্কার বোঝা যায় না।

কথায় কথায় ওরা রাস্তায় চলে এসেছিল। সমরেশ এবং ভাস্করকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে তাপস থানার ভেতর চলে যায়।

পাঁচ

অন্য দিন এত রাত্তিরেও রাস্তাটা গমগম করতে থাকে। এ এমন এক শহর যেখানে ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ট্রাফিক জ্যাম লেগেই আছে।

আজ কোন অলৌকিক কারণে কে জানে, রাস্তা বেশ ফাঁকা। বাস, ট্যাক্সি, মিনি, ট্রাক বা অটো তেমন চোখে পড়ছে না, লোকজনের ভিড় টিড়ও নেই।

বিশাল চেহারার শিখ ড্রাইভার তার ট্যাক্সিটা দারুণ স্পীডে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

ব্যাক সীটে সমরেশ আর ভাস্কর পাশাপাশি বসে আছে। ট্যাক্সিতে উঠেই সমরেশ ভাস্করকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'জয়তীর ছবি তুলতে পেরেছ?'

ভাস্কর বলেছে, 'পেরেছি। প্রথম প্রথম দারুণ ঝামেলা করছিল, কিছুতেই তুলতে দেবে না। যত বার ক্যামেরা ফ্ল্যাশ ট্যাশ রেডি করি তত বার কম্বলে মুখ ঢেকে ফেলে। তারপর হাতজোড় করে বলি ফোটো

না নিয়ে গেলে চাকরি চলে যাবে। এই সব ভ্যানতাড়া করার পর তুলতে দিল।'

'ক'টা ছবি তুলেছ?'

'সাত আটটা তো হবেই।'

'গুড।'

এরপর আর কোনো কথা হয়নি।

এই মুহূর্তে দূরমনস্কর মতো জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে সমরেশ। দু'ধারে উঁচু উঁচু সব স্কাইস্ক্রেপার, ল্যাম্পপোস্ট, মাঝে মধ্যে ফুটপাতের ঝুপড়ি দ্রুত সরে যাচ্ছে। বাড়িঘর, রাস্তার তেজী আলো-টালো বা অন্য দৃশ্যাবলী, কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না সমরেশ। কোনো অদৃশ্য জোরালো স্রোত এক টানে তাকে আট বছর আগের সেই দিনগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

আট বছর আগে কলকাতা থেকে সাড়ে তিনশো চারশো কিলোমিটার দূরে সমশেরগঞ্জ ছিল ছবির মতো ছোট্ট, সুন্দর এক শহর। তার এক দিকে মাঝারি একটা নদী বয়ে গেছে, নাম মেঘা। মেঘার জল আয়নার মতো এমনই ঝকঝকে আর স্বচ্ছ যে নিচের বালি কাঁকর নুড়ি বা মাছের ঝাঁক পর্যন্ত দেখা যেত। সারা বছর চুপচাপ মুখ বুজে পড়ে থাকত নদীটা। কিন্তু বর্ষায় তার চেহারা একেবারে পালটে যেত। তখন দুই পাড় ভাসিয়ে তোড়ে ছুটে যেত জলস্রোত। তার গর্জন ছড়িয়ে পড়ত বহুদূরে। ফি বছরই বান ডাকত মেঘায়। শীত-গ্রীষ্মের শান্ত নদীটিকে তখন আর চেনাই যেত না।

নদীটা যেখানে, তার উলটো দিকে শহরের চৌহদ্দি ছাড়িয়েই শুরু হয়েছে চা বাগান। অনেক দূরে চায়ের খেত যেখানে দিগন্তে মিশেছে সেখানে পেনসিলে-আঁকা স্কেচের মতো ঝাপসা পাহাড়ের লাইন।

এখানকার বেশির ভাগ বাড়িই কাঠের, অনেকটা বাংলো ধরনের। অবশ্য কিছু কিছু একতলা দোতলা ইটের বাড়িঘরও ছিল। আর ছিল প্রচুর গাছপালা এবং অজস্র পাখি। চেনা দু-চারটে গাছ এবং পাখি ছাড়া অন্যগুলোর নাম জানত না সমরেশ।

চারটে হাইস্কুল, একটা কলেজ, মাঝারি একটা হাসপাতাল, থানা, এস. ডি. ও'র অফিস, আদালত, এক্সসাইজ অফিস কল, ফ্রুট প্রসেসিং-এর একটা কারখানা, এমনি অনেক কিছুই ছিল সমশেরগঞ্জে। মানুষজন ভদ্র,

শান্ত, পরোপকারী। ছোট জায়গা বলে সবাই সবার চেনা। কারো বিপদে আপদে, দায়ে অদায়ে অন্যেরা ঝাঁপিয়ে পড়ত। সব মিলিয়ে যেন এক বিরাট জয়েন্ট ফ্যামিলি।

এখানে শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের যে ব্রাঞ্চটা ছিল, সমরেশের বাবা কৃষ্ণমোহন ছিলেন তার সর্বেসর্বা। তিনি নিজের চেষ্টায় এবং প্রচণ্ড পরিশ্রমে এই ব্রাঞ্চটা খুলেছিলেন। তখন অন্য কোনো বড় ব্যাঙ্ক সমশেরগঞ্জে আসেনি।

শহর ছোট হলেও ব্যাঙ্কের কাজ-কারবার রম রম করে চলছিল। কেননা চারপাশে যত চা-বাগান, তারা কৃষ্ণমোহনের ব্রাঞ্চে অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। বছরে কয়েক কোটি টাকার লেনদেন হতো।

কৃষ্ণমোহন মানুষটি ছিলেন রাশভারি, গম্ভীর। ব্যাঙ্ক ছাড়া তাঁর মাথায় বিশেষ কিছুই ঢুকত না। ছুটির পর বিরাট ফাইল নিয়ে বাড়ি আসতেন, অনেক রাত জেগে হিসেবপত্র করতেন।

ব্যাঙ্ক থেকে বেশ বড় একটা বাঙলো দেওয়া হয়েছিল কৃষ্ণমোহনকে। সংসার খুব ছোট। তিনি, স্ত্রী হিরন্ময়ী এবং সমরেশ! বাড়ির দিকটা সব সামলাতেন হিরন্ময়ী। সমরেশ তখন স্কুলে পড়ত, ক্লাস ফাইভ কি সিক্সে।

সমরেশদের বাঙলোটা যেখানে, সেই পাড়াতেই থাকত জয়তীরা। ওর বাবা মহেশ্বর সান্যাল ছিল এক চা-বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার। ঢ্যাঙা, হাড় বের-করা, রোগা চেহারা। তোবড়ানো মুখ, শিরা-ওঠা হাত, গাঁট-পাকানো আঙুল। বারো মাস ধুতির তলায় শার্ট গুঁজে তার ওপর কোট পরত। মাথায় থাকত পুরনো শোলার হ্যাট।

ছুটির দিন বাদে রোজ সকাল আটটায় ভাত খেয়ে সাইকেলে চড়ে চা-বাগানের অফিসে চলে যেত মহেশ্বর। তখন সে অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী এবং চূড়ান্ত সামাজিক মানুষ। মুখে স্বর্গীয় হাসিটি লেগে থাকত। সমশেরগঞ্জের মানুষ দেখত, তার পুরনো জং-ধরা সাইকেল ঝক্কর ঝক্কর আওয়াজ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যের পর যে মহেশ্বর ফিরে আসত সে একেবারে আলাদা মানুষ। তখন সাইকেলটা তার বশে থাকত না, এঁকেবেঁকে, টাল খেতে খেতে এগিয়ে যেত। মনে হতো, মহেশ্বর বুঝি এখনই হুড়মুড় করে সীট থেকে নিচে গড়িয়ে পড়বে। কিন্তু অপার্থিব কোনো কৌশলে সাইকেলের হ্যান্ডেল দুটো ধরে সীটের ওপর

-জাবড়ে বসে থাকত সে। মুখ থেকে তখন ভকভক করে দিশী মদের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরুত। গন্ধটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাতাসকে একেবারে মাত করে রাখত।

মদের ঢেকুরের সঙ্গে মহেশ্বরের গলা দিয়ে হিন্দি ফিল্মের চটকদার সব গানের দু-এক লাইন জড়ানো বেতালা সুরে হড়হড় করে বেরিয়ে আসত। 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানি, পাতলুম ইংলিশস্তানি, শরিপে লাল টোপি রুশি...' কিংবা 'চোরি চোরি মেরে গলি আনা হ্যায় বুরা, আকে বিনা বাতকে যানা হ্যায় বুরা', ইত্যাদি। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে অকারণে খিস্তিখেউড়ও করত সে।

সেই ছোট্ট শান্ত নিরিবিলি শহরটার জীবনযাত্রার যা প্যাটার্ন তার সঙ্গে মহেশ্বরের মাতলামো চিৎকার খিস্তিটিস্তি আদৌ মেলে না। এ জন্য সবাই বিরক্ত হত। কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলেই মহেশ্বর ফের বরাবরের মতোই ভদ্র এবং বিনয়ী, হয়ত আগের রাতের বেয়াড়া আচরণের জন্য মনে মনে অনুতপ্তও হতো। কিন্তু অনুশোচনার মেয়াদ মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত নেচে উঠত, কেউ যেন তার গলায় অদৃশ্য বঁড়শি আটকে টানতে টানতে দিশী মদের দোকানে নিয়ে যেত। তারপর ফের হিন্দী গান, খিস্তিখাস্তা, ইত্যাদি। নেশা লোকটাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছিল।

বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হলেও সমশেরগঞ্জের মানুষজন মহেশ্বরকে মোটামুটি মেনে নিয়েছিল। সন্ধ্যের পর লোকটা যে নিজের দখল পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে এবং সেটা যে ইচ্ছাকৃত নয়, এ জন্য মহেশ্বরের ওপর সবার করুণাই হত।

মহেশ্বরের এক মেয়ে, এক ছেলে। জয়তী আর বিশু। জয়তী বড়। ওদের মা আশালতা চিররুগ্ন, বারো মাসই কোনো-না-কোনো রোগে ভুগত। অসুখ তার নিত্যসঙ্গী।

জয়তীর তখন বছর আটেক বয়স। ফর্সা, একমাথা কালো ঘন চুল, পাতলা গড়ন, বড় বড় টানা চোখ, ছোট কপাল। ক্লাস থ্রিতে পড়ত।

আর বিশু ছিল রোগা, ডিগডিগে, কাঠির মতো হাত-পা, সরু গলার ওপর বিরাট মাথাটা বেঢপ দেখাত। যে জামা প্যাণ্টই পরানো যাক, এমন ঢলঢল করত, যেন গা থেকে তক্ষুণি খসে পড়বে।

মোটামুটি এই হলো মহেশ্বরদের পারিবারিক চিত্র। জয়তীরা যে খ্রিস্টান, বহুদিন জানতে পারেনি সমরেশ, জেনেছিল অনেক পরে। ওদের সবারই আসল নামের সঙ্গে একটা করে ক্রিশ্চান নাম জুড়ে দেওয়া ছিল। যেমন জয়তীর পুরো নাম ডরোথি জয়তী সান্যাল, বিশু হলো জন বিশ্বনাথ সান্যাল। ডরোথি বা জন-টন থাকত বার্থ সার্টি-ফিকেট বা স্কুলের প্রোগ্রেস রিপোর্টে। এমনিতে এগুলো কাজে লাগত না।

ছেলেবেলায় জয়তীকে ভাল করে লক্ষই করেনি সমরেশ। আসলে সে ছিল বেজায় মুখচোরা, লাজুক। নিজের থেকে এগিয়ে গিয়ে কারো সঙ্গে মিশতে পারত না।

সমরেশদের বাংলোটা যেখানে, সেখান থেকে খানিকটা এগিয়ে রাস্তার মোড় ঘুরলেই জয়তীদের ছোট্ট কাঠের বাড়ি। স্কুলে যাতায়াতের পথে প্রায়ই জয়তীকে দেখতে পেত সমরেশ। মা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে সে-ও হয়ত স্কুলে চলেছে। নিচু ক্লাসে পড়ত বলে আগে আগেই ছুটি হয়ে যেত জয়তীর। সমরেশের ছুটি হতো দেরিতে। স্কুল থেকে ফেরার পথে সে দেখতে পেত, বাড়ির সামনের রাস্তায় ছোট সাইকেলে করে চক্কর দিচ্ছে জয়তী। হাওয়ায় তার ফ্রক বেলুনের মতো ফুলে উঠত, পনি-টেল করা চুল উড়তে থাকত পতাকার মতো। কোনোদিন বা দেখা যেত বন্ধুদের নিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলছে জয়তী বা হাত-পা নেড়ে নেড়ে গল্প করছে। অল্প বয়সে ও ছিল দারুণ ছটফটে, চঞ্চল।

দূর থেকে দেখতই শুধু সমরেশ, কিন্তু আলাপ-টালাপ হয়নি। সমশেরগঞ্জের প্রায় সব বাড়ির মেয়েরা তাদের বাংলোয় আসত—বিজয়া দশমীতে, লক্ষ্মীপুজোয় বা অন্য কোনো উপলক্ষে। কিন্তু জয়তী বা তার মা প্রথম দিকে কখনও এসেছে কিনা মনে করতে পারে না সমরেশ। ওদের না আসার কোনো কারণ ছিল বলে তার মনে হয় না। অবশ্য অন্য সব বাড়িতেও জয়তীদের খুব একটা যাতায়াত ছিল না।

কয়েক বছর বাদে স্কুল ফাইনাল দিল সমরেশ। দুর্দান্ত রেজাল্ট হয়েছিল তার। পাঁচটা লেটার, সেই সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ। সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে সে হয়েছে থারটীনথ। এত ভাল রেজাল্ট সমরেশের আগে সমশেরগঞ্জের কোনো ছেলে কি মেয়ে করতে পারেনি। চারিদিকে হই চই পড়ে গিয়েছিল।

মনে আছে, রেজাল্ট বেরুবার দিন স্কুলে গিয়েছিল সমরেশ। হেড মাস্টারমশাই-এর কাছেই সুখবরটা সে প্রথম পায়। তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে গাঢ় আবেগের গলায় বলেছিলেন, 'তুমি আমাদের গর্ব। এই স্কুলের, এই শহরের গৌরব বাড়িয়েছ।'

হেড স্যার এবং অন্য মাস্টারমশাইদের প্রণাম করে সমরেশ যখন তাদের বাংলোয় ফিরছে, দেখতে পায় মহেশ্বর সান্যালের বাড়ির সামনে জয়তী আর তার আট-দশটি বন্ধু দারুণ উত্তেজিত ভঙ্গিতে উঁচু গলায় কী সব বলাবলি করছিল।

সমরেশকে দেখতে পেয়ে জয়তীরা একসঙ্গে বলে ওঠে, 'ঐ যে, আসছে রে।' বলেই ঝাঁক বেঁধে সমরেশের দিকে ছুটে আসে।

সমরেশ হকচকিয়ে যায়। ওরা যে তার সম্বন্ধেই এতক্ষণ কথা বলছিল, সেটা বোঝা গেছে। এভাবে মেয়েরা কখনও তাকে ছেঁকে ধরেনি। সমরেশ প্রায় ঘামতে শুরু করেছিল।

এই মেয়েদের সঙ্গে আগে আলাপ টালাপ না হলেও সবাইকেই চেনে সমরেশ, নামও জানে। ওরা হলো রেখা, মণিকা, তৃপ্তি, ধীরা, চিত্রা, মন্দিরা ইত্যাদি।

সবাই একসঙ্গে কলকল করে উঠেছিল, 'কী দারুণ রেজাল্ট করেছেন আপনি! আমাদের কী ভাল যে লাগছে!'

ধীরা বলেছিল, 'আপনার জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি!'

মণিকা বলেছিল, 'হায়ার সেকেণ্ডারিতে ফার্স্ট হওয়া চাই।'

সবার গলা ছাপিয়ে জয়তী বলে উঠেছে, 'আপনি এই শহরের গর্ব।'

ঠিক এই কথাটাই কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন হেড মাস্টারমশাই। চমকে চোখ তুলে আর নামাতে পারেনি সমরেশ। কখন তার অজান্তে জয়তী এত সুন্দর হয়ে উঠেছে, আগে লক্ষ করেনি। ছেলেবেলায় সেই রোগা টিনটিনে চেহারা আর নেই। শরীর ভরে উঠতে শুরু করেছে।

পাতলা টিকলো নাক, সরু চিবুক, ডান গালে মসুর ডালের মতো লাল তিলটা আরো বড় হয়েছে। মুখ ভরাট হযে উঠেছে। হাত-পা নিটোল, ত্বক সিল্কের মতো মিহি এবং মসৃণ। চোখের মণি দুটো আরো কালো হয়েছে। বুক এবং কোমরের ছাঁদ চমৎকার। এস্রাজে ছড় টানার মতো তার গলার স্বর সুরেলা এবং মোহময়। জয়তী তখন পরিপূর্ণ কিশোরী। খুব সম্ভব এইট-টেইটে পড়ত। কোনো এক অদৃশ্য ম্যাজি-

সিয়ান তাকে একেবারে বদলে দিয়েছিল।

আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে আধফোটা নিচু গলায় কী যেন উত্তর দিয়েছে সমরেশ, কিন্তু কিছুই বোঝা যায়নি।

জয়তী এবার বলেছে, 'এমনি এমনি কিন্তু আপনাকে ছাড়া হবে না, আমাদের মিষ্টি খাওয়াতে হবে।'

ভালও লাগছিল খুব, আবার লজ্জায় সঙ্কোচে কারো দিকে, বিশেষ করে জয়তীর দিকে তাকাতে পারছিল না সমরেশ। 'মাকে বলব—' কোনো রকমে এই কথা দুটো বলেই একরকম ছুটে বাড়িতে পালিয়ে এসেছিল সে।

ওর এভাবে পালানোয় খুব মজা পেয়েছিল জয়তীরা। আট-দশটি কিশোরী নতুন বাঁশির মতো সতেজ মিষ্টি গলায় খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

মনে পড়ে, বাড়ি ফিরে মাকে জয়তীদের কথা জানিয়েছিল সমরেশ।

হিরণ্ময়ী বলেছিলেন, 'কী ছেলে রে তুই, ওদের তোর সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন?'

আরক্ত মুখে সমরেশ বলেছে, 'ধুৎ!'

'এত বড় ছেলে হলি, এখনও লজ্জা গেল না! তোকে নিয়ে কী যে করব!'

সমরেশ উত্তর দেয়নি।

একটু চিন্তা করে হিরণ্ময়ী বলেছেন, 'ঠিক আছে, তুই এত ভাল রেজাল্ট করেছিস। আসছে রবিবার কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করব। ওই মেয়েদের বাড়ি গিয়ে বলে আসিস, ওরা যেন সেদিন আসে।'

সমরেশ বলেছিল, 'ওসব আমি পারব না।'

'না পারলে আর কী করা। খেতে চাইল তোর কাছে, নেমন্তন্ন করতে শেষ পর্যন্ত আমাকেই যেতে হবে।'

সমশেরগঞ্জে যাঁরা তাদের খুব ঘনিষ্ঠ, বাবা তাঁদের সবাইকে বলে এসেছিল, রবিবার এসে রাত্তিরে তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে দুটি শাক-ভাত খান। এতে কৃষ্ণমোহনরা খুব আনন্দ পাবেন।

হিরণ্ময়ী সমরেশের কাছ থেকে সেই দশটি মেয়ের নাম জেনে নিয়ে তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন।

হিরণ্ময়ী যাওয়ায় ধীরা, তৃপ্তি, মন্দিরাদের মা-বাবারা খুশি হয়েছিলেন। তবে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল জয়তীর মা আশালতা এবং মহেশ্বর। এত বড় একজন ব্যাঙ্ক অফিসারের স্ত্রী, যাঁদের বাংলোয় ওভারড্রাফট বা অন্য সুযোগ সুবিধার জন্য চা-বাগানের মিলিওনেয়ার মালিকরা ধরনা দিয়ে বসে থাকে, তিনি যে তাদের বাড়ি কোনোদিন আসতে পারেন, মহেশ্বররা ভাবতে পারেনি। কোথায় তাঁকে ওরা বসাবে, কিভাবে খাতির-যত্ন করবে, ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

হিরণ্ময়ী বাইরে বিশেষ খেতেন না, কিন্তু মহেশ্বররা চা, কেক, সন্দেশ না খাইয়ে ছাড়েনি। সমরেশের জন্য তারাও যে গৌরবান্বিত, এ কথাটা যে কতবার করে বলেছে তার ঠিক নেই।

মহেশ্বর এবং আশালতার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন হিরণ্ময়ী। কেন আগে ওদের বাড়ি যাননি বা নিজেদের বাংলোয় ডেকে আনেননি. এ জন্য মনে মনে একটু আক্ষেপও হয়েছিল। এসব সমরেশের জানার কথা নয়, পরে মায়ের কাছ থেকে শুনেছিল।

রবিবার গোটা বাংলো জুড়ে ছিল উৎসবের মেজাজ। হিরণ্ময়ী প্রতিটি ঘর ধুইয়ে, মুছিয়ে, ফুল এবং পাতা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বড় হল্‌-ঘরটায় পেতে দিয়েছিলেন কার্পেট।

প্রায় শ দুই লোক খাবে। রান্নাবান্নার জন্য ঠাকুর আনা হয়েছিল। মেনুটি পরিচ্ছন্ন। রাধাবল্লভী, ফ্রায়েড রাইস, আলুর দম, ফিশ ফ্রাইয়ের সঙ্গে টাটকা মাস্টার্ড, পাকা রুইয়ের কালিয়া, গলদা চিংড়ির মালাই-কারি, চিলি-চিকেন, চাটনি, রসোমালাই আর জলভরা তালশাঁস সন্দেশ।

সন্ধ্যের পর থেকেই নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসতে শুরু করেছিল। মনে পড়ে, প্রথম দিকেই বন্ধুদের নিয়ে এসেছিল জয়তী।

একটা লাল সিল্কের ফ্রক পরেছিল জয়তী। কোমরে সোনালী রঙের চওড়া বেল্ট। পায়ে সাদা জুতো। ডান হাতে রুপোর নকশা-করা রিস্টব্যাণ্ড, বাঁ হাতে ছোট্ট চৌকো ঘড়ি। চুল পেছন দিকে আঁচড়ে আঁট করে লাল রিবনে বেঁধে একটা হর্স-টেল করে এসেছে সে, গলায় লাল-নীল দার্জিলিং পাথরের মালা। কপালে মেরুন টিপ। চোখে কাজলের সরু টান।

অন্য মেয়েরাও বেশ সুন্দর, তারাও যথেষ্ট সেজেগুজে এসেছিল। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না। অলৌকিক

লাল পরীর মতো দেখাচ্ছিল তাকে।

যত লোকজন আসছিল, মা-বাবার সঙ্গে বাইরে গিয়ে খাতির করে সম্মান দিয়ে তাদের হল্-ঘরে এনে বসাতে হচ্ছিল সমরেশকে। কিন্তু ভিড়ের ভেতর থেকে বারবার তার চোখ চলে যাচ্ছিল জয়তীর দিকে। যতবার সে তাকিয়েছে ততবারই জয়তীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেছে। তার মানে জয়তীও তার দিকেই তাকিয়ে থেকেছে। সমরেশের বুকের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হালকা ঢেউয়ের মতো অনবরত কিছু যেন বয়ে যাচ্ছিল।

যারা আসছিল, কিছু না কিছু উপহার দিচ্ছিল সমরেশকে। বেশির ভাগই বই, ফুল, প্যাণ্টের বা শার্টের পীস এবং নানা ধরনের দামী দামী গিফ্‌ট প্যাকেট।

জয়তী দিয়েছিল একটা চমৎকার জাপানী কলম আর সিল্কের নরম গোলাপী রুমাল। সেটার তিন কোণে সবুজ সুতোর তিনটে পাতা আর চতুর্থ কোণে একটা লাল ফুল। সমরেশের হাতে উপহার তুলে দিতে দিতে নিচু গলায় জয়তী বলেছিল, 'ফুলপাতা আমি নিজের হাতে আপনার জন্যে করেছি।'

ধন্যবাদ দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু কিছুই বলতে পারেনি সমরেশ। শুধু টের পেয়েছিল, বুকের ভেতরটা তার ভীষণ কাঁপছে।

নিমন্ত্রিতেরা আসার পর কে যেন বলেছিল, 'খাওয়া-দাওয়ার আগে একটু গান বাজনা-টাজনা হোক।'

এতে কারো আপত্তি নেই উলটে দারুণ উৎসাহ। হই হই করে তক্ষুণি হারমোনিয়াম আর ডুগি-তবলা নিয়ে আসা হয়। একজন নিয়ে আসে বেহালা, আরেকজন মাউথ অর্গান।

অল্পবয়সী বউরা এবং মেয়েরা কেউ গাইল আধুনিক, কেউ রাগপ্রধান, কেউ নজরুলগীতি। ফাঁকে ফাঁকে বেহালা, মাউথ অর্গান, আবৃত্তি। একজন তাসের ম্যাজিক দেখাল।

এর মধ্যে জয়তীর বন্ধু মন্দিরা হঠাৎ বলে ওঠে, 'জয়তী কিন্তু ভাল গান গায়। ওর একটা চান্স পাওয়া উচিত।'

তক্ষুণি সবার চোখ জয়তীর ওপর এসে পড়ে। আদৌ সাধাসাধি করতে হয় না। দু'একবার বলতেই হারমোনিয়ামের সামনে গিয়ে বসে পড়ে জয়তী। হারমোনিয়ামের রিডে আঙুল চালাতে চালাতে চোখ

দুটো অর্ধেক বুজে গাইতে থাকে, 'কী গাব আমি, কী শোনাব, আজি আনন্দধামে—'

চমৎকার সুরেলা গলা। গান শেষ হবার পরও গোটা হল্‌-ঘরের বাতাসে তার রেশ ভাসতে থাকে।

অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে বসে ছিল শ্রোতারা। তারপর একসঙ্গে চারিদিক থেকে অনুরোধ আসতে থাকে, 'আরো একটা গাও—'

পাঁচখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবার পর কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, 'সুপার্ব। ছেলেমানুষ, অনেকগুলো গান গেয়েছে। আর গাইলে টায়ার্ড হয়ে পড়বে। ওকে আর রিকোয়েস্ট করবেন না।' বলে জয়তীর দিকে ফিরেছিলেন, 'তুমি কি গান শেখো মা ?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নেড়েছিল জয়তী।

'কার কাছে ?'

'মা'র কাছে।'

কথায় কথায় জানা যায়, জয়তীর মা আশালতা একসময় ঢাকা রেডিওতে গান গাইত।

কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, 'দেখুন কাণ্ড, এত কাছে এতদিন ধরে একজন গুণী মহিলা রয়েছেন, অথচ আমরা জানতাম না।

ঠিক হয়, কোনো এক ছুটির দিন আসরের ব্যবস্থা করে মা এবং মেয়ের গান শোনা হবে।

যতক্ষণ জয়তী গাইছিল, এককোণে দাঁড়িয়ে পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে সমরেশ। মেয়েটাকে যত দেখছিল তার বিস্ময় এবং মুগ্ধতা ততই বাড়ছিল।

জয়তীর গানের পর সেদিন আসর শেষ হয়েছিল। তারপর হিরণ্ময়ী এবং কৃষ্ণমোহন সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে যত্ন করে খাইয়েছিলেন।

খাওয়া-দাওয়া মিটতে মিটতে বেশ রাত হয়েছিল। একে একে অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। হিরণ্ময়ী এবং কৃষ্ণমোহন জয়তী আর বন্ধুদের তক্ষুণি বাড়ি ফিরতে দ্যান নি। যদিও সমরেশদের সেই ভদ্র শান্ত শহরের কোনো বদনাম নেই, সব দিক থেকেই সমশেরগঞ্জ সম্পূর্ণ নিরাপদ, তবু অত রাতে আট-দশটি কিশোরী নির্জন নিঝুম রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরবে, তা ভাবা যায় না। কৃষ্ণমোহন একটা বড় স্টেশন ওয়াগনে জয়তীদের সঙ্গে ড্রাইভার এবং সমরেশকে তুলে দিয়ে

বলেছিলেন, 'ওদের পৌঁছে দিয়ে আয়।'

হিরণ্ময়ী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেয়েদের ফের আসতে বলে জয়তীর দিকে তাকিয়েছিলেন। বলেছেন, 'একদিন তোমার মাকে নিয়ে এসো।'

জয়তী মাথা সামান্য হেলিয়ে জানিয়েছে—আসবে।

সবচেয়ে কাছে থাকে জয়তীরা। সমরেশরা কিন্তু প্রথমে সেখানে যায়নি। নানা রাস্তা ঘুরে দূরের মেয়েদের আগে পৌঁছে দিয়ে সমরেশ সবার শেষে এসেছিল জয়তীদের বাড়ি। ইচ্ছা, এখান থেকে নিজেদের বাংলোয় ফিরে যাবে।

স্টেশন ওয়াগনের দরজা খুলে জয়তীকে নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল সমরেশ। প্রতিটি মেয়ের বাড়ির সামনে এভাবে নেমে মা-বাবার হাতে তাদের তুলে দিয়ে সুচারুভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে সে।

সমরেশের চোখে পড়েছিল জয়তীর বাড়ির সামনের খোলা বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে আশালতা মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। তার মাথার ওপর একটা জোরালো আলো জ্বলছিল।

সমরেশদের দেখে আশালতা উঠে দাঁড়িয়েছে। সমরেশ বলেছিল, 'ওকে দিয়ে গেলাম।'

আশালতা বলেছিল, 'ভেতরে আসবে না বাবা ?'

'অনেক রাত হয়েছে.। এখন আব—' বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল সমরেশ।

'আরেক দিন এসো কিন্তু।'

'আসব।'

'কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল জয়তী। সে বলেছে, 'কথা দিলেন। কবে আসছেন ?' বলে সরল নিষ্পাপ চোখে সমরেশের দিকে তাকিয়েছিল সে। তার তাকানোর মধ্যে লুকনো ছিল আগ্রহ এবং ব্যাকুলতা।

অনাত্মীয় মেয়ে, বিশেষ করে কিশোরী আর তরুণীদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তখন কুঁকড়ে যেত সমরেশ। যদিও পরীর মতো সেজে এবং রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে জয়তী তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল তবু তার দিকে তাকাতে পারেনি। 'আসব একদিন—' জড়ানো গলায় কোনোরকমে কথাটা বলেই একরকম ছুটে গিয়ে স্টেশন ওয়াগনে উঠেছিল।

নিজেদের বাংলোর দিকে যেতে যেতে কোনো অনিবার্য নিয়মে

একবার পেছন ফিরে তাকিয়েছে সমরেশ। যোসেফ মহেশ্বর সান্যালের কাঠের বাড়ির সামনের বারান্দায় আশালতার পাশে এক অলৌকিক লাল পরী তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

জয়তী যে তাদের বাংলোয় এসেছিল তারপর কী কী ঘটেছে, এতকাল বাদে ধারাবাহিক সে সব আর মনে পড়ে না সমরেশের। স্মৃতিতে যা আছে তা এই রকম।

স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরুবার ক'দিন বাদেই হায়ার সেকেণ্ডারির ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে স্কুলে সে পড়ত সেখানেই ভর্তি হয়েছিল সমরেশ। বাবার ইচ্ছা ছিল, কলকাতার কোনো নামী কলেজে ভর্তি করিয়ে ওখানকার হস্টেলে রেখে পড়াবেন। একটা মাত্র ছেলে, হিরণ্ময়ী দূরে পাঠাতে রাজী হননি।

জয়তীদের বাড়ির সামনে দিয়ে আগের মতোই স্কুলে যেত সমরেশ, ছুটির পর ফিরে আসত। দু'বারই জয়তীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। যাবার সময় তার এবং জয়তীর স্কুলে যাবার তাড়া থাকত। চোখাচোখি হলে দু'জনেই একটু হাসত শুধু। সমরেশ জয়তীর দিকে দু-এক সেকেণ্ডের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারত না, শশব্যস্তে মুখ নামিয়ে রাস্তাটুকু পার হয়ে যেত।

ফেরার সময় দেখা যেত নিজেদের বারান্দায় কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে জয়তী। বেশির ভাগ দিনই একা, কোনো কোনো দিন বন্ধুদের সঙ্গে। সমরেশের মনে হতো, তারই জন্য অপেক্ষা করছে জয়তী।

আগেকার মতো অতটা সংকোচ ছিল না সমরেশের বিকেলে বন্ধুরা সঙ্গে থাকলে জয়তী তার সঙ্গে কথা-টথা বলত না, চোখে চোখে একটু হাসত শুধু। একা থাকলে দু-একটা কথা বলত, সমরেশ চোখ নামিয়ে উত্তর দিত।

'আমাদের বাড়ি কিন্তু এখনও এলেন না!'

'পড়ার খুব চাপ, তাই যেতে পারছি না। আসব একদিন।'

'দেখা হলেই তো ঐ কথা বলেন। আসেন কই? আর বাবা সাধতে পারি না।'

ভীষণ বিব্রত হতো সময়েশ। কী উত্তর দেবে, ভেবে পেত না। কোনো রকমে বলত, 'না না, মানে—'

মনে পড়ে, হায়ার সেকেণ্ডারির ক্লাস শুরু হওয়ার কয়েকদিন বাদে

এক রবিবারের বিকেলে আশালতাকে নিয়ে জয়তী আবার তাদের বাংলোয় এসেছিল। কৃষ্ণমোহন ছিলেন না, ব্যাঙ্কের কী জরুরী কাজে কোনো এক চা-বাগানের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ি গিয়েছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর ডিউটি, সর্বক্ষণ প্রচণ্ড চাপ, ছুটিছাটা বলে কিছু নেই।

বাংলোয় হিরণ্ময়ী আর সমরেশ অবশ্য ছিল। ড্রয়িং রুমের একধারে বসে হিরণ্ময়ী উলের একটা পুল-অভার বুনছিলেন আর অন্য দিকে আঙুল টিপে টিপে বেতালা পিয়ানো বাজাচ্ছিল সমরেশ।

হিরণ্ময়ী যথেষ্ট খাতিরযত্ন করে আশালতা আর জয়তীকে বসিয়ে গল্প শুরু করেছিলেন।

'কতদিন ভেবেছি, আপনি মেয়েকে নিয়ে আসবেন। জয়তীকে সেদিন বলেও দিয়েছিলাম, আপনাকে নিয়ে আসতে।'

'হ্যাঁ, ও আমাকে রোজই আসার কথা বলে কিন্তু আমি এত ভুগি যে প্রায়ই শরীর খারাপ থাকে। আসা আর হয়ে ওঠে না। আজ তো মেয়ে জোর করেই ধরে নিয়ে এল।'

পিয়ানো বাজানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দূরে বসে সমরেশের মনে হয়েছিল, এখানে আসার আগ্রহটা আশালতার চেয়ে জয়তীরই অনেক বেশি।

হিরণ্ময়ী বলেছিলেন, 'খুব ভাল করেছ ধরে এনে। এক জায়গায় থাকি অথচ যাওয়া-আসা নেই। এই যে এলেন, এখন থেকে যখন ইচ্ছে হবে, চলে আসবেন।'

'নিশ্চয়ই আসব। আমরা তো খুব গরীব, তাই বলতে সাহস হচ্ছে না। তবু যদি দয়া করে মাঝে-সাঝে আমাদের ওখানে আসেন—'

'ওভাবে বলবেন না। আমি নিশ্চয়ই যাব। আপনার কী অসুখ-বিসুখের কথা যেন বললেন ?'

আশালতা বলছিল, 'বারো মাস একটা না একটা লেগেই আছে। আজ এটা, কাল সেটা। মাস কয়েক ধরে পেটে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে। গুচ্ছের ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।'

হিরণ্ময়ী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ডাক্তার কী বলছে ?

'ঠিক ধরতে পারছে না। কখনও বলছে কলিকের ব্যথা, কখনও বলছে

গ্যাসট্রিক। মনে হয়, আন্দাজে ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে।'

'কোন ডাক্তারকে দেখাচ্ছেন?'

'নীহার সেনকে।'

'উনি তো জেনারেল ফিজিসিয়ান। ওভাবে ওষুধ খেয়ে কিছু হবে না। আপনি বরং কলকাতায় গিয়ে কোনো স্পেশালিস্টকে দেখিয়ে আসুন। সব রকম পরীক্ষা করে আগে রোগটা ধরা দরকার। তারপর তো চিকিৎসা।'

'কলকাতায় কার সঙ্গে যাই?'

'কেন?' জয়তীকে দেখিয়ে হিরণ্ময়ী বলেছিলেন, 'ওর বাবার সঙ্গে যাবেন।'

'ওর তো ছুটিছাটা একদম নেই। গেল বছর বুনার ঠাকুমার অসুখের সময় একটা মাস গিয়ে ওকে মালদায় থাকতে হয়েছিল। এ বছরের গোড়ায় নিজেই ভুগল বেশ কিছুদিন। জমানো ছুটি সব শেষ। আমার মনে হয় না, অফিস থেকে এ বছর আর ছুটি-টুটি পাওয়া যাবে।' একটু থেমে বলেছে, 'অফিস কামাই করলেই এখন মাইনে কাটা যাবে।'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু রোগটা তো সারানো দরকার।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে আশালতা, তবে আর কিছু বলেনি।

কথার ফাঁকে ফাঁকে কাজের লোককে দিয়ে প্রচুর মিষ্টি-টিষ্টি এবং চা আনিয়েছিলেন হিরণ্ময়ী। যত্ন করে জয়তী এবং আশালতাকে খাওয়াতে খাওয়াতে বলেছিলেন, 'আপনার একটা গুণের কথা শু ছি।'

আশালতা উৎসুক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বলুন তো?'

'আপনি চমৎকার গান করেন। একসময় ঢাকা রেডিওতে গাইতেন।'

'সে সব কোন জন্মের কথা। পার্টিশানের আগে ঢাকায় থাকতাম, তখন আমার বিয়ে হয়নি। একটু আধটু গাইতাম। রেডিওতে চান্স পেয়েছিলাম।'

'আমরা ঠিক করেছি, শুধু আপনাকে আর জয়তীকে নিয়ে একদিন গানের আসর বসাব। মেয়ে কিছু বলে ?

মৃদু হেসে আশালতা জানিয়েছিল, 'বলেছে। কিন্তু অনেক দিন চর্চা নেই। কত বছর বাইরে গাইনি। এই বয়সে গাইতে বসলে লোকে হাসবে।'

'কেউ হাসবে না।' হিরণ্ময়ী বলেছিলেন, 'সাহস করে বসে যাবেন। দেখবেন, ঠিক গাইতে পারছেন।'

আশালতা উত্তর দেয়নি!

হিরণ্ময়ী এবার বলেছেন, 'জানেন, সেদিন জয়তী আমাদের এখানে ক'খানা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইল। চমৎকার গলা। গান শুনে সবাই খুব প্রশংসা করল। জয়তী বলল, আপনার কাছে নাকি গান শেখে।'

আশালতা বলেছিল, মন দিয়ে শেখে আর কই। দশ দিন তাড়া দেবার পর একদিন হয়তো হারমোনিয়াম নিয়ে বসল। চর্চা না রাখলে কি গান হয়?'

হিরণ্ময়ী জয়তীর দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'না না, এটা ঠিক না। গান হলো ঈশ্বরের দান, সবাই কি তা পায়! হেলাফেলা করে এটা নষ্ট করো না। রোজ সময় করে মায়ের কাছে হারমোনিয়াম নিয়ে বসবে।'

আদুরে গলায় জয়তী বলেছিল, 'স্কুলের পড়া-টড়া করে আর গান নিয়ে বসতে ইচ্ছে করে না। তবে মা যা বলল সেটা কিন্তু বিশ্বাস করবেন না মাসিমা। দশ দিনে না, সাত দিনে একবার করে বসি।'

'এখন থেকে রোজ বসবে। যদি শুনতে পাই বসোনি, খুব বকুনি খাবে।' বলতে বলতে হঠাৎ হিরণ্ময়ীর চোখে পড়ল ড্রইং রুমের ও মাথায় পিয়ানোর এলোপাথাড়ি টুংটাং থামিয়ে চুপচাপ বসে আছে সমরেশ। তিনি ডাকেন, 'কিরে ছেলে, অমন ভূতের মতো এখানে এসে বসে রয়েছিস! মাসিমারা এসেছেন, এখানে এসে কথা-টথা বলবি তো।'

পায়ে পায়ে উঠে এসে খানিক দূরে একটা সোফার কোণে বসে পড়েছিল সমরেশ।

জয়তী বলেছিল, 'জানেন মাসিমা, রাস্তায় সমরেশদার সঙ্গে দেখা হলে আমাদের বাড়ি যেতে বলি কিন্তু যায় না। শুধু বলে যাব একদিন।'

আশালতা সস্নেহে হেসে বলেছে, 'বড্ড লাজুক।'

হিরণ্ময়ী বলেছিলেন'এমন মুখচোরা ছেলে পৃথিবীতে আর একটাও নেই।'

সেদিন যাবার সময় জয়তী সমরেশকে বলেছিল, 'আমি দু'দিন আপনাদের বাড়ি এলাম। এরপর যদি আমাদের ওখানে না যান, আর কখনও আসব না।'

হিরণ্ময়ী বলেছিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে।'

স্মৃতির কিংখাবে ঘটনাগুলি পরপর সাজানো নেই। মাকে নিয়ে সেই যে জয়তী তাদের বাংলোয় এসেছিল, তার কতদিন বাদে সমরেশ ওদের বাড়ি গিয়েছিল, এখন আর মনে পড়ে না।

প্রথম যেদিন যায় সেদিন জয়তীরা তাকে নিয়ে কী যে করবে, ঠিক করে উঠতে পারছিল না। যত্ন এবং আপ্যায়নের এতটুকু ত্রুটি হয়নি। জয়তী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের ছোট বাড়িটা দেখিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল।

ঘরটা পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। একধারে সিঙ্গল-বেড খাটে ধবধবে বিছানা। খাটো আলমারি, পড়ার টেবল, চেয়ার, দেওয়ালে তাক বসিয়ে বইপত্র সাজিয়ে রাখা ছিল। প্রতিটি বইয়ে ব্রাউন কাগজের ঝকঝকে মলাট। এক দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, আরেক দেওয়ালে যীশুখ্রীস্টের। একটা নিচু টেবলের ওপর হারমোনিয়াম। বিছানায় ছোট একটা রেডিও পড়ে ছিল।

ঘরে এনে আচমকা জয়তী জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি অনেক রাত পর্যন্ত পড়েন, তাই না ?'

কথাটা ঠিকই। রাত বাড়লে চারিদিক যখন নিঝুম হয়ে যায় সেই সময়টা ছাড়া পড়ায় মন বসাতে পারত না সমরেশ। কিন্তু এ ব্যাপারটা জয়তীর জানার কথা নয়। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করেছে, 'কে বললে ?'

দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে বড় জোড়া জানালা। আঙুল বাড়িয়ে সেটা দেখাতে দেখাতে জয়তী বলেছে, 'ঐ জানালাটা।'

কিছুই মাথায় ঢোকেনি সমরেশের। বিমূঢ়ের মতো সে বলেছে, মানে ?'

'আসুন আমার সঙ্গে।' সমরেশকে সঙ্গে করে জোড়া জানালার কাছে গিয়েছিল জয়তী। এখান থেকে সমরেশদের দোতলা বাংলো বাড়িটাকে ছবির মতো মনে হয়। গাছপালার আড়াল থাকায় একতলাটা ভাল দেখা যায় না, তবে দোতলার দরজা-জানালা, প্রতিটি ঘরের ভেতরের অংশ স্পষ্ট চোখে পড়ে।

দোতলার কোণের দিকের ঘরখানা দেখিয়ে জয়তী বলেছিল, 'ওটা আপনার ঘর না ?

সমরেশ জিজ্ঞেস করেছে, 'কী করে জানলে ?'

'বারে. সারাক্ষণই তো ওখানে আপনাকে দেখি। রাত্তিরে জানালার পাশে বসে পড়েন। মাসিমা কত বার আপনাকে ডাকতে আসেন। পড়া আর শেষ হয় না আপনার !'

এখান থেকে তার ঘরখানা যেমন দেখা যায় তেমনি দোতলার ঐ ঘর থেকেও জয়তীর এই ঘরটা নিশ্চয়ই দেখা যেতে পারে। কিন্তু আগে কখনও এদিকে ভাল করে তাকায়নি সমরেশ। অথচ জয়তী তাকে কতদিন ধরে লক্ষ করে যাচ্ছে, কে জানে। সমরেশ উত্তর না দিয়ে সামান্য হেসেছে।

নিজের ঘর দেখানো হলে জয়তী সমরেশকে নিয়ে বাইরে আসে। তখন রোদ আর নেই। মিহি কালচে পর্দার মতো তাদের সেই ছোট্ট শহরের ওপর সন্ধ্যের পাতলা অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

এই সময় সাইকেলে ঝক্কর ঝক্কর আওয়াজ তুলে টাল খেতে খেতে ফিরে এসেছিল জয়তীর বাবা মহেশ্বর। চোখ লালচে, ঢুলুঢুলু। কপালে এবং গলায় দানা দানা ঘাম। শরীর অল্প অল্প টলছিল।

এ বাড়িতে সমরেশকে দেখে কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে থেকেছে মহেশ্বর। তারপর ভুরুর হাতের ঢাকনা দিয়ে লক্ষ করতে করতে বলেছে, 'তুমি কৃষ্ণমোহনবাবুর ছেলে না ?'

সমরেশ নেশাখোর মহেশ্বরকে দূর থেকে বহুবার দেখেছে কিন্তু তার এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আগে কখনও কথা বলেনি। মাতাল-টাতালদের একেবারেই পছন্দ করে না সে। তার তিন ফুট দূরত্বে দাঁড়ানো মহেশ্বরের মুখ থেকে তখন ভকভক করে তীব্র দিশী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। খুব অস্বস্তি বোধ করছিল সমরেশ। মুখ নামিয়ে কোনোরকমে বলেছে, 'হ্যাঁ।'

'তুমি তো আমাদের এ শহরের রত্ন হে। উই ফীল প্রাউড অফ ইউ।'

সমরেশ উত্তর দেয়নি। কথাটা নতুন না। রেজাল্ট বেরুবার পর থেকে এ জাতীয় মন্তব্য এ শহরের প্রায় প্রতিটি মানুষের মুখে একবার না একবার শুনতে হয়েছে।

মহেশ্বর মদ খেয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু এতটুকু অসভ্যতা বা গোলমাল করেনি। কণ্ঠস্বর যদিও জড়িয়ে যাচ্ছিল, তবু মুখ থেকে বাজে কথা একটিও বেরোয়নি। সমরেশের বয়সী একটি ছেলেকে কী বলা

উচিত, কতটুকু বললে শিষ্টাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে না, সে সম্পর্কে তার যথেষ্ট হুঁশ ছিল।

ভব্যতা প্রথম দিকে বজায় রাখলেও পেটে মদটা তো ঢুকেছে! নেশার মাথায় কখন কী করে বা বলে বসবে সে সম্পর্কে সংশয় থেকেই গিয়েছিল আশালতা আর জয়তীর মনে। তারা ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। অন্তত তাদের মুখচোখ দেখে তাই মনে হয়েছে সমরেশের।

আশালতা বলেছিল, 'তুমি ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদলে নাও। আমি খাবার দিচ্ছি।'

স্ত্রী যে তাকে সমরেশের কাছে থাকতে দিতে চাইছে না এবং এর কারণটা কী, টের পেতে অসুবিধা হয়নি মহেশ্বরের। সে গলার ভেতর খুঁ-খুঁ আওয়াজ করে একটু হেসে বলেছে, 'দুশ্চিন্তার কিচ্ছু নেই। পেটে ঐ জিনিসটা ঢুকেছে বটে, মাথাটা কিন্তু ঠিক আছে। বেতালা কিছু করে বসব না।'

জয়তী মুখ নিচু করে আশালতার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবার জন্য সঙ্কোচে তার মাথা কাটা যাচ্ছিল যেন।

মহেশ্বর এবার সমরেশকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি যে আজ আমাদের এখানে এলে, তোমার বাবা-মা জানেন তো?'

সমরেশ মাথা সামান্য হেলিয়ে বলেছে, 'জানেন।'

'তাহলে একটা বড় সমস্যা কাটল।'

এ বাড়িতে আসার পেছনে কী সমস্যা থাকতে পারে, ভেবে পায়নি সমরেশ। বিমূঢ়ের মতো মহেশ্বরের দিকে তাকিয়েছিল সে

মহেশ্বর বলেছিল, 'আরেকটা জরুরি কথা আছে সমরেশ।'

'কী?' উৎসুক সুরে প্রশ্ন করেছিল সমরেশ।

'আমরা কিন্তু খ্রীস্টান, যদিও সারনেমটা সান্যাল। তিন জেনারেসান আগে আমরা খ্রীস্টান হয়েছিলাম। তবে পদবীটা পালটাইনি, নামের সঙ্গে জুড়েই রেখেছি।'

সেই প্রথম সমরেশ জানতে পেরেছিল জয়তীরা খ্রীস্টান। কিন্তু খাপছাড়াভাবে হঠাৎ এই খবরটা মহেশ্বর কেন জানিয়েছিল, সেদিন বুঝতে পারেনি সমরেশ। এর পেছনে যে গূঢ় ইঙ্গিত রয়েছে, সেটা টের পেতে কয়েকটা বছর পেরিয়ে গেছে, তখন বোঝা গিয়েছিল, মহেশ্বর মাতাল-দাঁতাল যাই হোক না কেন, আসলে যথেষ্ট দূরদর্শী। দিশী মদ

তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা করে দিতে পারেনি।

সমরেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল। কী উত্তর দেবে, সে ভেবে পায়নি।

আশালতা বলেছিল, 'কী আজেবাজে বকছ! ছেলেটা আজ প্রথম এ বাড়ি এল, তাকে এসব বলার কোনো মানে হয়?'

থুতনি নেড়ে নেড়ে তার মার্কা-মারা খুঁ-খুঁ হাসিটি হেসে মহেশ্বর বলেছে, 'আজে-বাজে না, এটাই হলো গিয়ে আদত কথা।' পরক্ষণে সমরেশের দিকে ফিরে বলেছিল, 'আমরা যে খ্রীস্টান, এই খবরটি তোমার মা-বাবাকে আজই দিয়ে দেবে কিন্তু। এটা ভীষণ আর্জেন্ট। আচ্ছা, তোমরা গল্প করো, আমি যাই।' মোটা বেয়াড়া গলায় একটা হিন্দি গানের সুর ভেঁজে তুড়ি দিতে দিতে ওধারের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল সে।

সেদিন বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসেছে জয়তী। তার মা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল।

জয়তী বলেছে, 'বাবার কথায় কিছু মনে করেননি তো?'

সমরেশ আস্তে মাথা নেড়েছে, 'না না।'

একটু ভেবে জয়তী এবার বলেছে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'আপনাকে যে কলমটা দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে লিখেছেন?'

দারুণ রেজাল্ট করার জন্য জয়তী কিছুদিন আগে কলম এবং রুমাল উপহার দিয়েছে। সেগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিল সমরেশ। এবার তা মনে পড়ে যায়। সে বলে, 'না, ওটা যত্ন করে রেখে দিয়েছি।'

জয়তী জিজ্ঞেস করেছে, 'আর রুমালটা?'

'ওটাও।'

জয়তী এবার জানতে চেয়েছে, উপহারের ঐ জিনিস দুটো কবে ব্যবহার করবে সমরেশ।

সমরেশের মুখচোরা ভাবটা হঠাৎ কেটে গিয়েছিল যেন। নিজের অজান্তে সে বলে ফেলেছিল, ও দুটো ব্যবহার করবে না কোনোদিন। চিরকাল কাছে রেখে দেবে। বলেই চমকে উঠেছিল এবং জয়তীর দিকে একবারও না তাকিয়ে এক ছুটে নিজেদের বাংলোয় চলে গিয়েছিল।

সোজা নিজের ঘরে গিয়ে একটা ফাইবারের বাক্স খুলে জয়তীর দেওয়া নতুন জাপানী কলম আর রুমালটা বের করেছে সমরেশ। এই

বাক্সটায় তার যাবতীয় উপহারের জিনিস সাজানো ছিল।

কলম আর রুমাল বের করার কথা আগের মুহূর্তেও ভাবেনি সমরেশ। কোনো অদৃশ্য স্বয়ংক্রিয় নিয়মে এটা করেছিল সে। চকচকে মসৃণ কলমটার গায়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে সেটা একপাশে রেখে রুমালটার ভাঁজ খুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে।

রুমালটা দেবার আগে খানিকটা সেণ্ট ঢেলে দিয়ে থাকবে জয়তী। এতদিন পরও হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ ওটার গায়ে লেগে ছিল।

সেই যে জয়তী এবং আশালতা তাদের বাংলোয় এসেছিল, আর সে গিয়েছিল ওদের ছোট কাঠের বাড়িতে, তখন থেকেই দু'বাড়ির মেয়েদের যাওয়া আসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই আসত আশালতা আর জয়তী, হিরণ্ময়ীও যেতেন। তবে সমরেশ বিশেষ যেত-টেত না। জয়তী তাদের বাংলোয় এলে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প-টল্প করত। আগের মতো লজ্জা-টজ্জা আর ছিল না তার।

জয়তীদের বাড়ি না গেলেও তার ঘরের জানালা দিয়ে জয়তীর ঘরের দিকে মাঝে মাঝেই তাকিয়ে থাকত সমরেশ। যখনই তাকাত, চোখে পড়ত জয়তীও এদিকে তাকিয়ে আছে।

দিনের বেলায় তো বটেই, রাত্তিরেও যতক্ষণ সমরেশ পড়ত, দেখা যেত, জানালার ধারে একখানা বই বা খাতা খুলে বসে আছে জয়তী। তার মতোই সে-ও পড়ত বা লেখালিখি করত। তারপর অনেক রাতে শুতে যাবার সময় উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ত। সমরেশও তা-ই করত। একসময় দু'জনের ঘরের আলো একই সঙ্গে নিভে যেত।

কোনো কোনো দিন স্কুল যাতায়াতের সময় সমরেশ জয়তীকে বলেছে, অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকো কেন ?'

জয়তী বলেছে, 'তুমিও তো জেগে থাকো।' কবে থেকে সে সমরেশকে 'তুমি' করে বলতে শুরু করেছিল, নিজেরই মনে নেই।

'আমার অভ্যাস আছে।'

'আমিও অভ্যাস করে নিচ্ছি।'

'শরীর খারাপ হবে কিন্তু।'

'কিচ্ছু হবে না।'

জয়তীকে বেশি রাত জাগতে বারণ করত ঠিকই, কিন্তু কচিৎ কখনও রাত্তিরে তাকে যদি জানালার পাশে না দেখত, মন ভীষণ খারাপ হয়ে যেত

সমরেশের। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে অদ্ভুত এক নেশার ঘোরে বারবার জয়তীর দিকে তার চোখ চলে যেত। পৃথিবীর সবাই তখন ঘুমের আরকে ডুবে আছে, কোথাও এতটুকু আওয়াজ নেই, মাথার ওপর অসীম আকাশে নক্ষত্রমালা, ভাসমান মেঘদল কিংবা রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ, নিচে ঝাপসা গাছপালা—সমস্ত কিছু জুড়ে অলৌকিক নৈঃশব্দ্য। সেই সময় তারই জন্য একটি কিশোরী জানালার ধারে জেগে বসে আছে, ভাবতেই শিহরণ অনুভব করত সমরেশ। মৃদু গোপন জলস্রোতের মতো তার বুকের তলদেশে অবিরত কিছু একটা বয়ে যেত, বইতেই থাকত।

দেখতে দেখতে আশ্বিন মাস এসে গিয়েছিল। সমশেরগঞ্জে সব মিলিয়ে দশ-বারোটি বারোয়ারী পুজো হতো। কলকাতার মতো হই-চই প্রতিমার বাহার, লাইটিংয়ের ঘটা বা সমারোহ না হলেও আনন্দ হতো খুব। এ শহরের সবাই সবার চেনা। এক পাড়ার মানুষ অন্য পাড়ায় প্রতিমা দেখতে গেলে সমাদর করে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হতো।

সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী—এই তিনদিন প্রতিটি পুজোর প্যাণ্ডেলে হয় যাত্রা, নয় থিয়েটার, কি ম্যাজিক শো কিংবা গান-বাজনার আসর বসত। কলকাতার নাম-করা যাত্রার দল এনে পালা গাওয়ানো হতো। গানের বেলাতেও তাই। কলকাতার রেডিও আর্টিস্ট আর সিনেমার প্লে-ব্যাক সিঙ্গাররা আসতেন। তবে নাটক করত স্থানীয় লোকজনেরা, এর জন্য সেই রথের দিন থেকে রিহাসাল শুরু হয়ে যেত।

পুজোর এই দিন ক'টা কোনো বাড়িতেই কড়াকড়ি তেমন একটা থাকত না। ছেলেমেয়েরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে এক পুজোর প্যাণ্ডেল থেকে আরেক পুজোর প্যাণ্ডেলে দল বেঁধে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াত।

হুজুগে মেতে ওঠা কিংবা হই-চই করা, এ সব একেবারে ধাতে ছিল না সমরেশের। তবু পুজোর চারটে দিন বন্ধুদের সঙ্গে সে-ও প্রতিমা দেখতে বেরুত।

সেবার যে প্যাণ্ডেলেই গেছে, জয়তীর সঙ্গে দেখা হয়েছে সমরেশের। সে-ও তার বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়েছিল। জয়তী বা সমরেশ কেউ কারো সঙ্গে কথা বলেনি, শুধু চোখে চোখে একটু হেসেছে।

ওল্ড টাউন হচ্ছে সমশেরগঞ্জের সবচেয়ে পুরনো পাড়া। সে বছর নবমীর দিন ওখানে জমজমাট প্রেমের নাটক করেছিল ও পাড়ারই যুবক-যুবতীরা। ছাপানো হ্যাণ্ডবিল বিলি করে শহরের সবাইকে নাটক দেখার

জন্য ঢালাও নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওল্ড টাউন ড্রামা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারি আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে অনুরোধ করে এসেছে। কেননা অন্য তিন পাড়ায় কলকাতার তিন বিখ্যাত যাত্রা কোম্পানি পালা গাইবে। স্বাভাবিক কারণেই সেখানে লোকজন বেশি ছুটবে, ওল্ড টাউনের নাটক একেবারে মাঠে মারা যাবে। দর্শক না থাকলে অভিনয় করে সুখ নেই।

জনে জনে বলে আসার কারণে ভিড় মোটামুটি ভালই হয়েছিল। কৃষ্ণমোহন নাটক-টাটক খুব একটা পছন্দ করেন না। গম্ভীর ভারিক্কি চালের মানুষ। সব ব্যাপারে এক ধরনের সামরিক শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। হুজুগে পড়ে দু'দিন রাত জাগবেন, এটা তাঁর স্বভাবেই ছিল না। দৈনন্দিন রুটিনের হেরফের ঘটানোর কথা ভাবতেই পারতেন না তিনি।

অগত্যা সমরেশকে সঙ্গে করে হিরণ্ময়ীকে নাটক দেখতে যেতে হয়েছিল। ওল্ড টাউনে আসতে সমরেশের চোখে পড়েছিল, পুজো প্যান্ডেলের একধারে নাটকের জন্য স্টেজ বাঁধা হয়েছে। সামনের দিকে দর্শকদের জন্য অনেক চেয়ার। ভিড়ের ভেতর আশালতা এবং জয়তী বসে আছে। ওরাও নাটক দেখতে এসেছিল। মহেশ্বর অবশ্য আসেনি।

আশালতা ডেকে নিয়ে তাদের পাশে সমরেশদের বসিয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, নাটক দেখার পর একসঙ্গে ফেরা হবে।

নাটকের নাম 'প্রেমের ফাঁসে'। দুই তরুণ-তরুণীর প্রেম ঘিরে দারুণ মজার সব কাণ্ডকারখানা। শুরু থেকেই ব্যাপারটা জমে গিয়েছিল।

প্রথম অঙ্কের তিনটে সীন শেষ হবার পর চতুর্থ দৃশ্য যখন শুরু হতে যাচ্ছে, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল আশালতা। হিরণ্ময়ীকে বলেছিল, 'আমার শরীর খারাপ লাগছে, বাড়ি চলে যাচ্ছি। বুনা রইল, ও নাটক দেখে আপনাদের সঙ্গে ফিরবে। দয়া করে যদি একটু পৌঁছে দ্যান—'

হিরণ্ময়ী উদ্বিগ্ন মুখে বলেছিলেন, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি দিয়ে আসি।'

'না না, আপনাদের যেতে হবে না। একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে আমি চলে যেতে পারব।'

হিরণ্ময়ী আশালতাকে একা ছাড়তে চাননি, কিন্তু সে কোনো কথা শোনেনি। সাইকেল রিকশা ডেকে চলে গিয়েছিল। যাবার আগে

বলেছিল, 'একা যেতে না পারলে নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে যেতে বলতাম।'

আশালতা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ অস্বস্তি বোধ করেছেন হিরণ্ময়ী। বলেছেন, 'এভাবে একা গেলেন, আমাদের সঙ্গে যেতে দিলেন না। রাস্তায় যদি কিছু হয়ে যায়!'

জয়তীকে খুব চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়নি। সে বলেছে, 'মা'র ওরকম মাঝে মাঝে হয়। কতদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে এইরকম রিকশা ডেকে বাড়ি চলে গেছে।'

তবু উৎকণ্ঠা কাটেনি হিরণ্ময়ীর। বলেছেন, 'ভয়ের কিছু নেই তো?'

'না না। ভাল করে আজকের রাতটা ঘুমোতে পারলে কাল ঠিক হয়ে যাবে।'

হিরণ্ময়ীর পর বসে ছিল সমরেশ। তারপর আশালতা এবং জয়তী। আশালতা চলে যাবার পর হিরণ্ময়ী জয়তীকে সমরেশের পাশের চেয়ারে এসে বসতে বলেছিলেন।

এদিকে শখের থিয়েটার হলেও ওল্ড টাউনের যুবক-যুবতীরা চুটিয়ে চমৎকার অভিনয় করছিল। বিশেষ করে রোমান্টিক দৃশ্যগুলো তারা দারুণ জমিয়ে দিয়েছিল।

একটা দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা যখন পরস্পরের কাছে ঘন হয়ে সংলাপ বলছে সেই সময় সমরেশ টের পেয়েছিল, তার হাতের ভেতর তুলতুলে নরম একটি হাত মোমের মতো যেন গলে গলে যাচ্ছে। কে যে কার হাত আগে ধরেছিল এতদিন বাদে মনে পড়ে না। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারেনি সমরেশ। তার শরীরে এতটুকু শক্তি যেন অবশিষ্ট ছিল না। বুকের ভেতর তখন হাজারটা ঢাক একসঙ্গে বেজে চলেছে। তার মনে হচ্ছিল, ওল্ড টাউনে নাটক দেখতে আসার পর নয়, কতকাল ধরে যেন তারা পরস্পরের হাত ধরে বসে আছে।

ফেরার সময় কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। জয়তীদের বাড়ির কাছে এসে হিরণ্ময়ী বলেছিলেন, 'ভেতরে চলো বুনা, তোমার মা'র খবরটা নিয়ে যাই।

সমরেশ বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। হিরণ্ময়ী কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলেছিলেন, 'বুনার মা এখন ভাল আছে। চল্—'

পরদিন দশমী।

ফি বছর বিকেলে এয়োতীদের সিঁদুরখেলা হয়ে গেলে সমশেরগঞ্জের সবগুলো বারোয়ারী প্রতিমা বাঁশের চালিতে তুলে কাঁধে করে বয়ে নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হতো। শোভাযাত্রার সামনের দিকে বাদ্যকরেরা ঢাক আর কাঁসি বাজাতে বাজাতে যেত। তাদের সঙ্গে বিশাল জনতা।

নদীর পাড়ে সব প্রতিমা জড়ো হলে ধুনুচিনাচ চলত অনেকক্ষণ। ততক্ষণে সন্ধ্যে নেমে যেত। চারিদিক অন্ধকারে ডুবে গেলে হ্যাজাক জেবলে একসঙ্গে সমস্ত প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হতো।

সেবার বিসর্জন দেখে ফিরে আসার পর হিরণ্ময়ী সমরেশকে দিয়ে জয়তীদের বাড়িতে প্রচুর মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজের লোককে দিয়েও পাঠানো যেত। কিন্তু তাতে বড়লোকী চাল থাকে। যেন বিজয়ার মিষ্টি পাঠিয়ে গরীব প্রতিবেশীকে কৃতার্থ করা হচ্ছে। এটা অশোভন মনে হয়েছিল হিরণ্ময়ীর।

জয়তীদের কাছাকাছি বেশ কয়েক বছর থেকেছে সমরেশরা। কিন্তু সেবারই প্রথম বিজয়ার মিষ্টি নিয়ে ওদের বাড়ি গিয়েছিল সে। দারুণ খুশি হয়েছিল জয়তীরা। এবং অভিভূতও।

রাত হলেও কী কারণে যেন সেদিন নেশাটেশা করেনি মহেশ্বর। বহুকালের নিয়মভঙ্গ করে সাদা চোখে বাড়িতেই ছিল। সমরেশ তাকে এবং আশালতাকে প্রণাম করেছে। আশালতা আর জয়তী তাকে মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়েনি।

আসার সময় মহেশ্বর শুধু জিজ্ঞেস করেছিল 'সেই খবরটা মা-বাবাকে জানিয়েছ?'

মহেশ্বর কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। তবু তাকে দেখলে অস্বস্তি বোধ করত সমরেশ। মুখ নিচু করে জানতে চেয়েছে, 'কোন খবরটা?'

'ঐ যে আমরা কৃশ্চান—'

'মা-বাবা বোধহয় জানেন।' বলে আর দাঁড়ায়নি সমরেশ।

মনে আছে, বিজয়ার সময় সে যেমন মিষ্টি দিয়ে এসেছিল, আশালতাও তেমনি সেবার বড়দিনে জয়তীকে দিয়ে ঘরে তৈরি কেক পাঠিয়েছিল।

হিরণ্ময়ী ছিলেন দারুণ মিশুকে। আপন-পর ব্যাপারটা বড় করে তুলে কখনও মাথা ঘামাতেন না। সবাইকে নিয়ে হই-চই করতে ভাল-

বাসতেন। মানুষ মাত্রেই দুঃখ কষ্ট এবং সমস্যা রয়েছে। তবু তার মধ্যে যতটা আনন্দে থাকা যায়। এইরকমই হয়ত ভাবতেন হিরণ্ময়ী।

সে বছর ঠিক হলো, ইংরেজী বছরের শেষ দিনটিতে সমরেশদের পাড়ার সবাই নদীর ধারে পিকনিক করতে যাবে। হিরণ্ময়ী বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন। একদিন নদীর পাড়ে গিয়ে কোথায় পিকনিক করা হবে, সেই জায়গাটা দেখে আসা হলো।

সমরেশদের একটা বড় স্টেশন ওয়াগন তো ছিলই। তাদের পাড়ার অবনী চ্যাটার্জি আর নৃসিংহ বোসদেরও গাড়ি ছিল। একত্রিশ ডিসেম্বর সকালবেলা তিনটে গাড়ি বোঝাই করে সমরেশরা বেরিয়ে পড়েছিল। ক্যারিয়ার ভর্তি হাঁড়ি, কড়া, ডেকচি, মাছ, মাংস, আনাজ, ডিম, ময়দা, তেল, ঘি, মশলা, ইত্যাদি।

পাড়া ফাঁকা করে সকলেই গিয়েছিল। শুধু কৃষ্ণমোহন, মহেশ্বর, এমনি দু-চারজন বাদ। এঁরা হই-হুল্লোড় তেমন পছন্দ করতেন না কিংবা অন্য জরুরি কাজ হয়ত তাঁদের ছিল।

তখন রোদ উঠে গেছে। সবার গায়েই মোটা পুল-ওভার, শাল কি কোট, তবু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপছিল তারা।

সমরেশ আর জয়তী এক গাড়িতে ছিল না। জয়তী সমরেশদের স্টেশন ওয়াগনে আশালতা আর হিরণ্ময়ীর পাশে জানলার ধার ঘেঁষে বসেছিল। সমরেশ উঠেছিল নৃসিংহ বোসদের অ্যামবাসাডরে। গাড়ি দুটো যেন মোটর রেসে ট্রফি জেতার জন্য দারুণ স্পীড তুলে ছুটছিল। চওড়া মসৃণ রাস্তায় কখনও স্টেশন ওয়াগনটা কয়েক ফুট এগিয়ে যাচ্ছিল কখনও বা অ্যামবাসাডরটা। তবে বেশির ভাগ সময় পাশাপাশি ছুটছিল। তখন এধারে ওধারে তাকিয়ে আলতো করে একেক বার সমরেশের হাত ছুঁয়ে নিজের হাতটা টেনে নিচ্ছিল জয়তী। অদ্ভুত এক ঘোরের মতো লাগছিল সমরেশের। তারও ইচ্ছা করছিল, জয়তীর হাতের ওপর হাত রাখে কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠেনি।

একসময়, প্রায় একই সঙ্গে অ্যামবাসাডর এবং স্টেশন ওয়াগন পিকনিক স্পটে পৌঁছে গিয়েছিল। এদের বেশ কিছুক্ষণ বাদে এসেছিল তৃতীয় গাড়িটা।

নদীর পাড়টা চমৎকার। শীতের নদীতে তেমন জল থাকে না। নির্জীব স্রোত নিঃশব্দে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছিল। এপারে ওপারে

বাদামী বালির চওড়া পাড় অনেকদূর চলে গেছে। পাড়ে প্রচুর ঝাউগাছ আর বড় বড় পাথরের চাঁই এলোমেলো ছড়িয়ে ছিল। নদীর ওধারের পাড় থেকে খানিকটা গেলেই মাঝারি হাইটের পাহাড়। নদী, বালির পাড় আর পাহাড়ের মাথায় প্রচুর পাখি উড়ছিল তখন।

গাড়িগুলো থেকে নেমেই বাচ্চাকাচ্চারা বালির ওপর দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছিল। কেউ এনেছে রঙিন বল, কেউ স্কিপিং রোপ, কেউ ক্রিকেটেব সরঞ্জাম। দু-চারটে ছেলেমেয়ে ছোট সাইকেল নিয়ে এসেছিল। বালি উড়িয়ে তারা চক্কর দিয়ে যাচ্ছিল।

রান্নার জন্য দু'জন আর ফাই-ফরমাস খাটার জন্য একটি লোক আনা হয়েছিল। রাঁধিয়ে দুটি তক্ষুনি বালি খুঁড়ে উনুন তৈরি করে চা টোস্ট অমলেট বানাতে শুরু করেছিল। বাকি লোকটা বড় বড় রঙিন গার্ডেন আমব্রেলা পুঁতে তার তলায় শতরঞ্জি বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

ব্রেকফাস্ট করে ক্যামেরা নিয়ে চারপাশে ঘুরতে শুরু করেছিল সমরেশ। অল্প বয়স থেকেই ছবি তোলার দারুণ শখ তার।

পাখি, নদী, পাহাড় এবং নদীতীরের বালিতে শীতের রঙচঙে পোশাকপরা বাচ্চা—এ সবের ছবি সে তুলছিল ঠিকই, কিন্তু তার চোখ ছিল জয়তীর দিকে। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, তার একটা ছবি তোলে। কিন্তু একটা গার্ডেন আমব্রেলার তলায় জয়তী আশালতা, হিরণ্ময়ী এবং অন্য মহিলাদের কাছে বসে ছিল। অবশ্য তারও চোখ ছিল সমরেশের দিকে।

হিরণ্ময়ীদের সঙ্গে জয়তীর একটা গ্রুপ ফটো অবশ্য তোলা যায়। তেমন ছবি পরে তুলবে বলে ঠিকও করে রেখেছিল সমরেশ। তার আগে জয়তীর আলাদা করে একটা ফটো তুলতে হবে। সেটা তাকে গোপনে উপহার দেবে! কিন্তু ফাঁকা জায়গায় জয়তীকে না পেলে ছবি তুলবে কেমন করে? কিছুটা হতাশ হয়েই সে জলের ধারে চলে আসে। একটা সাদা ধবধবে বক একপায়ে জলে দাঁড়িয়ে, আরেক পা গুটিয়ে প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে মাছেদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। দূর থেকে বকের ছবি তুলে সমরেশ ডান দিকে ঘুরতে যাবে, হঠাৎ দেখতে পায় জয়তী একা একা বালির ওপর দিয়ে দূরে যেখানে ঝাউগাছের ঘের, সেদিকে চলেছে।

মুখ ফিরিয়ে একবার গার্ডেন আমব্রেলাগুলোর দিকে তাকিয়েছে সমরেশ। এর মধ্যে পুরুষেরা তাস নিয়ে বসে গেছে। মহিলারা চুটিয়ে

গল্প জুড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে কোনো মজার কথায় দমকা হাওয়ার মতো হাসির আওয়াজ ভেসে আসছিল। নিজেদের নিয়েই ওরা মেতে আছে, অন্য কারো দিকে তাদের লক্ষ নেই।

তবু সন্তর্পণে পা টিপে, টিপে, জলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে জয়তী যেদিকে গেছে, প্রায় ঘোরের মধ্যে সেদিকে চলতে শুরু করেছিল সমরেশ। কোনো গোপন প্রবল স্রোত তাকে যেন টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল।

ঝাউগাছের ঘেরটার কাছে উঁচু উচু ক'টা পাথরের চাঁই। দূর থেকে সমরেশের চোখে পড়ে, একটা চাঁইয়ের আড়ালে চলে যাচ্ছে জয়তী। একটু পর তাকে আর দেখা যায়নি।

দ্রুত পা ফেলে চাঁইটার কাছে চলে এসেছে সমরেশ। কিন্তু জয়তীকে দেখা যায়নি। অসীম ব্যগ্রতায় এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছে, বালির ওপর আঙুল দিয়ে বড় বড় করে লেখা ঃ ছেলেটা এমন হাঁদারাম, কিছুই বোঝে না। একেবারে মায়ের কোলের শিশুটি।

এই লেখা যে তারই উদ্দেশ্যে, বুঝতে অসুবিধা হয়নি সমরেশের। সে এখানে চলে আসবে সেটা যেন আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল জয়তী।

সমরেশ বুঝতে পারে, জয়তীকে দেখা না গেলেও আশেপাশে সে কোথাও আছে এবং তার ওপর লক্ষ রাখছে। বালির ওপর সেই লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা তার মধ্যে কিছু একটা ঘটে যায়। নিজের অজান্তে বালিতে আঙুল বসিয়ে বসিয়ে সেই লেখাটার তলায় লিখে ফেলে ঃ সবই বুঝি কিন্তু মনের কথা বোঝাবার আর্ট জানি না। কেউ যদি জানিয়ে দিত!

লেখার পর মুখ তুলে চারপাশ দেখতে দেখতে নিচু গলায় সমরেশ ডাকে, 'জয়তী, জয়তী—'

সাড়া নেই। শুধু শীতের বাতাস ঝাউবনের ভেতর দিয়ে সর সর করে বয়ে যায়।

এবার যেন জেদ্ চেপে বসে সমরেশের মাথায়। জয়তীকে খুঁজে বের করবেই। এখানে পাথরের চাঁইগুলোর আড়ালে ছাড়া লুকোবার জায়গা নেই।

কাছাকাছি যে সাত-আটটা বোল্ডার বা পাথরের চাঁই পড়ে আছে সে-গুলোর চার পাশে তন্নতন্ন করে খোঁজে সমরেশ, কিন্তু কোথাও নেই

জয়তী। সে আবার প্রথম চাঁইটার কাছে চলে আসে। কি আশ্চর্য, তার লেখাটার তলায় একটা উত্তর লেখা রয়েছেঃ আহা আর্ট জানে না! বোকারাম, ভাজা মাছটি উলটে খেতে শেখো।

লেখাটার দিকে তাকিয়ে দ্রুত কিছু ভেবে নেয় সমরেশ। তার মুখে আলতো লাজুক একটু হাসি ছড়িয়ে যায়। আস্তে আস্তে অনেকখানি ঝুঁকে সে আঙুল দিয়ে লেখেঃ ভাজা মাছ উলটে খেয়ে লিখছি। যে মেয়েটা আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে তাকে ভীষণ, ভীষণ ভালবাসি।

লেখার পর সমরেশের মাথায় একটা দারুণ প্ল্যান এসে যায়। সে জানে, জয়তী তার লেখাটা দেখতে আসবেই। এবার আর বোল্ডারগুলোর আশেপাশে খুঁজতে যাবে না। যেন কতই খোঁজাখুঁজি করছে, এমন একটা ভঙ্গি করে দারুণ ব্যস্তভাবে ডান পাশের গোল চাঁইটার আড়ালে গিয়ে নজর রাখতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে বাঁ দিকের বড় বোল্ডারটার পেছন থেকে জয়তী বেরিয়ে আসে। নিচু হয়ে সমরেশের লেখাটা পড়তে থাকে।

সমরেশ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে জয়তীর মুখের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছিল। ডান গালে মসুর ডালের মতো লাল তিল, ঘন পালকে ঘেরা চোখ, পাতলা নাক, ছোট কপালের ওপর চুলের ঘের, সরু সুছাদ চিবুক—সব মিলিয়ে শীতের সেই মায়াবী সকালে, চারিদিক যখন অঢেল নরম সোনালি রোদে ভেসে যাচ্ছে—জয়তীকে কোনো অপার্থিব মূর্তির মতো মনে হচ্ছিল।

সমরেশের লেখাটা পড়তে পড়তে মুখ লাল হয়ে উঠেছে জয়তীর। ঠোঁট টিপে সে আঙুল দিয়ে কিছু লিখতে শুরু করে।

সমরেশ আর দাঁড়িয়ে থাকে না, বালিতে পা গেঁথে গেঁথে নিঃশব্দে জয়তীর পেছনে এসে দাঁড়ায়। সে তখন লিখছেঃ আমিও বোকারামকে ভালবাসি। দারুণ—দারুণ ভালবাসি।

কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছিল। খাপ থেকে সেটা বের করে জয়তীর ছবি তোলে সমরেশ। বালির ওপর তাদের লেখাসুদ্ধু জয়তী ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায়।

ক্লিক করে শব্দ হতেই চমকে ঘুরে বসে জয়তী। তারপর দু'হাতে মুখ ঢাকে। অস্পষ্ট গলায় ফিসফিস করে বলে, 'আমার ছবি তুললে

কেন।'

শীতের সেই আশ্চর্য সকালটা জাদুকরের মতো সমরেশের সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়েছিল। এক তুড়িতে তার মধ্যেকার মুখচোরা লাজুক কিশোরটি উধাও করে দিয়ে বেপরোয়া কোনো যুবকের সাহস এবং জেদ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

সমরেশ বলেছিল, 'আমার ইচ্ছে। ওঠো—উঠে দাঁড়াও। তোমার আরো ছবি তুলব।'

প্রথমটা ওঠেনি জয়তী, মুখ ঢেকে বসেই ছিল।

সমরেশ খুব কাছে এগিয়ে এসে বলেছে, 'উঠবে না তো ? ঠিক আছে, আমিই তোমাকে তুলছি।' বলে জয়তীর একটা হাত ধরেছিল।

সেই নির্জন নদীর পারে হঠাৎ সেই মুহূর্তে জগতের আদিম কোনো প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যাপারটা ঘটে যায়। দু'হাতে, অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে সমরেশ জয়তীকে তার বুকের ভেতর টেনে নেয়। তার দুই ঠোঁট নত হয়ে জয়তীর দুই নরম ঠোঁটে একাকার হয়ে যায়। নিজের বুকে একটি কিশোরীর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি অনুভব করতে করতে টের পায়, দুটি নরম নিটোল হাত তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। জয়তীর চুল এবং শরীরের ঘ্রাণ, ত্বকের মসৃণতা, কোমল স্তনের স্পর্শ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

মনে পড়ে, অনেকক্ষণ পর তারা মুখ থেকে মুখ সরিয়ে পাথরের সেই চাঁইটার গায়ে হেলান দিয়ে হাত-ধরাধরি করে বসে থাকে। তাদের সামনে বাদামী বালির বিস্তারে সেই লেখাগুলো। নদীর ওপর দিয়ে ট্রিঁহি-ট্রিঁহি আওয়াজ তুলে এক ঝাঁক বুনো টিয়া দূর পাহাড়ের দিকে উড়ে যায়। ওধারের ঝাউবনে বাতাসের অবিরাম সর সর শব্দ। এছাড়া সমস্ত চরাচরে আর কোনো আওয়াজ নেই।

প্রথম চুম্বনের আচ্ছন্নতা তখনও তাদের সমস্ত শরীরে এবং মনে ছড়িয়ে আছে। দু'জনেই অন্যমনস্কর মতো দূরের পাহাড়, শীতের মেঘহীন পরিষ্কার আকাশ, পাখি, ঝাউবন ইত্যাদি দেখছে কিন্তু পরক্ষণে পরস্পরের দিকে তাদের চোখ ফিরে আসছিল। চোখাচোখি হলেই তাদের ঠোঁটে চোখে চিবুকে হাসির আভা ফুটে উঠছিল। এমন হাসি মানুষ জীবনে একবারই হাসতে পারে।

একসময় সমরেশ গাঢ় গলায় বলেছে, 'বুনা, আমার কী ভাল যে লাগছে!'

জয়তী উত্তর দেয় না। পাখির মতো গলা বাঁকিয়ে চোখ সরু করে তাকায়। ডান গালে সেই রক্তাভ তিলটা শীতের রোদে চিকমিক করতে থাকে।

সমরেশ ফের বলে, 'তোমার ভালো লাগছে না!'

সমরেশের নাকে আস্তে টুসকি মেরে জয়তী বলেছে, 'এক নম্বর হাঁদারাম! চলো, এবার ফেরা যাক। অনেকক্ষণ এসেছি। তোমার মা, এতক্ষণে নিশ্চয়ই খোঁজখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।'

খানিকটা বেলা হয়েছে। সূর্য আকাশের ঢাল বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। রোদের তাত ক্রমশ বাড়ছে।

সমরেশের ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। সে বলেছে, 'আরেকটু বসো না।'

'না না, খুঁজতে খুঁজতে ওরা এখানে চলে এলে কী ভাববেন বলো তো!'

'যা খুশি ভাবুক।'

এবার সমরেশের দিকে পুরোপুরি ঘুরে বসেছে জয়তী। পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে মাথাটা আস্তে আস্তে নেড়ে বলেছে, 'দারুণ সাহস বেড়ে গেছে।'

সমরেশ বলেছে, 'বেড়েছেই তো। তুমিই বাড়িয়ে দিলে।'

'কী মিথ্যুক, আমি বাড়িয়েছি!'

'নিশ্চয়ই!'

'কী বলে রে ছেলেটা! নিজের যেন একটুও ইচ্ছে ছিল না?'

সমরেশ আঙুল বাড়িয়ে বালির ওপর জয়তীর সেই লেখাটা দেখিয়ে দেয়, 'বোকারাম, ভাজা মাছটি উলটে খেতে শেখো'। তারপর বলে, 'ওটা কে লিখেছে?'

কপাল কুঁচকে, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে জয়তী বলেছিল, 'বেশ করেছি, লিখেছি। এবার ওঠো, প্লীজ।'

সমরেশ উঠেছিল ঠিকই। তবে সঙ্গে সঙ্গে পিকনিক স্পটে ফিরে যায়নি। তার আগে জয়তীর আরো অনেকগুলো ছবি তুলেছিল, সেই সঙ্গে বালির ওপর দু'জনের সেই লেখাগুলোরও।

ফেরার সময় জয়তী বলেছিল, 'তোমাকে তো একলা পাই না। তুমি আমাদের বাড়ি এলে কি আমি তোমাদের বাংলোয় গেলে দেখা হয়।

আর দেখা হয় স্কুলে যাওয়া-আসার সময়। তখন অন্য লোক থাকে। আমার একদম ভাল লাগে না।'

জয়তীর মনের কথাটা বুঝতে পারছিল সমরেশ। সে ভেবে বলেছে, 'অন্য দিনগুলোতে হবে না, ক্লাস থাকে। রবিবার এখানে আসবে?'

দারুণ উৎসুক দেখিয়েছিল জয়তীকে। সে বলেছে, 'আসব।'

দু'জনে তক্ষুনি ছক তৈরি করে ফেলে। রবিবার দুপুরে বন্ধুদের বাড়ি যাবার নাম করে সাইকেলে চড়ে এখানে চলে আসবে। একসঙ্গে আসবে না তারা। দু'জনে দুই রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে এখানে পৌঁছবে। ফিরবেও সেই ভাবেই।

পরের রবিবার থেকেই তারা নদীর পারে চলে আসত। বালির ওপর দিয়ে পাশাপাশি সাইকেল চালাতে চালাতে কত কথা যে বলত! মাঝে মাঝে একদিকের হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে হাত ধরাধরি করে যেন স্বপ্নের মধ্যে উড়তে থাকত!

কোনো কোনো দিন জয়তী বলত, 'জানো, আমার একেক দিন ভীষণ ভয় করে।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করত, 'কিসের ভয়?'

'যদি ধরা পড়ে যাই?'

'পড়ব না। এই সময়টা কেউ নদীর পাড়ে আসে না।'

'আসে না বলে যে কোনোদিন আসবে না, এমন কোনো কথা নেই।'

একটু চুপ।

তারপর জয়তী ফের বলত, 'কি, উত্তর দিচ্ছ না যে? কী ভাবছ?'

সমরেশ গলায় নকল গাম্ভীর্য এনে বলত, 'ধরা পড়লে বলব, কুমারী জয়তী সান্যাল, বি এ-টা পাশ করলেই তাকে বিয়ে করব। বিয়ের আগে তার সঙ্গে অ্যাডভান্স একটু বেড়িয়ে নিচ্ছি। তাতে আপনাদের অসুবিধাটা কী? দয়া করে নিজেদের চরকায় তেল দিন। আমাদের চরকা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

জয়তীর মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যেত। চোখ নামিয়ে আবছা গলায় বলত, 'ঠিক আছে, কাজের সময় দেখা যাবে।'

হায়ার সেকেন্ডারির টেস্টটা হয়ে যাবার পর কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছিল সমরেশরা।

মনে আছে, দিনের বেলা একসঙ্গে বসে খাওয়ার সময় হতো না তাদের। কৃষ্ণমোহন আটটায় স্নান এবং ব্রেকফাস্ট সেরেই ব্যাঙ্কে চলে যেতেন। তাঁর লাঞ্চ পাঠিয়ে দেওয়া হতো। স্কুল থাকলে সমরেশ বেরুত দশটায়। হিরণ্ময়ীর এত সকালে খাওয়ার অভ্যেস নেই। তাই রাত্তিরের খাওয়াটা একসঙ্গে বসে সবাইকে খেতে হতো। এটাই ছিল সমরেশদের বাড়ির অলিখিত পারিবারিক নিয়ম।

সেদিন রাত্তিরে খেতে বসে কৃষ্ণমোহন হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট কিরকম হবে মনে করছ?'

কৃষ্ণমোহনের কণ্ঠস্বর বেশ গমগমে। তার সঙ্গে এমন কিছু মেশানো ছিল যাতে চমকে উঠেছে সমরেশ। অস্পষ্ট মিনমিনে গলায় সে বলেছে, ভালই হবে।'

'মনে হচ্ছে না। আমার ধারণা, মাধ্যমিকের চাইতে এবার তোমার রেজাল্ট খারাপ হবে।'

সমরেশ উত্তর দেয়নি, মুখ নিচু করে বসে থেকেছে কৃষ্ণমোহনের কথায় সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত ছিল, সেটা তাকে উদ্বিগ্ন এবং চঞ্চল করে তুলেছে।

হিরণ্ময়ী চোখ কুঁচকে অধীর গলায় বলেছিলেন, 'কী হল, ছেলেটাকে ওভাবে বলছ কেন? কোথায় উৎসাহ দেবে, তা না—

হাত তুলে স্ত্রীকে থামিয়ে দিতে দিতে কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, 'আগে কখনও তো বলিনি। আজ যখন বলছি, নিশ্চয়ই কারণ আছে।' বলতে বলতে সমরেশের দিকে ফিরেছিলেন, 'আগে বইটই পড়া কোনোদিকে তাকাতে না। আমারও তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল না। এখন তোমার মনোযোগটা অন্য দিকে খুব বেশি করে গিয়ে পড়েছে। আমাকে তুমি চিন্তায় ফেলে দিয়েছ।'

সমরেশ এবারও চুপ।

হিরণ্ময়ী রীতিমত উৎকণ্ঠিত। বলেছিলেন, 'কী করেছে সমু?'

কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, 'তুমি তো ওর মা। সারাদিন বাড়িতে থাকো। ও কী করছে না করছে, কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে, তোমারই তো জানার কথা।'

'আমি বাপু কিছুই বুঝতে পারছি না।' দিশেহারার মতো বলেছিলেন হিরণ্ময়ী।

কৃষ্ণমোহন সোজাসুজি ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ফাইনাল পরীক্ষা কবে ?'

সমরেশ মুখ তুলতে পারেনি। আবছা, কাঁপা গলায় সমরেশ বলেছে, 'সাড়ে তিন মাস পরে।'

'এই ক'টা মাস নদীর পারে লুকিয়ে লুকিয়ে আর যেও না। অ্যাটেনশানটা পড়াশোনাতেই দাও। ওটা অনেক বেশি জরুরি।'

হিরণ্ময়ী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'লুকিয়ে সমু নদীর পাড়ে যায়, তোমাকে কে বললে ?'

কৃষ্ণমোহন বলেছেন, 'খবর দেবার মতো লোক আমার আছে।'

ব্যাপারটা একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না হিরণ্ময়ী। তিনি বলেছেন, 'তোমার লোক কাকে দেখতে কাকে দেখছে, তাতেই তুমি ছেলেটাকে বকাঝকা করছ !'

'পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যেস আমার নেই। তবে যে লোক ওদের দেখে এসে বলেছে তাকে আমি বিশ্বাস করি। অকারণে মিথ্যে বলার প্রয়োজন তার নেই।'

শেষ কথাটা শুনতে পাননি হিরণ্ময়ী। তিনি বলেছিলেন, 'ওদের মানে ? সমু কি একা যায়নি ?'

কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, 'সেটা পরে তোমার পুত্রের কাছ থেকেই জেনে নিও। আমার মুখ থেকে এখন সেটা না শোনাই বোধহয় বাঞ্ছনীয়।'

সেদিন ভাল করে খেতে পারেনি সমরেশ। তার কান-টান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কোনোরকমে দু-চার গ্রাস মুখে দিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে গেছে। কিছুক্ষণ বাদে হিরণ্ময়ীও এসেছিলেন। মা'র প্রশ্নের উত্তরে সিকি ভাগ সত্যের সঙ্গে বারো আনা মিথ্যের খাদ মিশিয়ে সমরেশ যা বলেছিল তা এইরকম। কয়েক দিন নদীর ধারে সে গেছে ঠিকই এবং জয়তীর সঙ্গে দু-একবার দেখাও হয়েছে। ব্যস, এই পর্যন্ত।

হিরণ্ময়ী কতটা বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর মুখ দেখে বোঝা যায়নি। শুধু বলেছিলেন, 'এখন আর নদীর ধারে যাওয়ার দরকার নেই। তোমার বাবার কথাটা মনে রেখো, রেজাল্ট কিন্তু ভাল করতে হবে।'

এরপর থেকে ভীষণ সতর্ক হয়ে গিয়েছিল সমরেশ। জয়তীকে জানিয়ে দিয়েছিল, ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেছে, নদীর পারে আপাতত না যাওয়াই ভাল। পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর ভাবা যাবে।

নদীর পারে না গেলেও দেখা-টেখা তাদের হচ্ছিলই। রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ে এলেই জয়তীদের বাড়ি। তাছাড়া সন্ধ্যের পর দু'বাড়ির জানালায় দু'জনে বই খুলে বসত। আশালতা তাদের লুকিয়ে চুরিয়ে নদীর ধারে যাওয়ার কথা শোনেনি। মাঝে মধ্যে জয়তীকে নিয়ে সে সমরেশদের বাড়ি চলে আসত। হিরণ্ময়ী তাদের আগের মতোই খাতির যত্ন করতেন। ঘুণাক্ষরেও সমরেশদের লুকিয়ে দেখাসাক্ষাতের কথা আশালতাকে জানাননি। ঘটনাকে অল্প বয়েসের স্বাভাবিক ঝোঁক বলে হয়ত তিনি হালকা করে দেখেছিলেন। কিংবা হই-চই বাধিয়ে ব্যাপারটা জটিল করে তুলতে চাননি।

কিন্তু এভাবে একেবারেই ভাল লাগছিল না সমরেশের। সেই বয়সে আবেগ যখন খুবই তীব্র থাকে, সে টের পেয়েছিল জয়তী তাকে কতটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আশালতা এবং হিরণ্ময়ীর সামনে দু-একটা মামুলি কথা বলে বা রাত্তিরে এক শ' গজ দূরের এক আলোকিত জানালার পাশে বসে থাকা জয়তীকে দেখে তার বুকের ভেতরটা শুধু তোলপাড় হয়ে যেত। পড়াশোনায় মন বসাতে পারছিল না সমরেশ। জয়তীকে আলাদা করে নির্জন জায়গায় পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠে-ছিল সে। তার ব্যাকুলতা একদিন মধ্যরাতে তাকে এক টানে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল।

সমরেশদের বাংলোর পেছন দিক দিয়ে জমাদারদের যাতায়াতের জন্য একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি ছিল। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে চোরের মতো সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সোজা জয়তীদের জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে।

এভাবে, এত রাতে সমরেশ আসতে পারে, এটা জয়তীর কাছে অভাবনীয়। সে চমকে উঠে বলেছে, 'এ কি, তুমি!'

সমরেশ বলেছিল, 'তোমাকে একা পাচ্ছি না, কী খারাপ যে লাগছে! কাল বিকেলে চা বাগানের ওধারে যে ফাঁকা মাঠটা রয়েছে, সেখানে চলে যেও।' নদীর ধারে যাওয়ার কথা বলতে সাহস হয়নি তার। কেউ আবার কৃষ্ণমোহনকে যে খবর দেবে না, এমন গ্যারান্টি নেই।

সমরেশের সঙ্গে নিরিবিলিতে দেখা করার ব্যগ্রতা জয়তীর কম ছিল না। তরল আবেগ তার মধ্যেও টগবগ করে ফুটছিল। সেই সঙ্গে কৃষ্ণ-মোহনের বিরক্তি এবং অসন্তোষের ব্যাপারটাও তার মাথায় ছিল। তাদের

মেলামেশা সম্পর্কে কৃষ্ণমোহনের মনোভাব সমরেশই তাকে জানিয়ে দিয়েছে।

একটু চিন্তা করে জয়তী বলেছে, 'না না, এখন থাক। কেউ দেখে ফেলে তোমার বাবাকে লাগালে বিচ্ছিরি একটা কাণ্ড হয়ে যাবে। তা ছাড়া—'

'কী'

'তোমার পরীক্ষা এসে গেছে। রেজাল্ট খারাপ হলে তোমার বাবা ভাববেন আমার জন্যেই হলো। আগে পরীক্ষাটা হয়ে যাক।'

জয়তীর মধ্যে দুর্দান্ত একটা ব্যাপার ছিল। সে যেমন ভেসে যেতে পারত, আবার প্রচণ্ড স্রোতের মাঝখানে অনড় দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও তার ছিল। ইচ্ছা করলে নিজেকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারত। সেদিক থেকে সমরেশ ভীষণ দুর্বল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি তার ছিল না। যতদিন মুখচোরা ছিল, কারো দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারত না কিন্তু একবার যখন কুণ্ঠা, সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠেছে, প্রবল তোড়ে সে ভেসে গিয়েছিল। নিজেকে করতলে আটকে রাখার ক্ষমতা বা সংযম তার ছিল না।

এরপর রোজ রাত্তিরে সারা শহর নিঝুম হয়ে গেলে সমরেশ জয়তীর জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াত। জয়তী তাকে বোঝাত, এভাবে এলে পড়াশোনার ক্ষতি হবে, রেজাল্ট ভাল করতে পারবে না সমরেশ।

কিন্তু এ সব সমরেশের কানে ঢুকত না। সেই সময়টা সে যেন অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে থাকত। শুধু বলত, 'তোমার কাছে না এসে পারি না বুনা।' কিংবা 'তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।'

সেই মধ্যরাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও একজন কিন্তু জেগে থাকত। তার চোখে ঘুম ছিল না। সে আড়ালে থেকে তাদের ওপর আগাগোড়া লক্ষ্য রাখছিল।

মনে পড়ে, একদিন জয়তীর সঙ্গে সে কথা বলছে, সেই সময় কার একটা হাত কাঁধের ওপর এসে পড়েছিল। দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সমরেশ। চমকে মুখ ফেরাতেই দেখে মহেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা পলকের জন্য থেমে পরক্ষণে দারুণ জোরে লাফাতে শুরু করেছিল সমরেশের। গলগল করে ঘাম বেরিয়ে জামা-টামা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। চারিদিকের দৃশ্যাবলী দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল যেন।

মনে হচ্ছিল, পায়ের ওপর ভর দিয়ে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে যাবে।

সমরেশকে হাতেনাতে ধরার পরও হই চই বাধিয়ে লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে আনেনি মহেশ্বর। তার মন উত্তেজনাশূন্য। শান্ত, অচঞ্চল ভঙ্গিতে বলেছিল, 'এসো আমার সঙ্গে।' জয়তীকে বলেছিল, 'তুই বারান্দায় আয়। আমরা ওখানে যাচ্ছি।'

কোনো অদৃশ্য যান্ত্রিক নিয়মে মহেশ্বরের পেছনে পেছনে সমরেশ রাস্তার দিকের খোলা বারান্দায় চলে এসেছিল। ততক্ষণে জয়তীও এসে গেছে।

আলো জেবলে মহেশ্বর দু'জনকে বেতের চেয়ারে বসিয়ে নিজে তাদের মুখোমুখি বসেছিল। বলেছিল, 'রোমিও জুলিয়েটদের মৃত্যু নেই। তারা চিরকাল বেঁচে থাকে।'

হুট করে রোমিও জুলিয়েটের উপমাটা সেদিনের মধ্যরাতে মহেশ্বর কেন টেনে এনেছিল, সমরেশ বুঝতে পারেনি। মুখ নীচু করে সে আর জয়তী চুপচাপ বসে থেকেছে।

সন্ধ্যেবেলায় যে নেশাটা মহেশ্বর করেছিল তার কিঞ্চিৎ ঘোর তখনও হয়ত থেকে গিয়েছিল। চোখ সামান্য লাল, মুখ থেকে দিশী মদের ফিকে গন্ধ বেরুচ্ছিল। তবে মাথা-টাথা টলছিল না, কথায় জড়তাও ছিল না।

মহেশ্বর এবার বলেছে, 'প্রেম জিনিসটা ভালই। তবে তার হ্যাপি এণ্ডিংটা আমি পছন্দ করি। পরিণাম খারাপ হলো, মিলন ঘটল না, এই নিয়ে হা-হুতাশ, জীবন বরবাদ হয়ে যাওয়া, এ সব দেখলে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। লাইফটা ইয়ার্কি মেরে নষ্ট করার জিনিস নয়।'

একদমে কথাগুলো বলে সামনাসামনি বসে থাকা দুই শ্রোতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিল মহেশ্বর। তারপর জোরে শ্বাস টেনে ফের আরম্ভ করেছে, 'তোমাদের ওপর অনেকদিন ধরেই নজর রাখছি। নদীর ধারে দু'জনে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে। সমরেশ, মাঝরাতে তুমি এসে বুনার সঙ্গে কথা বলো। আমার তাতে একটুও আপত্তি নেই। তোমাদের যা বয়েস তাতে এটা কোয়াইট ন্যাচারাল। কিন্তু একটা প্রবলেমও যে রয়েছে।'

সমরেশ এক পলক মহেশ্বরের দিকে তাকিয়ে তক্ষুনি চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

মহেশ্বর থামেনি, ‘এরকম ফুরফুরে হাওয়ায় ভেসে মিষ্টি মিষ্টি ভালোবাসার কথা বলে চিরকাল তো কাটানো যাবে না। এর এণ্ডটা কোথায় ভেবে দেখেছ ?’

মহেশ্বরের কথাগুলোর মধ্যে যে ইঙ্গিতটা রয়েছে সেটা ধরতে পারছিল সমরেশ। জয়তীর সঙ্গে তার মেলামেশার পরিণতি কী, সেটা তার কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না। সে কোনো উত্তর দেয়নি।

মহেশ্বর বলেই যাচ্ছিল, ‘দেখ, আমরা গরীব আর তোমরা আমাদের তুলনায় বেশ বড়লোক। তোমার বাবা একজন বড় অফিসার, তাঁর বিরাট সোসাল স্টেটাস রয়েছে। আর আমি টি গার্ডেনের ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টে ছোট কাজ করি। তার ওপর মাতাল। তোমরা হিন্দু, আমরা ক্রিশ্চান। বুঝতেই পারছ, আমাদের মধ্যে কত রকমের বাধা। সেগুলো পেরুনো ইমপসিবল।’

এবার সোজাসুজি মহেশ্বরের দিকে তাকিয়েছিল সমরেশ। তার বুকের ভেতরটা অদৃশ্য ঢেউয়ে তখন উথাল পাথাল হয়ে যাচ্ছিল।

মহেশ্বর সমরেশের দিকে চোখ রেখে তখনও বলে যাচ্ছে, ‘এই বাধা-গুলো যদি পেরুতে পারো, ফাইন। না পারলে ব্যাপারটা এখানেই স্টপ করে দিতে হবে।’

এতক্ষণে গলায় স্বর ফুটেছিল সমরেশের। সে বলেছে, ‘আমার ওপর সব ছেড়ে দিন। পড়াশোনাটা শেষ করি, তারপর আপনি যা চাইছেন তা-ই হবে। আশা করি মা-বাবাকে আমি বুঝিয়ে রাজী করাতে পারব।’

‘ভেরি গুড। সেই আশায় ক’টা বছর কাটিয়ে দেওয়া যাক। তবে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রাখছি।’

‘কী ?’

‘তোমাদের বয়েসটা তো খারাপ ! এমন কিছু ক’রো না যাতে বুনার ক্ষতি হয়ে যায়। আমাদের সোসাইটি ভীষণ ক্রুয়েল। মেয়েদের দুর্নাম রটলে তাকে সবাই মিলে টরচার করে শেষ করে দেয়।’

মহেশ্বর পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল, বিয়ের আগে যেন শোভনতা বজায় রেখে চলে সমরেশরা এবং কোনো কারণেই দৈহিক ঘনিষ্ঠতা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়।

চোখ নামিয়ে সমরেশ বলেছিল, ‘আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।’

মনে পড়ে, এত সবের পরেও হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্টও ভাল হয়েছিল সমরেশের। এবারও ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ।

জয়তীকে সে বলেছে, 'দেখলে তো, মাঝরাতে তোমার কাছে এলেও স্কলারশিপ পেয়েছি।'

জয়তী বলেছে, 'না এলে রেজাল্টটা আরো ভাল হতো।'

'না এলে তোমার ভাল লাগত?'

'হুঁ।'

'তাহলে রাত জেগে বসে থাকো কেন?'

নাক কুঁচকে জয়তী বলেছিল, 'কারো জন্যে রাত জাগতে আমার বয়ে গেছে।'

এধার ওধার দেখে আলটপকা চুমু খেয়ে জয়তীকে থামিয়ে দিয়েছিল সমরেশ।

হায়ার সেকেণ্ডারির পর নতুন ঝঞ্ঝাট দেখা দিল। কৃষ্ণমোহনের ইচ্ছা সমরেশ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে হস্টেলে থেকে বি. এ পড়ুক। তার যা রেজাল্ট, যে কোনো সেরা কলেজ তাকে নিয়ে নেবে।

স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ার সময় কলকাতার ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন দেখত সমরেশ। তখন জয়তীর সঙ্গে আলাপই হয়নি। কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারির পর জয়তীকে ছেড়ে কলকাতায় যাবার কথা ভাবতেই পারছিল না। জয়তীও তাকে বলেছিল, 'তুমি চলে গেলে আমি বাঁচব না।'

এদিকে কৃষ্ণমোহন তাকে কলকাতায় পাঠাবার তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফর্ম পাঠাবার হস্টেলে থাকার নিয়মাবলী জানানোর জন্য চিঠি লিখেছিলেন।

সমরেশ কী করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। অস্থির, দিশেহারা অবস্থা তখন তার। কৃষ্ণমোহন এমনই গম্ভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ যে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলা যাচ্ছিল না—আমাকে কলকাতায় পাঠাবেন না।

সমস্যাটা কেটে গিয়েছিল অপ্রত্যাশিত এবং খানিকটা নাটকীয় ভাবেই। সমশেরগঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল একদিন সকালে কৃষ্ণমোহনের কাছে এসে হাতজোড় করে আর্জি জানিয়েছিলেন, সমরেশকে তিনি তাঁর কলেজে পেতে চান। সমরেশ এই শহরের ছেলে এবং এখানকার গর্ব। সে তাঁর কলেজ থেকে ভাল রেজাল্ট করলে কলেজের সুনাম হবে, তাঁদের

মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে। সমরেশের পড়াশোনায় যাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি নজর রাখবেন।

প্রিন্সিপ্যালের আন্তরিকতা ভাল লেগেছিল কৃষ্ণমোহনের। শেষ পর্যন্ত সমশেরগঞ্জের কলেজেই সমরেশকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন তিনি।

আরো একটা বছর কেটে গিয়েছিল। সমরেশ যখন বি. এ ফার্স্ট ইয়ারে, সেবার জয়তী মাধ্যমিক পাশ করল। ভাল রেজাল্ট হয়েছিল। ফার্স্ট ডিভিসান, সঙ্গে দুটো লেটার।

এই সময়ই মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে যায়।

আশালতার শরীর অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছিল। ওয়েট কমে যাচ্ছিল দ্রুত। চামড়া ফুঁড়ে হাত-পা এবং কণ্ঠার হাড় ঠেলে অনেকটা বেরিয়ে পড়েছিল। চোখের কোলে গাঢ় কালির চিরস্থায়ী ছোপ। গলার কাছে শিরাগুলো মোটা হয়ে ফুটে উঠেছিল।

ধুঁকে ধুঁকে কোনোরকমে এই পৃথিবীতে টিকে ছিল আশালতা। হঠাৎ একদিন তার গলা দিয়ে অনেকখানি রক্ত উঠল। যে ডাক্তার বরাবর দেখে আসছিল, তাকে ডাকা হলো। রক্ত দেখে সে ঘাবড়ে যায় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় নিয়ে যেতে বলে।

দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে অগত্যা আশালতা, জয়তী আর ছোট ভাই বিশুকে সঙ্গে করে কলকাতায় চলে যায় মহেশ্বর।

স্পেশালিস্ট দেখিয়ে ওরা সমশেরগঞ্জে ফিরে আসার পর জানা যায়, আশালতার ক্যানসার হয়েছে। দ্রুত অপারেসান করা দরকার।

কিন্তু অপারেসান যে করাবে তার জন্য অনেক টাকা দরকার। অথচ হাতে একটা বাড়তি পয়সা নেই মহেশ্বরের। মাসের শেষ মাইনের টাকাটাই তার যা ভরসা।

এ সব কথা সমরেশকে কোনোদিন বলেনি জয়তী। কার কাছে সমরেশ শুনেছিল, এতকাল বাদে আর মনে পড়ে না। সে খবর পাচ্ছিল, কলকাতা থেকে ফেরার পর টাকার জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে মহেশ্বর। তার জানাশোনা দু'চার জনের বাড়ি নাকি ধার করতেও গিয়েছিল। একদিন তাদের বাংলোতেও এসেছিল মহেশ্বর। হাতজোড় করে কৃষ্ণমোহনের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিল যদি ব্যাঙ্ক থেকে কিছু 'লোন' বের করে দেওয়া যায়। কৃষ্ণমোহন তাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন,

খালি হাতে ব্যাংক থেকে 'লোন' মেলে না। বাড়িঘর, জমি-জমা বা গয়না-গাঁটি থাকলে মর্টগেজ রেখে টাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মহেশ্বর জানিয়েছিল, স্থাবর-অস্থাবর কোনোরকম সম্পত্তিই তার নেই। তারপর হতাশ মানুষটা ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে চলে গিয়েছিল।

মহেশ্বর চলে যাবার পর ভয়ে ভয়ে কৃষ্ণমোহনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সমরেশ। বলেছে, 'বাবা, কোনোভাবেই কি টাকার ব্যবস্থা করা যায় না?'

কৃষ্ণমোহন তার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলেছেন, 'ব্যাঙ্কের তো কিছু নিয়মকানুন আছে। সে সব ভাঙার ক্ষমতা আমার নেই।'

'টাকা না পেলে আশালতা মাসিমা কিন্তু মারা যাবেন।'

'ভদ্রমহিলার প্রতি আমার যথেষ্ট সিমপ্যাথি আছে কিন্তু আমি কী করতে পারি বলো?'

সমরেশ বুঝতে পারছিল, লক্ষ লক্ষ টাকা নাড়াচাড়া করলেও যা খুশি করার উপায় নেই কৃষ্ণমোহনের। তাঁর হাত-পা নানাভাবেই বাঁধা।

সমরেশ এই সময়টা প্রায় দিশেহারাই হয়ে পড়েছিল। কিভাবে জয়তীদের সাহায্য করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে মনস্থির করে ফেলেছিল, হিরণ্ময়ীকে ধরবে। মা'র নিজস্ব কিছু টাকা আছে। তার থেকে মহেশ্বরকে যদি দেওয়া যায়।

কিন্তু মাকে টাকার কথা বলার আগেই মারাত্মক দুর্ঘটনাটা ঘটে যায়।

একদিন সকালে দোতলায় নিজের ঘরের জানালার পাশে বসে সমরেশ পড়ছে, হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল পুলিশের একটা জীপ তীব্র হর্ন দিয়ে জয়তীদের বাড়ির সামনে এসে থামল। সেটা থেকে জনচারেক আর্মড কনস্টেবল নিয়ে একজন সাব ইন্সপেক্টর নেমে দ্রুত বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢোকে এবং মিনিট পাঁচেক বাদে মহেশ্বরের হাতে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে ফিরে আসে।

আশালতা, জয়তী আর বিশু কাঁদতে কাঁদতে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। তারা পুলিশ অফিসারকে হাতজোড় করে কী যেন বলছিল, এত দূর থেকে বোঝা যায়নি। সাব ইন্সপেক্টরটাও জোরে জোরে হাত নেড়ে কী একটা উত্তর দিয়ে মহেশ্বরকে জীপে তুলে চলে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক এবং অভাবনীয় যে বেশ কিছুক্ষণ

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থেকেছে সমরেশ। তারপর বইটই ফেলে যখন নিচে নামতে যাবে, চোখে পড়েছিল, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে আশালতারা তাদের বাংলোর দিকেই আসছে।

সমরেশ সিঁড়ি দিয়ে নিচে ড্রইং রুমে নেমে আসতেই আশালতারা ওধারের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল।

হিরণ্ময়ী আর কৃষ্ণমোহন চা খেতে খেতে কথা বলছিলেন। আশালতা সোজা কৃষ্ণমোহনের পায়ের কাছে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে বলেছিল, 'আমাদের বাঁচান।'

হিরণ্ময়ী এবং কৃষ্ণমোহন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি পা গুটিয়ে নিয়ে কৃষ্ণমোহন বিব্রতভাবে বলেছিলেন, 'ওপরে উঠে বসুন—'

আশালতা কিছুই যেন শুনতে পায়নি, মেঝে থেকে সে ওঠেনি, বরং অন্ধের মতো কৃষ্ণমোহনের দু'পা আঁকড়ে ধরে বলেছিল, 'আপনি রক্ষা না করলে আমরা একেবারে শেষ হয়ে যাব।'

সমরেশ ড্রইং রুমে ঢোকেনি। ভেতর দিকের দরজার কাছে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। জয়তী এবং বিশু সমানে কেঁদে যাচ্ছিল। কৃষ্ণমোহনের ওপর আশালতাদের কেন যে এত আস্থা ভেবে পাচ্ছিল না সমরেশ। স্পষ্ট করে না বললেও জয়তীদের সম্পর্কে বাবার মনোভাব খানিকটা খানিকটা আন্দাজ করতে পারত সে।

এদিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেঝে থেকে আশালতাকে তুলে নিজের পাশে বসিয়েছিলেন হিরণ্ময়ী।

কৃষ্ণমোহন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হয়েছে আপনাদের ?'

পুলিশের হানা দেওয়া এবং মহেশ্বরকে হাত-কড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিল আশালতা।

কৃষ্ণমোহন চমকে উঠেছিলেন, 'হঠাৎ মহেশ্বরবাবুকে পুলিশ অ্যারেস্ট করল কেন ?'

'বুঝতে পারছি না।'

'হয়তো তাঁর বিরুদ্ধে বড় রকমের কোনো অভিযোগ রয়েছে।'

'আমরা কিচ্ছু জানি না। আপনি দয়া করে একবার থানায় গেলে ওকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে।'

কৃষ্ণমোহন একটু চিন্তা করে বলেছিলেন, 'আমার কথায় কি আর ছেড়ে দেবে ! অ্যারেস্ট যখন করেছে তখন কিছু একটা গোলমাল আছেই।

যাক, ব্যাঙ্কে গিয়ে থানায় একটা ফোন করব। দেখি, ওরা কী বলে—'

সমরেশ বুঝতে পারছিল, থানায় যাবার আদৌ ইচ্ছা নেই বাবার। আশালতাদের তিনি এড়াতে চাইছেন। ব্যাপারটা ভাল লাগেনি তার। প্রায় মরিয়া হয়েই সে বলেছে, 'বাবা, তুমি ব্যাংক থেকে ফোন ক'রো। আমি এক্ষুনি একবার থানায় যাচ্ছি। ও. সি-কে তো চিনি, আমাকে স্নেহ করেন। কথা বলে দেখি, মেসোমশাইকে যদি ছাড়িয়ে আনা যায়।'

ছেলে যে তাঁর মনোভাবটা ধরে ফেলেছে, এতে অস্বস্তি বোধ করে-ছিলেন কৃষ্ণমোহন। মুখচোখ দেখে অন্তত তা-ই মনে হয়েছিল। পরক্ষণে তাঁর কপাল কুঁচকে গিয়েছিল। কর্তৃত্বের সুরে বলেছিলেন, 'তোমাকে যেতে হবে না! ব্যাঙ্কে যাবার পথে থানায় গিয়ে আমিই ও. সি'র সঙ্গে কথা বলব।'

কৃষ্ণমোহনকে অমান্য করার সাহস ছিল না সমরেশের। তিনি যখন কথা দিয়েছেন, অবশ্যই থানায় যাবেন কিন্তু মহেশ্বরকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে তাঁর কতটা আন্তরিকতা থাকবে, সে সম্বন্ধে খানিকটা খিঁচ থেকে গিয়েছিল সমরেশের।

মনে আছে, সেদিন কলেজে যায়নি সমরেশ। প্রায় সারাটা দিন বাড়িতে ছটফট করে কাটিয়ে দিয়েছে। দুপুরে একবার শুধু লুকিয়ে জয়তীদের বাড়ি গিয়ে ভরসা দিয়ে এসেছিল, কৃষ্ণমোহন যখন থানায় গেছেন, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। ওদের ভরসা দিলেও নিজে খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না সমরেশ।

সন্ধ্যের আগে আগে ব্যাংক থেকে কৃষ্ণমোহন যখন ফিরে এসেছিলেন, তাঁর মুখ থমথম করছে। তাঁকে দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়েছিল সমরেশ। ভয়ানক দমে গিয়েছিল সে। বাংলোয় ঢুকে কারো সঙ্গে কথা বলেননি কৃষ্ণমোহন। অফিসের পোশাক-টোশাক না বদলে ড্রইং রুমে মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে পড়েছিলেন।

হিরণ্ময়ী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হলো, বাথরুমে যাও। আমি চা নিয়ে আসছি।'

প্রায় ধমকে উঠেছিলেন কৃষ্ণমোহন, 'কিচ্ছু আনতে হবে না।'

গম্ভীর রাশভারি হলেও কারো সঙ্গেই রূঢ় ব্যবহার কবতেন না কৃষ্ণমোহন। হিরণ্ময়ী হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হলো তোমার?'

কৃষ্ণমোহন আগের স্বরেই বলেছিলেন, 'তোমাদের কথামতো আমি থানায় গিয়েছিলাম। ঐ স্কাউন্ড্রেলটাকে কোন চার্জে অ্যারেস্ট করা হয়েছে জানো ?'

বাবা কখন ফিরবেন সে জন্য সারাদিন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করেছে সমরেশ। তিনি ড্রইং রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্কাউন্ড্রেল শব্দটা কার সম্পর্কে বলা হয়েছে তা বুঝতে তার অসুবিধা হয়নি। সমরেশ ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়েছিল।

হিরণ্ময়ী এমনিতে ভীতু মানুষ। তিনি বলেছিলেন, 'কেন ?'

কৃষ্ণমোহন এবার যা বলেছিলেন তা এইরকম। মহেশ্বর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য কাল তার অফিসের ক্যাশ ভেঙেছে। সাড়ে আট হাজার টাকা। এর আগেও অল্প স্বল্প সরিয়েছিল। তবে একসঙ্গে এত টাকা এই প্রথম।

হিরণ্ময়ী আঁতকে উঠেছিলেন, 'তাহলে উপায় ? পুলিশ নিশ্চয়ই ওকে ছাড়বে না।'

কৃষ্ণমোহন উত্তর দেননি।

হিরণ্ময়ী এবার বলেছিলেন, 'ফ্যামিলিটা একেবারে পথে বসে যাবে। স্ত্রীর অসুখের জন্য ভদ্রলোকের মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। ইস, কী সর্বনাশটাই না করে বসল !'

কৃষ্ণমোহন খেপে উঠেছিলেন, 'ওদের জন্যে কাঁদুনি না গাইলেও চলবে। তোমার নিজের কতটা ক্ষতি হয়েছে তার খবর রাখো ?'

হিরণ্ময়ী বিমূঢ়ের মতো বলেছিলেন, 'মানে !'

'স্কাউন্ড্রেল চোরটা আমাকে দেখে কী বললে জানো ?'

'কী ?'

'বললে সে চোর ছ্যাঁচোড় হতে পারে, কিন্তু তার মেয়ে ঐ জয়তী ফুলের মতো পবিত্র। তাকে যেন আমরা ঘেন্না না করে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলি। বোঝো ব্যাপারটা।'

হিরণ্ময়ী হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'কী বলছ তুমি !'

কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, 'ঠিকই বলছি।' তারপরেই যেন বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল। সমরেশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে গলার স্বর আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি, 'ঐ চোরটার এতবড় সাহস হয়েছে কার জন্যে জানো ? এই উল্লুকটার জন্যে। মহেশ্বর থানার লোকদের সামনে পরিষ্কার বললে, আপনার ছেলে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে

কথা দিয়েছে। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল আমার স্ট্রোক হয়ে যাবে।'

হিরণ্ময়ী দিশেহারার মতো একবার স্বামীর দিকে, আরেক বার ছেলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কী বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না।

কৃষ্ণমোহন থামেননি। কণ্ঠস্বর একই জায়গায় রেখে চিৎকার করে যাচ্ছিলেন, 'রোজ রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তুই লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ চোরের মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে যাস?'

উত্তেজনায় রাগে কৃষ্ণমোহনের চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল। শরীরের সব রক্ত যেন সেখানে গিয়ে জমা হয়েছে।

সমরেশ উত্তর দেয়নি, মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে। গল-গল করে ঘামতে শুরু করেছিল সে।

হিরণ্ময়ী ভীষণ বিচলিত হয়ে বলেছেন, 'মহেশ্বরবাবু নিশ্চয়ই তোমাকে এ সব লাগিয়েছে। আর তাই শুনে তুমি ছেলেটাকে এভাবে ধমকাচ্ছ!'

কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, মহেশ্বর বলেছে। আর এর প্রতিটি বর্ণ সত্যি। তোমার ছেলের মুখচোখ দেখে বুঝতে পারছ না?' তারপরই দুই হাত নেড়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'লেখাপড়া ছাড়িয়ে এবার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করো।'

হিরণ্ময়ী দু' হাতে মুখ ঢেকে সমরেশের উদ্দেশে শুধু ধিক্কার দিয়েছিলেন, 'ছি ছি—'

কৃষ্ণমোহন দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন, 'একে অন্য জাত, তার ওপর চোর, মাতাল। এইরকম একটা লোকের মেয়েকে তোমার পুত্র বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছেন। জানাজানি হলে আমাদের সোসাল প্রেস্টিজের কী হবে ভেবে দেখেছ? লোকে গায়ে থুতু দেবে।' চিৎকার করতে করতে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জোরে শ্বাস টানতে টানতে ফের শুরু করেছেন, 'জুতিয়ে আমি ওর প্রেম ছুটিয়ে দেব। আজ রাত্তিরেই জামাকাপড় গুছিয়ে দেবে। কাল সকালে আমার সঙ্গে ও কলকাতায় যাবে। এখানে আর থাকার দরকার নেই।'

সমরেশ চমকে উঠেছিল। সমশেরগঞ্জে জয়তীদের বিপন্ন ফেলে রেখে কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারছিল না সে। তার মাথার ভেতরটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। মুখ তুলে প্রায় মরিয়া হয়েই সমরেশ বলেছে, 'বাবা, দু'মাস পর আমার সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার পরীক্ষা। এ সময়

কলকাতায় গেলে—' পড়াশোনার ওপর জোরটা দিয়েছিল সে। জয়তীকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে, সেটা তার পক্ষে তখন বলা সম্ভব ছিল না।

কৃষ্ণমোহন চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। আরক্ত চোখে সমরেশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'রেডি হয়ে নাও, কালই আমার সঙ্গে তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে।'

পরদিনই কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে কলকাতায় চলে গিয়েছিল সমরেশ। একটা কলেজে তাকে ভর্তির ব্যবস্থা করে হস্টেলে রেখে দিন কয়েক বাদে সমশেরগঞ্জে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর ট্রান্সফারের বন্দোবস্ত করে হিরণ্ময়ীকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। সমশেরগঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সমরেশদের।

কলকাতায় কৃষ্ণমোহনের ব্যাঙ্কের হেড অফিস। সেখানে বড় পোস্ট দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সেই সঙ্গে বেহালায় ব্যাঙ্কের কোয়ার্টারও।

কোয়ার্টারে যাবার পর হস্টেল থেকে সমরেশকে নিজেদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন কৃষ্ণমোহনরা।

প্রথম প্রথম ভীষণ খারাপ লাগত সমরেশের। জয়তীকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিল সে। একটারও উত্তর পায়নি। তার মনে হয়েছিল দুঃখে এবং অভিমানে জয়তী তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায় না। একসময় চিঠি লেখা সে বন্ধ করে দেয়।

মনে আছে, সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার মাস কয়েক বাদে এসপ্ল্যানেডে হঠাৎ অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। অনিমেষ সমশেরগঞ্জ কলেজে তার সঙ্গে পড়ত। তার কাছে শুনেছিল, অফিসের ক্যাশ ভাঙার জন্য এক বছরের জেল হয়ে গিয়েছিল মহেশ্বরের। নিজেকে বাঁচাবার জন্য ল-ইয়ার নেয়নি সে, আপীলও করেনি। আদালতে দোষ স্বীকার করে শাস্তিটা মাথা পেতে নিয়েছিল।

আরো কিছু ভয়াবহ খবর দিয়েছিল অনিমেষ। জেলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে মহেশ্বর। দড়িটা কোত্থেকে যোগাড় করেছিল কেউ তার হদিস দিতে পারেনি।

মহেশ্বরের এমন আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুর পর জয়তীরা সমশেরগঞ্জ ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, কাউকে জানিয়ে যায়নি। অনিমেষের ধারণা, কলকাতায় বা জলপাইগুড়িতে জয়তীরা তাদের কোনো আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে থাকবে।

শুনে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল সমরেশের। বেশ কিছুদিন ঘুমোতে পারত না সে, খেতে বসে ভাতটাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ত। ক্লাসে অধ্যাপকদের লেকচারগুলো মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেত। সারাক্ষণ চুপচাপ দূরমনস্কর মতো বসে থাকত। তীব্র অপরাধবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত যেন। কৃষ্ণমোহন যদি আরেকটু হৃদয়বান, আরেকটু সহানুভূতিশীল এবং সে নিজে যদি কিছুটা সাহসী হতো, জয়তীদের এমন পরিণতি ঘটত না। এই বিশাল পৃথিবীতে তিনটি ঠিকানাহীন মানুষকে কোথায় খুঁজবে, ভেবে পাচ্ছিল না সমরেশ।

জীবন একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না। সময় সমরেশের অপরাধবোধ এবং দুঃখের তীব্রতাকে ধীরে ধীরে জুড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতা মেট্রোপলিস তার প্রতিদিনের টগবগে উত্তেজনা, অস্থিরতা এবং চাঞ্চল্যের মাঝখানে তাকে দ্রুত টেনে নিয়ে গেছে। ক্রমশ দূরে সরে গেছে জয়তী।

তারপর কখন যে আটটা বছর কেটে গেছে, সমরেশের খেয়াল নেই। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সময় নিঃশব্দে বেরিয়েই যাচ্ছে। এর মধ্যে তার নিজের জীবন এক জায়গায় আটকে থাকেনি। সমশেরগঞ্জ থেকে কলকাতায় আসার দু'বছরের মধ্যে কৃষ্ণমোহন মারা যান। ব্যাঙ্কের কোয়ার্টার ছেড়ে পার্ক সার্কাসের এক ভাড়া বাড়িতে উঠে যেতে হয়েছিল সমরেশদের। সেখানে থাকতেই বি. এ, এম. এ আর ল' পাশ করেছে। সুচিত্রার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকায় সাউথ ক্যালকাটায় ফ্ল্যাট কিনেছে। অবশ্য ঐ টাকায় হয়নি, কিছু লোনও করতে হয়েছে।

সমরেশের জীবনে সবচেয়ে চমকে দেবার মতো যে ব্যাপারটা তা হলো তার চাকরি। সমশেরগঞ্জের সেই ভীরু মুখচোরা লাজুক ছেলেটা এখন একজন দুর্ধর্ষ ক্রাইম রিপোর্টার।

তার স্মৃতিতে জয়তীর মুখ অনেকখানি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। মেঘা নদীর পারে পিকনিক করতে গিয়ে এক শীতের সকালে তার অজস্র ছবি তুলেছিল সমরেশ। তার কয়েকটা প্রিণ্ট কলকাতায় নিয়ে এসেছিল সে। প্রথম প্রথম সেগুলো প্রায়ই আলমারি থেকে বের করে দেখত। ইদানীং ফোটোগুলোর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

আশ্চর্য, এত কাল বাদে জয়তীর সঙ্গে থানার হাজতে আবার দেখা হলো!

…ট্যাক্সিটা কখন যে 'দৈনিক মহাভারত'-এর বিশাল বাড়িটার গেটে এসে থেমেছে, খেয়াল ছিল না সমরেশের।

পাশ থেকে ভাস্কর ডাকে, 'সমরেশদা, আমরা এসে গেছি।'

চমকে সামনের দিকে তাকায় সমরেশ। তারপর দ্রুত ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ে।

ছয়

'দৈনিক মহাভারত'-এর অফিসটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সামনে ফুলের বাগান, নুড়ির রাস্তা, ফোয়ারা। পেছনে গ্যারেজ। মাঝখানে বিরাট বিরাট থামওলা পুরনো আমলের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি।

একতলায় পাশাপাশি প্রেস আর কম্পোজিং ডিপার্টমেণ্ট। আর আছে রিসেপসান, বিজ্ঞাপন এবং সার্কুলেসান বিভাগ। দোতলার গোটাটা জুড়ে নিউজ আর এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেণ্ট। তেতলায় অ্যাডমিনিস্ট্রেসান, অ্যাকাউণ্টস, ক্যাশ ইত্যাদি নানা বিভাগ।

সারা দেশে 'লার্জেস্ট সার্কুলেটেড' অর্থাৎ সর্বাধিক প্রচারিত আট-দশটি কাগজের একটি হলো 'দৈনিক মহাভারত'। সপ্তাহের সাত দিন ষোল পৃষ্ঠা দেওয়া হয়, রবিবার ম্যাগাজিন নিয়ে চব্বিশ পাতা। প্রতিটি পাতায় প্রচুর বিজ্ঞাপন।

পাঠকের ওপর 'দৈনিক মহাভারত'-এর দুর্দান্ত প্রভাব। মুহূর্তে যে কোনো ব্যাপারে এই পত্রিকা জনমত তৈরি করে দিতে পারে। এখানে একটা চাঞ্চল্যকর খবর বা সম্পাদকীয় বেরুলে চারিদিক তোলপাড় হয়ে যায়। গভর্নমেণ্ট থেকে শুরু করে সব পলিটিক্যাল পার্টি এ কাগজকে সমীহ করে চলে। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেসম্যান, খেলোয়াড়, চিত্রতারকা, নাট্যকর্মী, থেকে আণ্ডারওয়ার্ল্ডের কুখ্যাত লোকজনেরা পর্যন্ত 'দৈনিক মহাভারত'-এর প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তাদের সম্বন্ধে কিছু লেখা হয়েছে কিনা। এই কাগজের অনেক রিপোর্ট আর এডিটোরিয়াল নিয়ে স্টেট অ্যাসেম্বলি এবং দিল্লির পার্লামেণ্টে ঝড় বয়ে গেছে।

গেটের কাছে ঝকঝকে উর্দি-পরা দারোয়ান একটা টুলে বসে ছিল।

সমরেশকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বলে, 'নমস্তে—'। 'দৈনিক মহাভারত'-এ সমরেশের গুরুত্ব যে অনেকখানি সেটা দারোয়ান জানে। নইলে পাঁচশ' কর্মীর সবাইকে সম্মান জানানো সে প্রয়োজন বোধ করে না।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বড় বড় পা ফেলে নুড়ির রাস্তার ওপর দিয়ে মেন বিল্ডিং-এ চলে আসে সমরেশ। একতলায় বাঁ দিকে রিসেপসান, এত রাত্রে সেখানে কেউ নেই। ডান দিকে কাঁচের ঘরের ওধারে সারি সারি পি. টি. এস নিয়ে কম্পোজিটাররা বসে আছে। তার ওধারে প্রেস। দু জায়গাতেই এখন দারুণ ব্যস্ততা।

চওড়া শ্বেত পাথরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আসে সমরেশ। তার পেছনে পেছনে ভাস্কর।

সমরেশ ভাস্করকে বলে, 'স্টুডিও থেকে ছবিগুলো ডেভলাপ আর প্রিণ্ট করিয়ে নিয়ে এসো। পনেরো মিনিটের ভেতর আমার টেবলে চাই।'

নিউজ ডিপার্টমেণ্টের শেষ মাথায় প্রসেসিং সেকসান এবং স্টুডিও। ভাস্কর সেদিকে চলে যায়।

নিউজ ডিপার্টমেণ্টটা বিরাট একটা হল-ঘরে। একধারে পর পর রিপোর্টারদের টেবল। আরেক দিকে সাব এডিটর, সিনিয়র সাব-এডিটররা বসে। মাঝখানে নিউজ এডিটর, ডেপুটি নিউজ এডিটর, চিফ সাব এডিটর, চিফ রিপোর্টারদের বসবার ব্যবস্থা। অবশ্য এদের নিউজ ডিপার্ট মেণ্টের ধার ঘেঁষে আলাদা আলাদা চেম্বার রয়েছে।

সাব এডিটরদের টেবিলগুলোর পাশে পি. টি. আই. এবং ইউ. এন. এর টেলিপ্রিণ্টার। প্রায় সারাদিনই খটখট আওয়াজ তুলে সে দুটো নানা খবর পাঠিয়ে যায়।

এখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। এটা খবরের কাগজে সবচেয়ে ব্যস্ততার সময়। কেননা, টেলিপ্রিণ্টারের খবর অনুবাদ করে, রিপোর্টারদের আনা যাবতীয় 'স্টোরি' কম্পোজ করিয়ে, ছবির নেগেটিভ করে ষোল পাতা মেকআপ করতে করতে বেশ রাত হয়ে যায়। টাইম-ফ্রেম ঠিক করা আছে। ঠিক দেড়টার ভেতর সব পাতা প্রসেস ডিপার্টমেণ্টে না পাঠাতে পারলে চারটের মধ্যে কোনোভাবেই ছাপা সম্ভব না। কাজেই এখন রিপোর্টার, সাব এডিটর, চিফ রিপোর্টার, কারো দম ফেলার ফুরসত নেই। সবার স্নায়ু টান টান। ঘাড় গুঁজে সবাই লিখে যাচ্ছে।

নিউজ এডিটর ভবতোষ সমাদ্দার সাব এডিটরদের 'কপি' ঠিক করতে করতে হঠাৎ পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গিয়ে সমরেশকে দেখতে পান। সর্বক্ষণই স্নায়বিক চাপে রোগা পাকানো চেহারার মধ্যবয়সী ভবতোষের চুল খাড়া হয়ে থাকে। এই সময়টা তাঁর টেনসান এক লাফে কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তাঁর ভয়, দেড়টার মধ্যে বুঝি পাতা ছাড়া যাবে না।

ভবতোষ বিদ্যুৎগতিতে পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান। জোরে জোরে হাত নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, 'এত দেরি করে ফেললে! সেই কখন থেকে ঘড়ি দেখছি। আমার একেবারে স্ট্রোক হয়ে যাবার যোগাড়।' প্রতি পাঁচটি বাক্যে একবার স্ট্রোকের ব্যাপারটা আসবেই। এটা তাঁর কথার মাত্রা।

সমরেশ বলে, 'কী করব! হাসপাতালে গেলাম, সেখান থেকে থানায়। ছবি তুলতে ইণ্টারভিউ নিতে সময় লাগবে না?' বলতে বলতে কাছে এগিয়ে আসে।

ভবতোষের টেবিলের উলটো দিকে বসে আছে ডেপুটি নিউজ এডিটর নিরঞ্জন বসাক। কড়ে আঙুল আর অনামিকার মাঝখানে একটা জ্বলন্ত সিগারেট আটকানো রয়েছে। ঘুম এবং স্নানের সময়টুকু বাদ দিলে ঐ দুই আঙুলের ফাঁকে দিনরাত ওভাবে সিগারেট ধরানো থাকে। নিরঞ্জন চেইন স্মোকার। গাঁজার কলকের মতো সিগারেটে একটা টান দিয়ে গল-গল করে ধোঁয়া ছেড়ে সে বলে, 'দুই জায়গায় ঘুরলা। মাল কিছু পাইছ? কাইল ফাটাইয়া দিতে পারবা তো?'

অন্যমনস্কর মতো সমরেশ বলে, 'দেখা যাক।'

নিরঞ্জন একটা চোখ কুঁচকে বলে, 'শুনলাম যারে আরেস্ট করছে সে একজন যুবতী মাইয়া—ইয়ং গার্ল। জিনিসখান কেমুন?'

হঠাৎ খেপে যায় সমরেশ, 'আপনার টেস্ট ভীষণ খারাপ। আমি রিপোর্ট করতে গিয়েছিলাম, কারো রূপ যৌবন মাপতে যাইনি।' বলেই খেয়াল হয়, মেয়েটা জয়তী এবং তার সম্পর্কে এ জাতীয় মন্তব্য করা হয়েছে বলেই কি মাথায় রক্ত চড়ে গেল? অথচ সে জানে নিরঞ্জন চমৎকার মানুষ, তার মধ্যে এতটুকু নোংরামি নেই। নেহাত মজা করার জন্যই কথাটা বলেছে। তাছাড়া সে জানবেই বা কী করে, ক্রিমিনাল মেয়েটি কে এবং তার সঙ্গে একদিন সমরেশের কতটা গভীর সম্পর্ক ছিল।

নিরঞ্জন রাগ করে না। সিগারেটে ফের লম্বা টান দিয়ে বলে, 'আরে ব্রাদার, চটো ক্যান? আমরা সকলেই জানি, তুমি হইলা একালের জিতেন্দ্রিয় শুকদেব। ঠাট্টাও বোঝ না!'

সমরেশ হেসে ফেলে, 'আপনাকে নিয়ে পারা যায় না।'

নিরঞ্জন কী বলতে যাচ্ছিল, হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দেন ভবতোষ। শশব্যস্তে বলেন, 'নো মোর টক। নিরঞ্জন ওকে এবার লিখতে দাও। সমরেশ তোমার টেবিলে গিয়ে বসো।' দূরে দেয়ালের গায়ে ওয়াল ক্লকটার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলেন, 'অলরেডি দশটা চল্লিশ। সাড়ে এগারটার মধ্যে কপি না পেলে—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই ওধার থেকে নিরঞ্জন বলে ওঠে, 'স্ট্রোক হইয়া যাইবে।'

ভবতোষ ভুরু কুঁচকে বলে, 'ইয়ার্কি মেরো না।'

ভবতোষ বা সমরেশের পেছনেই শুধু না, সবার পেছনেই লেগে থাকে নিরঞ্জন। ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশুদ্ধ মজা।

হাসতে হাসতে নিজের টেবিলে চলে গিয়ে প্যাড নিয়ে বসে পড়ে সমরেশ। দ্রুত কপি লেখার ব্যাপারে তার যথেষ্ট সুনাম।

হাসপাতালে নিশানাথের মৃতপ্রায় বেহুঁশ অবস্থা, ডাক্তার শুভাশিস দত্তর ইণ্টারভিউ, নিশানাথের মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে চেয়ে চাপা গলায় কোনো অবাঙালির ফোন, থানায় গিয়ে জয়তীর ইণ্টারভিউ, নিজের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সমশেরগঞ্জে তার কম বয়সেঃ কথা ইত্যাদি মালমশলা দিয়ে কপি তৈরি করতে ঠিক চল্লিশ মিনিট লাগল সমরেশের। 'কপি'টা নিয়ে সে সোজা ভবতোষের টেবিলে আসে। বলে, 'পড়ুন—'

ভবতোষ অসীম ব্যগ্রতায় প্রায় ছোঁ মেরে সমরেশের হাত থেকে লেখাটা নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলেন। তারপর সমরেশের কাঁধে হাত রেখে নিজের পাশে বসিয়ে বলেন, 'সুপার্ব কপি। কাল সেনসেসান হয়ে যাবে। মেয়েটা সম্পর্কে এত খবর এত ডিটেলে জানলে কী করে? ওকে চেনো নাকি?'

ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠে সমরেশ। মুখে কিছু বলে না, শুধু অল্প একটু হাসে।

ভবতোষ খানিক চিন্তা করে বলেন, 'তুমি যা লিখেছ, তার মধ্যে কতটা এক্সক্লুসিভ?'

'জয়তী সান্যালের ইণ্টারভিউ আমি ছাড়া আর কোনো রিপোর্টার পায়নি। ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড হিস্ট্রি, হাজতের ভেতর ওর ছবি, হাসপাতালের কেবিনে নিশানাথবাবুর ফোটো, অবাঙালির মিস্টিরিয়াস ফোন, এ সবই এক্সক্লুসিভ। আর কোনো পেপারে কাল দেখতে পাবেন না।' এক দমে কথাগুলো বলে সমরেশ থামে।

ভবতোষ সমরেশের হাত ধরে সস্নেহে মৃদু চাপ দ্যান। বলেন, 'কেন তোমার ফ্ল্যাটে বার বার বিনয়কে পাঠিয়েছি, এবার বুঝতে পারছ? তুমি ছাড়া এত ইনফরমেসান আর কারো পক্ষে বের করা সম্ভব হতো না। আমাদের কাগজের তুমি একটি ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট।'

এ জাতীয় প্রশংসার কথা আগে বহুবার শুনেছে সমরেশ। প্রথম প্রথম দারুণ ভাল লাগত। এক ধরনের উত্তেজনা তার মধ্যে ছড়িয়ে যেত যেন। আজকাল তেমন একটা নাড়া দেয় না।

দীঘা থেকে লম্বা বাস জার্নি করে এসে আরাম করে একটু বসার সময় পর্যন্ত পায়নি সমরেশ। উর্ধ্বশ্বাসে তাকে ছুটতে হয়েছিল হাসপাতালে, সেখান থেকে থানায়, তারপর এই অফিসে। এখন ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। সে বলে, 'ভবতোষদা, আমি খুব টায়ার্ড। কপি পেয়ে গেছেন, ভাস্কর ছবি দিয়ে দেবে। আমি বাড়ি চললাম।'

'এসো।' ভবতোষ এখন নিশানাথ সামন্তর ব্যাপারে টেনসান থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। বলেন, 'তোমার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেল। যাও, বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে টানা ঘুম লাগাও।'

সমরেশ যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ কিছু মনে পড়তে ভবতোষ ব্যস্তভাবে ডাকেন, 'আরে ভাই, শোনো শোনো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সমরেশ বলে, 'কী হলো?'

'কাজের কথাটা বলতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম। জয়তী সান্যালের কেসটা ছেড়ে দিও না যেন, ভাল করে ফলো-আপ করবে। এখন অন্য খবরের বাজার ভয়ানক ডাউন যাচ্ছে। কাগজে পড়ার মতো কিছু থাকে না। জয়তী সান্যালের ইনসাইড এক্সক্লুসিভ স্টোরি দিয়ে দিয়ে ক'টা দিন রীডারকে চনমনে রাখতে হবে।'

'চিন্তা করবেন না। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আশা করি, রোজ সন্ধ্যেবেলা দারুণ এক-একটা স্টোরি দিতে পারব।'

'মেনি থ্যাঙ্কস।' ভবতোষের রোগাটে মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, 'এক কাজ কর, এত রাতে ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি পাবে কিনা, কে জানে। অফিসের একটা গাড়ি নিয়ে যাও। গ্যারেজে ফোন করে দিচ্ছি। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। বলে টেলিফোন তুলে নেন।

সমরেশ আর দাঁড়ায় না, বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যায়।

অফিসের গাড়ি থেকে তাদের হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের সামনে নেমে কবজি উলটে একবার ঘড়ি দেখে নেয় সমরেশ। এগারটা বেজে পঁয়ত্রিশ।

এই সময়টা চারিদিক ফাঁকা। বেশির ভাগ ফ্ল্যাটেই আলো নিভে গেছে।

গেটের কাছে ছোট একটা খুপরিতে নাইট শিফটের দারোয়ান বসে আছে। নাম রামঅবতার। এ বাড়িতে পালা করে চারজন দারোয়ান দিন রাত গেটে ডিউটি দেয়।

সমরেশ ভেতরে ঢুকতেই রামঅবতার উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'নমস্তে—'

এ বাড়ির যত কাজের লোক আছে, দেখা হলেই এক-আধ মিনিট দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে সমরেশ। সে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু আজ আর কথা-টথা বলতে ইচ্ছা করছে না। অন্যমনস্কের মতো প্রতি নমস্কার জানিয়ে সে সোজা লিফটে গিয়ে ঢোকে।

রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত লিফটম্যানদের ডিউটি। তারপর দরকার মতো এ বাড়ির বাসিন্দাদের নিজেদেরই লিফট চালিয়ে ওঠানামা করতে হয়।

সেভেনথ ফ্লোরে এসে লিফট থেকে নেমে কলিং বেল টিপতেই লক্ষ্মী দরজা খুলে দেয়। সমরেশ জানে যত রাতেই সে ফিরুক, লক্ষ্মী জেগে থাকবেই। তাকে খাইয়ে বিছানায় না পাঠানো পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। হাজার বার সমরেশ বলেছে তার জন্য লক্ষ্মী জেগে থাকতে চায় তো থাকবে। তবে খাওয়াটা যেন আগেই সেরে নেয়। কিন্তু তার কথা লক্ষ্মীর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কাজেই এ ব্যাপারে আজকাল আর কিছু বলে না সমরেশ।

লক্ষ্মীর পাশ দিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতর যেতে যেতে সে জিজ্ঞেস করে, 'মা'র খাওয়া হয়েছে?'

লক্ষ্মী দরজা বন্ধ করতে করতে বলে, 'হ্যাঁ।'

'শুয়ে পড়েছে?'

'হ্যাঁ।'

রোজ রাতে দশটা নাগাদ হিরণ্ময়ীকে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খেতে হয়। ওটা খাওয়ার পর চোখের পাতা আর খুলে রাখা যায় না। তখন শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। এ সব সমরেশের জানা। দেরি করে বাড়ি ফিরলে তবু এ কথাটা রোজ একবার করে তার জিজ্ঞেস করা চাই।

নিজের ঘরে গিয়ে বাইরের পোশাক-টোশাক ছেড়ে লুঙ্গি আর ঢিলে ঢালা হাফ-হাতা পাঞ্জাবি পরে বাইরের হল-এ এসে সে বলে, 'খেতে দাও লক্ষ্মীদি।'

লক্ষ্মী এর মধ্যে কিচেনে ঢুকে গিয়েছিল। গ্যাস জ্বালিয়ে খাবার গরম করতে করতে সে বলে, 'তুমি টেবিলে বসো। এক্ষুনি দিচ্ছি।'

সমরেশ টেবিলে বসতে না বসতেই খাবার এসে যায়। খেতে খেতে তার মনে পড়ে সুচিত্রা নিশানাথ সামন্তর ব্যাপারে ফোন করতে বলেছিল। বারোটা পর্যন্ত সে তার ফোনের জন্য জেগে বসে থাকবে। অবশ্য কী একটা জটিল কেসের ব্যাপারে তাকে অনেক কাগজপত্র দেখতে হবে। নিশ্চয়ই এখন তাকে পাওয়া যাবে।

নিশানাথের পাশাপাশি অনিবার্য নিয়মে জয়তীর মুখ কোনো অদৃশ্য টিভি স্ক্রিনে ভেসে ওঠে। হ্যাঁ, তার কথাটাও সুচিত্রাকে বলা দরকার। কেননা তার সাহায্য ছাড়া জামিন পাওয়া সম্ভব না।

পাঁচ মিনিটের ভেতর কোনোরকমে খাওয়া চুকিয়ে উঠে পড়ে সমরেশ। বলে, 'তুমি খেয়ে নিও লক্ষ্মীদি।' তারপর আঁচিয়ে ডাইনিং-কাম-ড্রইং রুমের কোণ থেকে টেলিফোনটা খুলে নিয়ে নিজের ঘরের প্লাগ পয়েন্টে লাগিয়ে নেয়।

ফোনের তারটা বেশ লম্বা। ডায়াল করে সমরেশ এবার নিজের বিছানায় গিয়ে বসে। একটু পর লাইনের ওধার থেকে সুচিত্রার গলা ভেসে আসে, 'তোর ফোনের জন্যে সেই কখন থেকে ওয়েট করছি।'

'কী করব বল। অফিসে কপি জমা দিয়ে এইমাত্র ফ্ল্যাটে ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে লক্ষ্মীদিকে রিলিজ করলাম। তারপর তোকে ফোন করছি।'

'ভেবেছিলাম তোর অফিস থেকে একটা ফোন করবি।'

'ওখান থেকে ফোন করার সময় ছিল না। ঘাড় গুঁজে তখন কপি লিখতে হচ্ছিল। তাছাড়া এত সব ব্যাপার ঘটেছে যে দু-এক মিনিটে বলাও যেত না। অথচ তোকে সবটা জানানো দরকার। অফিসে সেই পরিবেশ ছিল না। চারপাশে লোকজন, হই-চই। তাই—'

'লিভ ইট। নিশানাথবাবুর ব্যাপারটা বল।'

একটু চুপ করে থেকে সমরেশ বলে, 'আমি মিনিমাম একশ'টা ক্রাইমের রিপোর্টিং করেছি কিন্তু এমন কেস আগে আর কখনও পাইনি। তা ছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা একটা ট্রিমেণ্ডাস ড্রামাটিক টার্ন নিয়েছে। আর আমি সেই ড্রামার মধ্যে অনেকখানি জড়িয়ে পড়েছি।'

এবার সুচিত্রার গলা শুনে বোঝা যায়, সে ভীষণ চমকে উঠেছে, 'এমন একটা বিশ্রী ক্রাইমের মধ্যে তুই ইনভলভড্ হয়ে পড়লি! কী বলছিস যা তা!'

সমরেশ বলে, 'সোজাসুজি না হলেও ইনডাইরেক্টলি তো খানিকটা গেছিই।'

'তোর কোনো বিপদ-টিপদ হবে না তো? 'অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার' একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।' রিসিভারের ভেতর দিয়ে সুচিত্রার উৎকণ্ঠা এবং দুর্ভাবনা বেরিয়ে আসতে থাকে। বোঝা যায়, সে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে।

'সবটা শুনে তুইই বল, আল্টিমেটলি ঝামেলায় পড়ে যাব কিনা।'

'ঠিক আছে, বলে যা।'

হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকে থানায় গিয়ে জয়তীর সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত খুঁটিনাটি সব বলে যায় সমরেশ। ছোটোখাটো কোনো ঘটনাই বাদ দেয় না।

সমস্ত শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলে না সুচিত্রা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

সমরেশ অস্থির গলায় বলে, 'কি রে, কিছু বল।'

এবার সুচিত্রার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সে বলে, 'সত্যিই হাই ড্রামা! জয়তীর কথা তুই আমাকে আগে আগে বলতিস। ওর ছবিও বোধ হয় দেখিয়েছিলি।'

'হ্যাঁ।'

'এখন ওকে নিয়ে কী করতে চাস?'

'দ্যাখ, আমাদের জন্যে জয়তীর অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আমাদের দিক থেকে সিমপ্যাথি পেলে ওর জীবনটা অন্যরকম হতে পারত। সে যাক। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন জয়তীকে যদি বাঁচানো যায় সেই চেষ্টাই করব ভাবছি।'

'কমপেনসেসান ?'

সমরেশ উত্তর দেয় না।

সুচিত্রা এবার বলে, 'জয়তীর ক্ষতিপূরণটা কিভাবে করবি, কিছু ভেবেছিস ?'

সমরেশ বলে, 'প্রথমে ওকে জামিন দিয়ে বের করে আনতে হবে, আর সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় ততই ভাল। তোকে কাল সকালে আমার সঙ্গে থানায় গিয়ে জামিনের অ্যারেঞ্জমেণ্ট করতে হবে।'

'ভেরি ডিফিকাল্ট।'

'কেন, সকালে আমার সঙ্গে যেতে পারবি না ?'

'ঐ দেখ, আমার না যাবার কথা কে বলছে!'

'তবে ?'

'বলছিলাম, তুই নিজেও আইন জানিস। এরকম একটা কেসে চট করে জামিনের ব্যবস্থা করা যায় না। পুলিশ থেকেই কোর্টে অবজেকসান দেবে।'

'হুঁ। সে কথা তাপসও বলছিল।'

'তাছাড়া—'

'কী ?'

'তুই তো একটু আগে বললি জয়তী জামিন নিতে চায় না। ও বলেছে যদি কোনো কারণে হাজত থেকে বেরুতে পারে, নিশানাথবাবুর ওপর আবার অ্যাটেমপ্ট করবে—তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'এই অবস্থায় ওর 'বেইল' পাওয়া মুশকিল। কোর্ট একেবারেই রাজী হবে না।'

সমরেশ বলে, 'সেটা অবশ্য ঠিক। নিশানাথবাবুকে জয়তী গুলি করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে কনফেসও করেছে। তবু আমার মনে হয়, পেছনে অন্য হিস্ট্রি রয়েছে।'

সুচিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কি রকম ?'

'সেই নন-বেঙ্গলি লোকটির ফোনের কথা নিশ্চয়ই মনে করে রেখেছিস। ডাক্তার দত্তর কাছে শোনার পর থেকে ফোনের ব্যাপারটা আমাকে হন্ট করে যাচ্ছে। জয়তী আমাকে প্রায় কিছুই বলেনি। মানে বলতে চায়নি। হাজতে বসে সেটা সম্ভবও ছিল না। এ ছাড়া এত বছর বাদে

ওভাবে দেখা হলো। ওর মেণ্টাল কণ্ডিশানটা তখন কেমন, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস। আমার সম্বন্ধে ওর অনেক দিনের ক্ষোভ, রাগ, হেট্রেড তখন ফেটে পড়ছিল।'

'হুঁ।'

'জয়তীকে জামিনে বের করে এনে ওর কাছ থেকে যদি ডিটেলে মার্ডার অ্যাটেমপ্টের কারণটা জানা যায়, আমার ধারণা অনেক ক্লু পাওয়া যাবে। তখন থরো ইনভেস্টিগেসান করলে হয়ত দেখা যাবে—' বলতে বলতে থেমে যায় সমরেশ।

সুচিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখা যাবে ?'

সমরেশ বলে, 'সেটা অবশ্য আমার অনুমান। মানে—'

সমরেশকে থামিয়ে দিয়ে সুচিত্রা এবার বলে, 'তুই গেস করছিস, জয়তী কারো হাতের প্লে-টুল, গোটা ব্যাপারটার পেছনে অন্য অপারেটর রয়েছে।'

'এগজাক্টলি ! তেমন একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছি না।'

'কাল কখন থানায় যেতে চাইছিস ?'

'আটটা নাগাদ।'

'ঠিক আছে। আমি সাড়ে সাতটায় তোদের ফ্ল্যাটে চলে আসছি। রেডি থাকিস। ওখান থেকে দু'জনে থানায় চলে যাব। আচ্ছা, রাখছি।' বলেও লাইন কেটে দেয় না সুচিত্রা। গলার স্বর হঠাৎ পালটে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এতকাল বাদে ছেলেবেলার প্রেমিকাটিকে দেখে কেমন লাগল ? দারুণ, তাই না ?

এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না সমরেশ। সুচিত্রা হালকা চটুল ধরনের মেয়ে নয়। প্রায় হকচকিয়ে যায় সে। বলে, 'তুই ঠিক কী বলতে চাইছিস—'

'না। ও কিছু না। আচ্ছা গুড নাইট। কাল দেখা হবে।' এবার সমরেশের উত্তর না শুনেই লাইন কেটে দেয় সুচিত্রা।

ফোনটা নামিয়ে রেখে একই ভাবে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সমরেশ। তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় তার। সে উঠে ডানপাশের দেওয়ালের দিকে যায়।

জায়গা বাঁচানোর জন্যে এ বাড়ির ফ্ল্যাটেই দেওয়ালের ভেতর কাঠের ফ্রেম করে, সামনে কাঁচ লাগিয়ে আলমারি বানানো হয়েছে।

কাঁচের পাল্লা সরিয়ে দেওয়াল-জোড়া আলমারির এক কোণ থেকে পুরনো একটা প্যাকেট বের করে ফের বিছানায় চলে আসে সমরেশ।

তার ঘরের সব দিকের দরজা জানালা খোলা রয়েছে। দক্ষিণের জোড়া জানালা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ চোখে পড়ে। ছোট ছোট জরির ফুলের মতো অগুনতি তারা সেখানে আটকে আছে। মাঝখানে রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ। এখন পূর্ণিমা চলছে। ধবধবে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক।

পরিষ্কার নীলাকাশের তলায় কলকাতার নতুন স্কাই-লাইন চোখে পড়ে। কয়েক বছর আগেও দোতলা, তেতালা, বড় জোর চারতলার ওপরে কোনো বাড়ি আশেপাশে দেখা যেত না। এখন উঁচু উঁচু হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ে উত্তর দক্ষিণ আর পুব দিকের সব রাস্তা ভরে যাচ্ছে।

এত রাতে চারিদিকের আওয়াজ কমে এসেছে। টিভি এবং রেডিও বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। ওপরে বা নিচে কোনো ফ্ল্যাট থেকেই কারো গলা পাওয়া যাচ্ছে না। সব ঠিক, তবু কলকাতা কখনো পুরো-পুরি ঘুমোয় না। এই মধ্যরাতেও নিচের রাস্তা দিয়ে কর্কশ শব্দ করে দু-চারটে ট্রাক বা ট্যাক্সি ছুটে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে রিকশার ক্ষীণ ঠুং ঠাং আওয়াজ।

এই মুহূর্তে কলকাতা মেট্রোপলিসের মাথায় বিশাল আকাশ, তারার মেলা, চাঁদ বা নিচে ট্যাক্সি এবং রিকশার শব্দ, কোনোদিকেই লক্ষ্য নেই সমরেশের। প্যাকেট খুলে আট-দশটা ফোটো বের করে সে। সবগুলোই জয়তীর ছবি। এক শীতের সকালে নদীর পাড়ে পিকনিক করতে গিয়ে এগুলো তোলা হয়েছিল। অনেক দিন আগের প্রিন্ট, হলুদ ছোপ ধরে গেছে।

প্রতিটি ছবিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার দেখতে থাকে সমরেশ। কোনোটায় টগবগে প্রাণবন্ত মেয়েটার চুল বাতাসে উড়ছে, কোনোটায় তার খুশি উপচে পড়ছে, কোনোটায় বা হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে মুখে অলৌকিক হাসি ফুটিয়ে বসে আছে। ডান গালে মসুর ডালের মতো বড় তিলটিও দেখা যাচ্ছে সে। একটা ফোটোতে বালির ওপর সেই লেখাগুলো এখনও স্পষ্ট পড়া যায়। 'বোকারাম ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না' কিংবা 'যে মেয়েটা আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে তাকে আমি ভীষণ—ভীষণ ভালবাসি।'

লেখা আর ছবিগুলো দেখতে দেখতে বুকের ভেতর তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে সমরেশের। প্রবল আবেগে গলার কাছটায় ক্রমাগত কী যেন ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। ঢোঁক গিলতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে তার।

নিজের অজান্তেই সমরেশের গলার ভেতর থেকে চাপা আধফোটা স্বর বেরিয়ে আসতে থাকে, 'ওকে বাঁচাতেই হবে, বাঁচাতেই হবে।' জয়তীকে সে ভুলে যায়নি। সমরেশ জানতো না, বুকের ভেতর ঠুনকো আবরণের তলায় অনেকটা অংশ জুড়েই সে ছিল, হাজতে তাকে দেখার পর থেকেই তা আবিষ্কার করে ফেলে সে। এখন, এই জনশূন্য মেট্রোপলিসে, রাস্তা থেকে এক'শ ফিট উচ্চতায় তার একান্ত নিজস্ব ঘরটিতে জয়তীকে ঘিরে আট বছর আগের টুকরো টুকরো অসংখ্য স্মৃতি তাকে যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরতে থাকে।

সাত

টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙে সমরেশের। কাল জয়তীর ছবিগুলো দেখতে দেখতে কখন চোখের পাতা জুড়ে এসেছিল, মনে নেই।

এখন মোটামুটি বেলা হয়েছে। পুব দিকের বড় জানালা আর দরজা দিয়ে অঢেল সোনালী রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। চারপাশের ফ্ল্যাট থেকে মর্নিং টিভি বা রেডিওর আওয়াজ এবং একশ' ফিট নিচের রাস্তা থেকে ট্রাক, ট্যাক্সি, বাস, মিনি, অটো, রিকশা, ঠেলা, অর্থাৎ এই শহরের যাবতীয় গাড়ি-টাড়ির শব্দ উঠে আসছে। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বিপুল ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে।

ধড়মড় করে উঠে ফোন ধরে সমরেশ। 'হ্যালো' বলতেই লাইনের ওধার থেকে সুশোভন মল্লিকের গলা ভেসে আসে, 'কনগ্র্যাচুলেসনস ব্রাদার। কামাল করে দিয়েছ।'

সুশোভন তাদের রাইভাল কাগজ 'প্রতিদিন'-এর নিউজ এডিটর। হঠাৎ তাঁর এই অভিনন্দনের কারণ বুঝে উঠতে পারে না সমরেশ। বলে, 'কী ব্যাপার সুশোভনদা?'

'আরে, নিশানাথবাবুর কেসটায় তুমি দুর্দান্ত কভারেজ দিয়েছ।

অন্য সব কাগজ তার ধারে কাছে আসতে পারেনি।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা সমরেশের মাথায় ঢোকে। সে বলে, 'তাই নাকি ?'

সুশোভন বলেন, 'কেন, আজকের কাগজগুলো দেখনি ?'

বিব্রতভাবে সমরেশ জানায়, 'না, মানে কাল শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই—'

'এ হে, ঘুম থেকে নিশ্চয়ই টেনে তুললাম তোমাকে! প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।'

'আরে না না—' একটু মিথ্যেই বলে সমরেশ, 'উঠব উঠব করছিলাম, সেই সময় আপনার ফোন এল।'

'আসলে তোমার কভারেজটা দেখে এত ভাল লাগল যে ফোনটা না করে থাকতে পারলাম না।'

সুশোভন মল্লিক প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের নিউজ এডিটর হলেও দারুণ উদার ধরনের হৃদয়বান মানুষ। সাংবাদিকতার জগতে তাঁর দারুণ সুনাম। এক সময় পলিটিক্যাল রিপোর্টার ছিলেন। তখন তাঁর এক-একটা 'স্টোরি' রাজনৈতিক মহলকে তোলপাড় করে দিত। নিউজ এডিটর হবার পর অবশ্য রিপোর্টিং বন্ধ করে দিয়েছেন। গ্রেটার ক্যালকাটা প্রেস ক্লাবের তিনি প্রেসিডেন্ট।

সুশোভনের বড় গুণ, যে কোনো কাগজে ভাল রিপোর্ট বা কভারেজ বেরুলে, সিনিয়রদের তো বটেই, যত জুনিয়র রিপোর্টারই হোক, ফোন করে করে তাঁর ভাল লাগাটা জানিয়ে দেবেন। বিপদে আপদে যে কোনো সাংবাদিক তাঁর কাছে গেলে সাধ্যমতো সাহায্য করে থাকেন। এ জন্য সবাই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ছুটির দিনে তাঁর বাড়িতে জাঁকিয়ে যে আড্ডা বসে তাতে কলকাতার সব কাগজ এবং নিউজ এজেন্সির লোকেদের ভিড় লেগে থাকে।

সমরেশ বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'সুশোভনদা, আপনি যখন বলেছেন, ভরসা পেলাম। মনে হচ্ছে, নিশানাথবাবুর কেসটা নিয়ে কিছু একটা দাঁড় করাতে পেরেছি।'

সুশোভন বলেন, 'আমি কেন, সবাই এক কথাই বলবে। দ্যাটস অ্যান এক্সেলেন্ট পীস। এবার ভাই, একটু স্বার্থের কথা বলি।'

'কী ?'

'নতুন কিছু না, সেই পুরোনো ব্যাপারটা। তুমি কিছু ডিসিসান

নিতে পারলে ?'

সুশোভন চান, সমরেশ তাঁদের 'প্রতিদিন'-এ জয়েন করুক। বছর দুয়েক আগেই তিনি অফারটা দিয়ে রেখেছেন। 'দৈনিক মহাভারত'-এ সে যা পায় তাঁরা তার চেয়ে হাজার টাকা বেশি দেবেন। তা ছাড়া ট্যাক্স-ফ্রি অন্যান্য অ্যালাওয়েন্স। 'দৈনিক মহাভারত' অফিসের কাজের সময় তাকে গাড়ি দেয়। অবশ্য দরকারমতো অন্য সময় গাড়ি চাইলে সে পেয়ে যায়। সুশোভনরা তাকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একটা মারুতি দিতে চেয়েছে।

শুধু সুশোভনরাই না, আরো দু-তিনটি কাগজ তাকে একই রকম অফার দিয়ে রেখেছে। কিন্তু 'দৈনিক মহাভারত' সম্পর্কে এক ধরনের দুর্বলতা এবং আনুগত্য রয়েছে সমরেশের। যখন কোথাও সে চাকরি-বাকরি পাচ্ছিল না, ওরাই, বিশেষ করে ভবতোষ সমাদ্দার এবং নিরঞ্জন বসাক তাকে কাজটা করে দেয়। মাত্র দু'মাস ট্রেইনী থাকার পর ওদের রেকমেন্ডেশনে ম্যানেজমেন্ট তাকে প্রবেসানার করে নেয়। ভবতোষ তার কয়েকটা রিপোর্ট দেখে অঢেল স্বাধীনতা দিয়েছেন। তার ওপর 'দৈনিক মহাভারত-'এর প্রতিটি কর্মীর এবং কর্তৃপক্ষের অগাধ আস্থা। কিছু বাড়তি টাকা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য হুট করে এখানকার কাজ ছেড়ে যাওয়ার কথা সে ভেবে উঠতে পারেনি।

দ্বিধান্বিতভাবে সমরেশ বলে, 'সুশোভনদা, আমাকে আরেকটু সময় দিন। এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি।'

সুশোভন বলেন, 'ঠিক আছে, টেক ইওর টাইম। রিলেসান নষ্ট করে 'দৈনিক মহাভারত' থেকে চলে আসো, এটা আমি একেবারেই চাই না। ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি হাসিমুখে আসতে পারো, সেটাই ডিজায়েরেবল। আমাদের ওয়াল্ডটা খুব ছোট। দেখা হলে একজন আরেক জনের সঙ্গে কথা বলবে না, মুখ ফিরিয়ে নেবে—ভীষণ অস্বস্তিকর আর ইনডিসেণ্ট।'

'তা তো ঠিকই।'

'আচ্ছা ভাই, এবার ছাড়ি। অনেকক্ষণ তোমাকে আটকে রেখেছি।'

লাইন কেটে যায়।

ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে সমরেশের চোখে পড়ে, জয়তীর ফোটোগুলো বিছানা জুড়ে এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। ছবিগুলো

এখানে কিভাবে এল, ভাবতেই কাল রাতের ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়। আস্তে আস্তে সেগুলো ফের প্যাকেটে পুরতে না পুরতেই আবার টেলিফোন বেজে ওঠে।

এবার ভবতোষ সমাদ্দার। তিনি বলেন, 'সার্কুলেসান ম্যানেজার একটু আগে ফোন করে জানালো, তোমার 'কভারেজ' পাবলিক দারুণ খেয়েছে। ফলো-আপের কথাটা মনে আছে তো?'

সমরেশ বলে, 'নিশ্চয়ই আছে ভবতোষদা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। একদম টেনসানে ভুগবেন না।'

'টেনসান আবার কী? হে-হে—' ধরা পড়ে গিয়ে কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন ভবতোষ। তাঁর বিব্রত হাসির হে-হে শব্দটা ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যায়।

ভবতোষের পর আরো ক'জন জার্নালিস্ট বন্ধু এবং হোম ডিপার্টমেন্টের ক'জন বড় অফিসারের ফোন এল। এ'রা সবাই চেনা। আজকের কভারেজের জন্য তাঁরা অভিনন্দন জানালেন। বলেন, নিশানাথের কেসটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা জানার জন্য সাগ্রহে মর্নিং এডিসানের 'দৈনিক মহাভারত'-এর জন্য অপেক্ষা করবেন।

টেলিফোনের ফাঁকে ফাঁকে মুখ-টুখ ধুয়ে, ব্রেকফাস্ট সেরে, হিরণ্ময়ীর কাছে গিয়ে বসে সমরেশ।

হিরণ্ময়ীর খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস। তখনই স্নান সেরে কিছুক্ষণ পুজোটুজো করেন। তারপর খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। এই বয়সেও দেশ-বিদেশের নানা ঘটনা সম্পর্কে তাঁর অসীম কৌতূহল।

সমরেশের ঠিক পাশের ঘরটাই হিরণ্ময়ীর। তিনি তাঁর ঘরের ব্যালকনিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সমরেশ যে পাশে এসে বসেছে, কাগজে চোখ থাকলেও তা টের পেয়েছেন। বলেন, 'হ্যাঁ রে সমু, কাল কত রাত্তিরে ফিরেছিস?'

সমরেশ বলে, 'সাড়ে এগারোটার পর।'

'ওষুধ খেয়ে ঘুমোই। বেশি রাত করে এলে জানতে পারি না। কাল পেট ভরে খেয়েছিলি তো?' বলতে বলতে হিরণ্ময়ীর গলার স্বর হঠাৎ বদলে যায়। বেশ চমকে উঠেই এবার জিজ্ঞেস করেন, 'তোর লেখার মধ্যে এটা কার ছবি রে? খুব চেনা লাগছে।'

মুখ বাড়িয়ে সমরেশ দেখে 'দৈনিক মহাভারত-'এ তার রিপোর্টটার

মাঝখানে জয়তীর ফোটোগুলোর ওপর হিরণ্ময়ীর চোখ স্থির হয়ে আছে। কাল রাতে তো পারেনি, জয়তীর ব্যাপারটা বলার জন্যই এখন সে মায়ের কাছে এসে বসেছে।

সমরেশ বলে, 'হ্যাঁ মা, ও সমশেরগঞ্জের জয়তী। সেই যে আমাদের বাংলোর কাছে ওদের বাড়ি ছিল—'

'সব স্পষ্ট মনে আছে। এই তো সেদিনের কথা। কিন্তু মেয়েটা এ কী সর্বনাশ করে বসল!

সমরেশ চুপ করে থাকে।

হিরণ্ময়ী এবার জিজ্ঞেস করেন, 'নিশানাথবাবুকে কেন খুন করতে গিয়েছিল, সে ব্যাপারে তো কিছু লিখিসনি।'

সমরেশ বলে, 'লিখব কী, মুখই খুলতে চায় না। তবু যেটুকু বলেছে তা লেখা যায় না।'

'কেন?'

তক্ষুনি উত্তর দেয় না সমরেশ। ব্যালকনির ওধারে হাই-রাইজে বোম্বাই স্কাই-লাইনের দিকে তাকিয়ে দূরমনস্কর মতো বলে, 'ও যা করেছে তার জন্যে আমরা নাকি দায়ী।'

হিরণ্ময়ী হকচকিয়ে যান। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'কী বলছিস তুই! এ সবের মানে কী?'

'আমরা যদি ওদের সম্বন্ধে একটু সিমপ্যাথেটিক হতাম এই ট্র্যাজেডিটা হয়ত ঘটত না।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন হিরণ্ময়ী।

অনেকটা সময় কেটে যায়।

তারপর রুদ্ধস্বরে হিরণ্ময়ী জিজ্ঞেস করেন, 'ওর বাবা-মা এখন কোথায়?'

জেলে মহেশ্বরের আত্মহত্যা এবং ক্যানসারে আশালতার মৃত্যুর খবরটা হিরণ্ময়ীকে জানিয়ে দেয় সমরেশ।

'আহা রে—' হিরণ্ময়ীর গলার ভেতর থেকে চাপা কাতর স্বর বেরিয়ে আসে। তিনি যে আন্তরিক দুঃখিত হয়েছেন, সেটা তাঁর মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়। সমরেশের মতো তাঁর মধ্যেও অপরাধবোধ যেন ছড়িয়ে পড়ছিল।

সমরেশ কিছু বলে না।

হিরণ্ময়ী ফের বলেন, 'ওর একটা ছোট ভাই ছিল না ?'

সমরেশ আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'তার কথা তো বললি না। কোথায় আছে সে ?'

'বলতে পারব না।'

দ্রুত কিছু চিন্তা করে হিরণ্ময়ী প্রশ্ন করেন, 'তোর কি ধারণা সত্যি সত্যিই জয়তী নিশানাথবাবুকে গুলি করেছে ?'

মায়ের মনোভাব বুঝতে পারছিল সমরেশ। যে জয়তীকে তিনি আট বছর আগে চিনতেন সে ছিল খুবই নরম ধাতের মেয়ে—সরল, হাসিখুশি, নিষ্পাপ। সে যে হাতে রিভলবার তুলে নিয়ে নিশানাথবাবুর ওপর গুলি চালাতে পারে, এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। সমরেশ বলে, 'বিশ্বাস করতে পারছ না ?'

'না।'

সমরেশ বলে, 'কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। তবে আমার ধারণা গুলি করলেও এর মধ্যে কোথায় যেন গোলমাল আছে।' যে কথাটা কাল রাতে সুচিত্রাকে বলেছিল, এবার সেটাই হিরণ্ময়ীকে বলে, 'আসল কালপ্রিট জয়তী নয়, অন্য কেউ।'

'তাই যদি হয়, তা হলে জয়তীকে কে বাঁচাবে ? কে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে ? বাপ-মা মারা গেছে, ভাইয়ের খবর নেই। কী হবে মেয়েটার ?' হিরণ্ময়ীর চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে অসীম উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়।

ধীরে ধীরে মায়ের হাত ধরে সমরেশ বলে, 'মা, আমি একটা কথা ভেবেছি।'

'কী রে ?'

'আমাদের জন্যে জয়তীদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ভাবছি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। তুমি কী বল ?' কথাগুলো বলে মায়ের মুখের দিকে তাকায় সমরেশ। মা ছাড়া এই পৃথিবীতে কেউ নেই তার। হিরণ্ময়ী দুঃখ পান, এমন কিছুই সে করে না। কাল জয়তী সম্বন্ধে মাকে না জানিয়েই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার কারণ ছিল প্রবল আবেগ। জয়তীকে হাজতে দেখে সে দিশেহারা হয়ে যায়, তীব্র অপরাধবোধ তখন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পরে যখন তার খেয়াল হয়েছিল তখনই মনে মনে ঠিক করে, আজ সকালে মায়ের মতামত জেনে নেবে। সমরেশের বিশ্বাস, মা আপত্তি করবে না।

হিরণ্ময়ী এতক্ষণ জয়তীর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলেন। এবার তার সঙ্গে নতুন উৎকণ্ঠা যোগ হয়। তিনি বলেন, 'এতে তোর কোনো ভয় নেই?'

দুর্ভাবনা যে খানিকটা নেই তা নয়। তবু মাকে নিশ্চিন্ত করতে সমরেশ বলে, 'না না, আমার কিসের ভয়? তুমি ভেবো না মা।'

অনিশ্চিতভাবে হিরণ্ময়ী বলেন, 'দ্যাখ তা হলে। নিজেকে বাঁচিয়ে যা করার করিস।'

এই সময় পিয়ানোর মতো শব্দ করে কলিং বেল বেজে ওঠে। তারপর লক্ষ্মীর পায়ের আওয়াজ এবং দরজা খোলার শব্দ। পরক্ষণে সুচিত্রা সোজা সমরেশদের কাছে চলে আসে। বলে, 'কি রে, রেডি তো? নিচে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।'

সমরেশ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, 'পারফেক্টলি রেডি। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ব।' হিরণ্ময়ীকে বলে, মা, আমরা বেরুচ্ছি।'

হিরণ্ময়ীও উঠে পড়েছিলেন। বলেন, 'বেরুবি যে, কিছু খেয়েছিস?'

'তুমি যখন পুজোটুজো করছিলে তখন আমার ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট। চল সুচিত্রা।'

'ওকে টেনে নিয়ে কোথায় চললি?'

'থানায়। পারলে ও-ই জয়তীকে বাঁচাতে পারবে।'

'ও জয়তীর কথা জানে?'

'সব জানে। কাল রাত্তিরে বলেছি।'

কথা বলতে বলতে ওরা ড্রইংরুমের ভেতর দিয়ে বাইরের দরজার কাছাকাছি চলে এসেছিল।

হিরণ্ময়ী বলেন, 'কখন ফিরবি?'

সমরেশ জানায়, 'কিছু ঠিক নেই। দুপুরে যদি না আসি, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। আমার জন্যে বসে থেকো না, খেয়ে নিও।'

বাইরে বেরিয়ে দু'জনে লিফটে ঢুকে পড়ে।

আট

কাঁটায় কাঁটায় আটটায় সমরেশ এবং সুচিত্রা থানায় চলে আসে।

তাপস তার কামরাতেই ছিল। সমরেশদের দেখে বলে, 'এসো এসো, তোমাদের জন্যেই ওয়েট করছিলাম।' সুচিত্রার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে, 'বসুন ম্যাডাম। আমার বন্ধুটি সমাজসেবায় নেমেছে। মুর্জারিম এক ইয়াং গার্লকে বাঁচাবার জন্যে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনিই এখন ভরসা।'

তাপসের সঙ্গে সুচিত্রার আলাপ হয়েছিল বছর দুয়েক আগে—সমরেশদের ফ্ল্যাটে। তারপর বহুবার দেখা হয়েছে। নানা দরকারে বেশ কয়েক বার থানায় এসেছে সুচিত্রা। ছুটির দিনে মাঝে মধ্যে সমরেশদের ওখানে আড্ডা দিতে গিয়েও দেখা হয়েছে। তাপসের ছোট ভাইয়ের বিয়েতে নেমন্তন্নও করা হয়েছিল তাকে। মোট কথা, দু'জনের মধ্যে বেশ প্রীতির সম্পর্ক।

বসতে বসতে সুচিত্রা বলে, 'দেখা যাক, কী করা যায়।'

তাপস বলে, 'কাজ শুরু হবার আগে এক কাপ করে চা হয়ে যাক।'

সমরেশ হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'চায়ের দরকার নেই। আগে বল, আমি কাল রাত্তিরে চলে যাবার পর জয়তীকে আর জেরা করা হয়েছে কিনা?'

'আজ সকালে আমি একবার জয়তীর সঙ্গে কথা বলেছি। লালবাজারের যে লেডি পুলিশ অফিসার দু'জনকে কাল দেখেছিলে, আজ ভোরে তাঁরাও এসে জয়তীকে জেরা করেছেন।'

'কিছু কনফেসান আদায় করতে পেরেছ?'

'না। কাল যা বলেছিল, আজ তার বেশি একটা শব্দও বের করা যায়নি।'

'তোমরা ওকে কি আজ কোর্টে হাজির করছ?'

'হ্যাঁ। দশটা নাগাদ নিয়ে যাওয়া হবে।'

'তার আগে জয়তীর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।'

'এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ও, ভাল কথা, তোমার কভারেজটা সকালে উঠেই পড়লাম। সুপার্ব। এমন সব খবর ডিটেলে দিয়েছ তাতে আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে।'

'কী ?'

'কাল রাত্তিরে যা বলেছিলাম, এখনও তাই বলছি। তুমি জয়তীকে খুব ভাল করেই চেনো নইলে ব্যাকগ্রাউণ্ড হিস্ট্রি এভাবে দেওয়া যায় না। কি, ঠিক বলছি ?'

সমরেশ অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। সে কিছু বলার আগে হঠাৎ সুচিত্রা বলে ওঠে, 'ঠিক ধরেছেন। সমরেশরা আর জয়তীরা একই শহরে, এমন কি একই পাড়ায় থাকত। লাইফের গোড়ার দিকের অনেকগুলো বছর ওরা একসঙ্গে কাটিয়েছে।'

দ্রুত টেবিলের ওপর দিয়ে সমরেশের দিকে ঝুঁকে তাপস বলে, 'দারুণ ব্যাপার। বল বল, সব আমার জানা প্রয়োজন। হয়ত ব্যাকগ্রাউণ্ড হিস্ট্রি থেকে এই কেসের কিছু ক্লু পেয়ে যাব।' ঔৎসুক্যে এবং উত্তেজনায় তার চোখমুখ ঝকঝক করতে থাকে।

সমরেশ বলে, 'সব বলব, তবে তার সঙ্গে নিশানাথবাবুর কেসের কোনো সম্পর্ক নেই। হাতে সময় আছে ঘণ্টা দেড়েক, প্লিজ, জয়তীর কাছে আমাদের নিয়ে চল।'

তাপস নিজে সঙ্গে গেল না। সাব-ইন্সপেক্টর বিমলকে ডেকে তার সঙ্গে সমরেশদের পাঠিয়ে দেয়।

কাল মেয়েদের হাজতে একাই ছিল জয়তী। আজ আরো দু'জনকে দেখা যায়। গোঁফদাড়ি না থাকায় এবং শাড়ি-ব্লাউজের কারণে তাদের মেয়েমানুষ বলতেই হয়। প্রায় পাঁচ ফিট আট-দশ ইঞ্চির মতো হাইট। পেটানো চেহারা, হাত-পা মুগুরের মতো নিরেট। গায়ের রং কালো। চামড়ায় পালিশ মারা হয়েছে যেন, এমনিই চকচকে। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। গোল মাংসল মুখে ছোট ছোট হিংস্র চোখ।

মেয়েমানুষ দুটো ওধারের দেওয়ালের গা ঘেঁষে বসে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছিল। আর সামনের দিকে গরাদের কাছে হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে আছে জয়তী।

জয়তীর নতুন সঙ্গিনীদের দেখে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায় সমরেশের। তার মতো একটা মেয়েকে এরকম জঘন্য মেয়েমানুষদের সঙ্গে হাজতবাস করতে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল।

চোখের ইঙ্গিতে নতুন আসামীদের দেখিয়ে সমরেশ নিচু গলায়

বিমলকে জিজ্ঞেস করে, 'এরা কারা ? কাল তো এদের দেখিনি।'

বিমল জানায়, এরা কলকাতার আণ্ডার ওয়ার্ল্ডের অতি কুখ্যাত ক্রিমিনাল। ডাকাতি, ছিনতাই, মারদাঙ্গা ইত্যাদি ব্যাপারে এদের নামে ডজনখানেক করে কেস ঝুলছে। পুলিশ এতদিন ধরতে পারছিল না, কাল এক পার্কে এক ভদ্রমহিলার হার ছেনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়।

বিমল আরো বলে, এরা দারুণ দাগী ক্রিমিনাল। কিন্তু কাল একেবারে আনাড়ির মতো ধরা পড়ে যায়। ইচ্ছা করলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারত কিন্তু সেরকম কোনো চেষ্টাই করেনি।

সন্দিগ্ধ চোখে মেয়েমানুষ দু'টিকে আরো কিছুক্ষণ দেখে জয়তীর কাছে এসে দাঁড়ায় সমরেশ। তার পাশে সুচিত্রা।

সমরেশ আস্তে ডাকে, 'জয়তী—'

প্রথমটা সাড়া মেলে না। দু-চার বার ডাকাডাকির পর হাঁটুর ভেতর থেকে মুখ তুলে তাকায় জয়তী। তার চোখ আরক্ত, ঢুলুঢুলু। বোঝা যায়, রাতটা প্রায় না ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। মুখে গলায় এবং হাতে মশার কামড়ের অগুনতি দাগ।

গরাদের এপাশে সুচিত্রা আর সমরেশ বসে পড়ে। সমরেশ বলে, 'কাল তোমাকে বলে গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুকে নিয়ে আসব, সে তোমার জামিনের ব্যবস্থা করবে। তাকে এনেছি। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম সুচিত্রা চ্যাটার্জি, খুব বড় ল-ইয়ার।'

জয়তীর কপাল কুঁচকে যায়। চোখের কোণ দিয়ে খুঁটিয়ে সুচিত্রাকে দেখতে দেখতে ঈষৎ তীক্ষ্ণ গলায় সে সমরেশকে বলে, 'কালকেই তো তোমাকে বলে দিলাম, কারো করুণা আমার চাই না। কেন সকালবেলা ঝঞ্ঝাট করতে এলে ? আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।'

সমরেশ ক্ষুব্ধ হয় না, বরং সহানুভূতির সুরে বলে, 'করুণার কথাই ওঠে না, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'কেন ? তোমার কী স্বার্থ ?' জয়তীর চোখমুখ এবং কণ্ঠস্বর উগ্র হয়ে ওঠে।

সমরেশ থতিয়ে যায়। সে কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই জয়তী সোজা সুচিত্রার দিকে ঘুরে বসে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই আপনার এই বন্ধুর রিকোয়েস্টে আমাকে বাঁচাতে ছুটে এসেছেন ?'

এরকম একটা প্রশ্ন সুচিত্রার কাছে অপ্রত্যাশিত। সে হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

'আপনার বন্ধু কি জানিয়েছে, একটা পয়সা ফী দেবার ক্ষমতা আমার নেই ?'

'জানিয়েছে।'

'সব জেনেশুনেও আমাকে বাঁচাতে এসেছেন! কারণটা জানতে পারি ?'

'অবশ্যই। ধরুন এটা নিঃস্বার্থ পরোপকার।'

ঠোঁট দুটো বাঁ দিকে সামান্য বেঁকে যায় জয়তীর। সেখানে বিচিত্র একটু হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে, 'আপনার মতো মানুষ এখনও তা হলে দেখা যায়। খুব খুশি হলাম।'

জয়তীর কথাগুলোর মধ্যে কতটা সারল্য আর কতটা বিদ্রূপ মিশে আছে, বোঝা যায় না। সংশয়ের চোখে তাকে লক্ষ করতে থাকে সুচিত্রা।

জয়তী আবার বলে, 'আপনি আমার জন্যে কষ্ট করে এসেছেন, সে জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। ফাঁসি না হলেও আট-দশ বছরের জেল ঠেকানো যাবে না। কারণটা কী, নিশ্চয়ই আপনার বন্ধুর কাছে শুনেছেন।'

কাল রাতে ফোনে এবং আজ ট্যাক্সি করে থানায় আসতে আসতে সমরেশের সঙ্গে অনেক আলোচনাই হয়েছে। কিন্তু জয়তী তাকে কোন কারণটার কথা বলছে, বোঝা যাচ্ছে না। সুচিত্রা ঠোঁট টিপে ভাবতে চেষ্টা করে।

জয়তী তার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা ধরে ফেলে। বলে, 'মনে পড়ছে না তো ? ঠিক আছে, আরেক বার বলি। থানায় এজাহার দেবার সময় বলেছি, নিশানাথ সামন্তকে নিজের হাতে গুলি করেছি, আমার ইনটেন-সান ছিল খুন করা। কোর্টে যখন কেস উঠবে তখনও ঐ কথাই বলব। আপনি আমাকে বাঁচাবেন কী করে ?'

সুচিত্রা অত্যন্ত নরম গলায়, সহৃদয় ভঙ্গিতে বলে, 'দেখুন এখন হয়ত ক্ষোভে দুঃখে রাগে আর উত্তেজনায় এভাবে কনফেসান করছেন, কিন্তু পরে এর জন্যে আক্ষেপ করতে হবে। আগে থেকে প্রোটেকসান নেওয়া ভাল।' দ্রুত নিজের বড় লেডিজ ব্যাগটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা ছাপানো ফর্ম বের করে বলে, 'এটায় একটা সই করে দিন।' ফর্ম এবং

একটা ডট পেন জয়তীর দিকে বাড়িয়ে দেয় সুচিত্রা।

জয়তী একটু অবাক হয়েই বলে, 'কিসের ফর্ম এটা ?'

'ওকালতনামা। আপনি যে আমাকে আপনার কেসে ল-ইয়ার হিসেবে অ্যাপয়েণ্ট করলেন, কোর্টকে তো তা জানাতে হবে।'

'ওটা আপনার ব্যাগে রেখে দিন।'

'মানে ?'

'আমার ল-ইয়ারের দরকার নেই। ঝোঁকের মাথায় আমি কিছু করিনি। এখন যা কনফেস করছি, দু'মাস, চার মাস ছ'মাস, পরও ঠিক তাই করব। এ জন্যে আমার কোনো আক্ষেপ থাকবে না। আপনারা শুধু শুধু চিন্তা করছেন।'

'আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই।'

একটু চুপ করে থাকে সুচিত্রা। তারপর বলে, 'ঠিক আছে, ওকালত-নামাটা রেখে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন খুন বা খুনের অ্যাটেমপ্টের মামলা একদিনে শেষ হয়ে যায় না। আমরা বার বার আপনার সঙ্গে দেখা করব, যতবার কোর্টে কেস উঠবে সেখানেও যাব। আমার ধারণা, একদিন আপনাকে মত বদলাতে হবে।'

জয়তী সামান্য হাসে, উত্তর দেয় না।

এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল সমরেশ। এবার সে জয়তীকে বলে, 'তুমি যা করতে যাচ্ছ সেটা একেবারে সুইসাইড। আইনে যখন সবারই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, তুমি তার সুযোগ নেবে না কেন ?'

জয়তীর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'তোমার মতো আইন-টাইন আমি জানি না। তবে এটুকু জানি আইন নিরপরাধকে বাঁচাতে পারে কিন্তু দোষীকে কোনোভাবেই সাহায্য করে না, প্লীজ, আমার ওপর জোর করো না।'

সমরেশ বলে, 'জোর করতাম না, যদি বুঝতাম এই ট্র্যাজেডির জন্যে পুরোটা তুমি দায়ী।'

অদ্ভুত হাসে জয়তী। বলে, 'গুলি করলাম আমি। শুনেছি নিশানাথ সামন্ত হাসপাতালে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। আর বলছ এর জন্যে আমি পুরোটা দায়ী না ? খানিকটা যদি দায়ী হই, বাকিটা কে ?'

'আছে একজন। তুমি কো-অপারেট করলে আমরা তাকে খুঁজে বের

করব।'

কিছুক্ষণ ভেবে জয়তী বলে, 'অসম্ভব। এরকম কেউ থাকতেই পারে না।'

গলার স্বরে অনেকটা জোর দিয়ে সমরেশ বলে, 'পারে, পারে, পারে। তুমি কি জানো হাসপাতালে একটা লোক বার বার ফোন করে জানতে চেয়েছে, নিশানাথবাবু মারা গেছেন কিনা। মারা না গিয়ে থাকলে মরার সম্ভাবনা কতটা। লোকটা চায় নিশানাথবাবু মারা যান।'

জয়তী চমকে ওঠে। ব'লে, 'তুমি ঠিক বলছ!'

'মিথ্যে বলে আমার কী লাভ?'

'লোকটা কে?'

'সেটাই তো জানতে হবে।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় সমরেশের। গলার স্বর নামিয়ে দেয় সে, 'তার নামটাম কিছুই জানা যায়নি। শুধু ভয়েস শুনে এটুকু বোঝা গেছে—সে নন-বেঙ্গলি।'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকে জয়তী। দূরমনস্কর মতো কিছু ভাবতে চেষ্টা করছে সে।

অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে জয়তীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে করতে সমরেশ আগের স্বরেই বলে, 'এরকম কাউকে কি তুমি চেনো?'

জয়তী মুখ না ফিরিয়েই বলে, 'না। আমি ছাড়া কে আর নিশানাথকে খুন করতে চাইবে?'

'ভাল করে ভাবো। হয়ত মনে পড়ে যাবে।' গরাদের ফাঁকে মুখটা চেপে ধরে বলে যায় সমরেশ। তার গলা চাপা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

আচমকা শরীরে ক্ষিপ্র একটা মোচর দিয়ে ঘুরে বসে জয়তী। তীব্র গলায় বলে, 'তোমার কি ধারণা ঐ নন-বেঙ্গলিটা আমার সঙ্গে পরামর্শ করে হাসপাতালে ফোন করেছিল? প্লীজ তোমরা এবার যেতে পারো। আর বক বক করতে আমার ভাল লাগছে না।'

রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ে সমরেশ। ক্লান্তভাবে বলে, ঠিক আছে, এখন যাচ্ছি। তুমি না চাইলেও ফের আমরা আসব।'

সুচিত্রাকে সঙ্গে করে সমরেশ সামনের প্যাসেজ ধরে তাপসের কামরার দিকে যখন খানিকটা এগিয়ে গেছে, হঠাৎ পেছন থেকে জয়তী ডাকে, 'শোনো।'

সুচিত্রাকে অপেক্ষা করতে বলে ফিরে আসে সমরেশ। উৎসুক মুখে

জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবে ?'

জয়তী গরাদের ওধারে বসেই ছিল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'আমার সঙ্গে আর দেখা করতে এসো না। শুধু শুধু নতুন সমস্যা তৈরি করে কী লাভ ?'

তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত শান্ত, ধীর। একটু আগের তীব্রতা বা অসহিষ্ণুতা কিছুই নেই।

জয়তীর ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছিল সমরেশ। স্থির চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, তুমি যা ভাবছ, তেমন কোনো সমস্যা তৈরি হওয়া সম্ভব না। সুচিত্রা আমার বন্ধু।'

জয়তী অদ্ভুত হাসে, 'বন্ধু !' বেশ ! তার হাসিতে গূঢ় কোনো সংকেত রয়েছে।

সুচিত্রার সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক কিছু বলতে পারত সমরেশ কিন্তু এখন সেসব ভাল লাগছে না, খুবই ক্লান্ত বোধ করছে। আস্তে আস্তে লক-আপ পেছনে রেখে এগিয়ে যায় সে।

সুচিত্রাকে নিয়ে একটু পর সমরেশ তাপসের কামরায় চলে আসে।

তাপস ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। শেষ হলে টেলিফোন নামিয়ে সমরেশদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। কিছু বের করতে পারলে ?'

সমরেশ হতাশভাবে মাথা নাড়ে, 'নাথিং।'

'ওকে কী করে বাঁচাবে ?'

'যে সুইসাইড করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তাকে কে বাঁচাতে পারে ? আমরা অলমোস্ট একজস্টেড, তবু আশা একেবারে ছাড়ছি না। যাক, এবার চা আনাও।'

'সিওর।'

পাঁচ মিনিটের ভেতর চা এসে যায়। কাপ তুলে চুমুক দিতে দিতে সমরেশ বলে, 'তোমার এখান থেকে হাসপাতালে একটা ফোন করব। নিশানাথ বাবুর খবরটা নেওয়া দরকার।'

তাপস সাগ্রহে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, করো না। খবরটা আমারও চাই।'

সমরেশ ডায়াল করে ডাক্তার শুভাশিষ দত্তকে একবারেই পেয়ে যায়। তিনি বলেন, 'সুখবর দিচ্ছি, আজ ভোরে নিশানাথবাবুর জ্ঞান ফিরেছে।

তবে এখনও দারুণ দুর্বল। আমরা ওঁর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দিচ্ছি না।'

সমরেশ টের পায়, তার স্নায়ুর ভেতর দিয়ে আচমকা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফোনের ভেতর মুখ গুঁজে দিয়ে বলে, 'ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। প্লীজ, দেখা করার একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

'এখন কোনোভাবেই সম্ভব না। এত রক্ত বেরিয়ে গেছে যে কথা বলার মতো স্ট্রেংথও নেই। এই অবস্থায় আমরা ওঁর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দিতে পারি না। সামান্য এক্সাইটমেণ্ট হলে নিশানাথবাবুর ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'এখনই দেখা করতে চাইছি না। উনি আরেকটু সুস্থ হ'ন। তারপর বিকেলে বা সন্ধ্যেয় জাস্ট পাঁচ মিনিটের জন্যে আমাকে ওঁর কেবিনে অ্যালাউ করুণ ডক্টর দত্ত। আই উড রিমেন গ্রেটফুল টু ইউ।'

শুভাশিস তক্ষুনি উত্তর দেন না।

সমরেশ শমানে বলে যায়, 'প্লীজ ডক্টর দত্ত, দয়া করে না বলবেন না। এই দেখা হওয়াটা ভীষণ জরুরি। কাগজে রিপোর্টিংয়ের জন্যই শুধু না, এর সঙ্গে একজনের ফিউচার জড়িয়ে আছে। হয় সে রুইনড হয়ে যাবে, নইলে খানিকটা মর্যাদা নিয়ে বাকি লাইফ কাটাতে পারবে।'

শুভাশিস এবার বলেন, 'কার ?'

'জয়তী সান্যালের।'

'মানে যে মেয়েটা নিশানাথবাবুকে গুলি করেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো কালপিট। গুলি করেছে, পানিশমেণ্ট পাবে এর ভেতর মর্যাদার কথা আসছে কীভাবে ? 'ভেরি কনফিউজিং।'

'আপনাকে পরে বলব।'

'ঠিক আছে। এক কাজ করুন, সন্ধ্যেবেলা একটা ফোন করবেন। নিশানাথবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে চেষ্টা করব। তবে সব ডিপেণ্ড করছে উনি কতটা সুস্থ থাকেন, তার ওপর।'

'সে তো বটেই। অনেক ধন্যবাদ।'

ফোন নামিয়ে রেখে সমরেশ তাপসকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কখন জয়তীকে কোর্টে নিয়ে যাচ্ছ ?'

তাপস বলে, 'দশটা, সাড়ে দশটায় পৌঁছে যাব।'

'এখন উঠি। —কোর্টে দেখা হবে।'

থানায় খেয়াল হয়নি, বাইরে বেরিয়ে খানিকটা হাঁটার পর হঠাৎ সমরেশের মনে হয়, জয়তীকে যখন পুলিশ ভ্যান থেকে কোর্টে নামাবে তখন ক'টা ফোটো নেওয়া দরকার। কাছাকাছি একটা পোস্ট অফিসে গিয়ে 'দৈনিক মহাভারত'-এর অফিসে ফোন করে দেয় সে। ভাস্করকে যেন ক্যামেরা সুদ্ধু দশটা নাগাদ কোর্টে পাঠানো হয়।

নয়

এরপর এলোমেলো খানিকটা ঘুরে সুচিত্রা এবং সমরেশ যখন কোর্টে পৌঁছয় তখনও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এজলাসে ঢোকেননি। দর্শকের ভূমিকা নিয়ে একধারে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া তাদের করার কিছু ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেট আসার পর পুলিশের পক্ষ থেকে জয়তীকে কাঠগড়ায় তোলা হয়। তাপস এবং চারজন আর্মড গার্ড একটা বড় কালো ভ্যানে করে তাকে নিয়ে এসেছিল।

গোড়ার দিকে কোর্টে তেমন লোকজন ছিল না। পরে নিশানাথের কেসে অভিযুক্ত জয়তীর নামটা চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন ভিড় জমে যায় যে সামলাবার জন্য পুলিশ ডাকতে হয়।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জয়তী সমরেশদের দেখতে পায়। কিন্তু তার মুখ-চোখ এতই নিস্পৃহ যে ওদের সে আদৌ চেনে বলে মনে হয় না। তাপসও দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। কোর্টে সে সমরেশদের সঙ্গে কথা বলে না।

কলকাতার সব কাগজের ক্রাইম রিপোর্টাররা এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে।

যাই হোক, থানায় পুলিশ অফিসারদের বা সমরেশকে জয়তী যা বলেছিল, ম্যাজিস্ট্রের সামনে হুবহু সেই স্বীকারোক্তিই করে। অর্থাৎ নিশানাথ সামন্তকে সে নিজের হাতে গুলি করেছে এবং ভবিষ্যতে সুযোগ পাওয়ামাত্র হত্যা করবে।

এ জাতীয় কনফেসানের পর তদন্তের কারণে এবং সাক্ষী সাবুদ জোগাড় করার জন্য পুলিশের তরফ থেকে আরো কয়েকদিন জয়তীকে তাদের হেফাজতে রাখার আবেদন জানানো হয়। বিনা বাধায় ম্যাজিস্ট্রেট তা মঞ্জুর করেন।

এরপর জয়তীকে নিয়ে ভিড় ঠেলে তাপসরা কোর্টরুমের বাইরে চলে যায়। তাদের প্রায় পেছন পেছন সমরেশ এবং সুচিত্রাও বেরিয়ে পড়ে।

জয়তীকে দেখার জন্য যত লোক জমা হয়েছিল কোর্টরুমে, তাদের সবার জায়গা হয়নি। বিশাল জনতা বাইরের কমপাউণ্ডে অপেক্ষা করছিল। তাদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি এবং হই-চই শুরু হয়ে যায়।

ভাস্কর কমপাউণ্ডে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ছোকরা তুখোড় ফোটোগ্রাফার। ভিড় ঠেলে জায়গাটায়গা করে সে জয়তীর অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলে।

এদিকে তাপস এবং তার আর্মড গার্ডরা অনেক কষ্টে জনতার ভেতর দিয়ে রাস্তা করে জয়তীকে ভ্যানে তুলে একসময় চলে যায়। তারপর ভিড় পাতলা হতে হতে কোর্টের কমপাউণ্ড একেবারে ফাঁকা।

ভাস্কর সমরেশদের দেখতে পেয়েছিল। সে এগিয়ে আসে।

সমরেশ বলে, 'কখন এসেছ?'

ভাস্কর বলে, 'ঘণ্টাখানেক।'

'তোমাকে কোর্টরুমে দেখিনি তো।'

'ভেতরে গিয়ে লাভ নেই। ওখানে তো আর ছবি তুলতে দেবে না। তাই বাইরে ওয়েট করছিলাম। জয়তী সান্যালকে যখন থানা থেকে এখানে নিয়ে আসে তখন ভ্যানের ভেতর সাতআটটা ছবি নিয়েছি, নামাবার পরও নিয়েছি। আর এখন তো নিলামই।'

ভাস্করের কাঁধে আদরের ভঙ্গিতে একটা চাপড় মেরে সমরেশ বলে, ফাইন। তুমি সোজা অফিসে গিয়ে ছবিগুলো ডেভলাপ করিয়ে নাও।'

ভাস্কর 'আচ্ছা' বলেও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সমরেশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আর কিছু বলবে?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় ভাস্কর।

সমরেশ বলে, 'বল না।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না ভাস্কর। দ্বিধান্বিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে, 'অনেক দিন হয়ে গেল, অফিস আমাকে পার্মানেণ্ট করছে না। জান লড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছি, কোনোরকম ফাঁকি-বাজি নেই। কোম্পানির জন্যে লাইফের রিস্ক নিয়ে কত এক্সপ্লসিভ

ছবি তুলেছি। সবই আপনি জানেন দাদা।'

একটুও বাড়িয়ে বলছে না ভাস্কর। অ্যান্টিসোসালদের মারপিট এবং বোমা-পাইপগান চালানোর ছবি, ওয়াগান ব্রেকারদের অ্যাকসানের ছবি, উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ ফায়ারিং-এর ছবি, নানা-রকম ঝুঁকি নিয়ে এসব তুলে যায় সে। ছোকরা দারুণ বেপরোয়া। যে কোনো মুহূর্তে তার প্রাণটা চলে যেতে পারে। এত ঝুঁকি নেওয়ার কারণে তার ছবিগুলো 'দৈনিক মহাভারত'-এর আকর্ষণ এবং বিশ্বাস-যোগ্যতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

সমরেশ বলে, নিশ্চয়ই। তোমার মতো একজন ফোটোগ্রাফার তো কোম্পানির অ্যাসেট।'

ভাস্কর বলে, 'আপনি যদি রিকোয়েস্ট করেন, কোম্পানি আমাকে পার্মানেণ্ট করে নেবে।'

'আমার রিকোয়েস্টে কাজ হবে কিনা জানি না। তবে মোস্ট সার্টেনলি চেষ্টা করব।'

'দাদা, পার্মানেণ্ট হতে পারলে আমি হোল লাইফ আপনার গোলাম হয়ে থাকব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি এখন অফিসে চলে যাও।'

'আপনিও কি যাবেন ? আমার সঙ্গে স্কুটার আছে।'

'আমি পরে যাব।'

ভাস্কর চলে যায়।

সমরেশ কবজি উল্টে ঘড়ি দেখতে দেখতে সুচিত্রাকে বলে, 'সাড়ে এগারটা হয়ে গেল। এখন আর বাড়ি ফিরছি না। চল্, কাছেই একটা চাইনীজ রেস্তোরাঁ আছে। ওখানে লাঞ্চটা সেরে নিই।'

সুচিত্রা বলে, 'লাঞ্চ খাওয়ার সময় নেই। আলিপুরে আমার একটা কেস আছে। বারোটায় অ্যাটেণ্ড করতে হবে। চললাম, রাত্তিরে একটা ফোন করিস। নিশানাথবাবুর সঙ্গে কী কথাবার্তা হয় জানাস।'

'আচ্ছা।'

একটা ফাঁকা ট্যাক্সি থামিয়ে সুচিত্রা উঠে পড়ে।

একা একা আর রেস্তোঁরায় যেতে ইচ্ছা করে না সমরেশের। সে আরেকটা ট্যাক্সি ধরে 'দৈনিক মহাভারত'-এর অফিসেই চলে আসে। বিকেল পর্যন্ত তার হাতে কোনো কাজ নেই। নিশানাথবাবুর সঙ্গে কথা

বলার পর সে তার প্রোগ্রাম ঠিক করবে।

এখন মর্নিং শিফটের লোকেরা ডাক এডিসানের কাজ করে যাচ্ছে।

ডাক এডিসানের কাজ বেশ হালকা। সকালে সিটি এডিসানের কাগজে যে সব খবর বেরিয়েছে তার সঙ্গে নতুন কিছু জুড়ে দিতে পারলেই হয়। এই এডিসানের কাগজ কলকাতার জন্য নয়। নর্থ বেঙ্গল, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ত্রিপুরা—এমনি দূর দূর জায়গায় যেখানে বাঙালি আছে, অথচ মর্নিং এডিসানের কাগজ তাদের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়া যায় না, ডাক এডিসান তাদের জন্য।

সকালের শিফটে লোকজন কম থাকে। জনা তিনেক সাব-এডিটর, দু-একজন রিপোর্টার, আর একজন শিফট ইন-চার্জ। সে সিনিয়র বা ডেপুটি চীফ সাব এডিটরও হতে পারে।

আজ শিফট ইন-চার্জ মণিময় সেন। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, অনবরত পান চিবুচ্ছে। যেমন আড্ডা দিতে পারে তেমনি খিস্তিবাজ। মণিময় নিজেই বলে, 'আমার জিভে রেলিং নেই।' খিস্তিখেউড় যতই করুক, মনটা দারুণ পরিস্কার।

সমরেশকে দেখে মণিময় ঘাড় কাত করে, তেরছা চোখে তাকিয়ে মজার একটা ভঙ্গি করে। বলে, 'কী চাঁদু, তোমার তো সানডাউনের পর অফিসে ঢোকার কথা। দিনের বেলা কী মনে করে?'

তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসতে বসতে সমরেশ বলে, 'এই চলে এলাম।'

মণিময় নর্থ ক্যালকাটার আদি বাসিন্দাদের বংশধর। দু'শ বছর তারা এই শহরে আছে। তাদের এখন টেনথ কি টুয়েলভথ জেনারেসান চলছে। চবর চবর করে পান চিবুতে চিবুতে বলে, 'তোমার দেখছি দারুণ কাজের আঁটা। রাতদিন এখানে খেপ মারতে শুরু করেছ। তা ব্রাদার, এত কাজ করলে বডিতে যে নোনা লেগে যাবে।'

মণিময়ের কথায় কেউ কিছু মনে করে না। হাসতে হাসতে সমরেশ বলে, 'যা বলেছেন। এখন চা খাওয়ান তো—'

বেয়ারাকে চা আনতে দিয়ে মণিময় বলে, 'বিয়ে-ফিয়ে তো করলে না।'

'না, মানে সেরকম—'

'এত ক্রাইম ফ্রাইম দিনরাত ঘাঁটাঘাঁটি করলে একেবারে মেণ্টাল কেস হয়ে দাঁড়াবে। বিয়েটা যদি না-ও করতে পারো, ডাঁটো দেখে একটি

রক্ষিতা রাখো। মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটানোটা খুব ইমপর্টান্ট ব্যাপার।'

এই পরামর্শটা আগেও বার কয়েক দিয়েছে মণিময়। সমরেশ বলে, 'আপনার অ্যাডভাইসটা মনে থাকবে দাদা।'

মণিময় বলে, 'সৎ পরামর্শ কোনো শালা নেয় না। তা ব্রাদার, তুমি যদি রাজী থাকো, একটা চনমনে টাইপের লাট্টুমার্কা ছুঁড়ি খুঁজতে থাকি।'

'এখন একটু ব্যস্ত আছি দাদা। পরে আপনাকে জানাব। তখন খুঁজে দেবেন।'

'এই তোমাদের বদ দোষ। সময়ের জিনিস সময়ে করো না। এ সব ঝুলিয়ে রাখতে নেই। এর পর বডি অ্যান্ড মাইন্ড দুটোই দড়কচা মেরে যাবে।'

মণিময়ের সঙ্গে খানিকক্ষণ আড্ডা দিয়ে, চা খেয়ে সমরেশ সাব-এডিটরদের টেবিলে চলে যায়। সেখানেও অনেকটা সময় কাটিয়ে একতলায় ক্যানটিনে চলে যায়। দুপুরের খাওয়াটা আজ সেখানেই সেরে নেবে।

দুটো নাগাদ ফের নিউজ ডিপার্টমেন্টে চলে আসে সমরেশ। ততক্ষণে পরের শিফটের লোকজন চলে আসতে শুরু করেছে। এখন থেকে মাঝ-রাত পর্যন্ত বার্তা বিভাগ সরগরম হয়ে থাকবে।

কখনও রিপোর্টারদের টেবিলে, কখনও সাব-এডিটরদের কাছে, আবার কখনও বা ফোটোগ্রাফারদের ঘরে গিয়ে আরো কয়েক ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয় সমরেশ। তারপর অফিসের একটা গাড়ি রিকুইজিসান করে ভাস্করকে নিয়ে সাউথ ক্যালকাটা হসপিটালে চলে আসে।

গাড়িটা কমপাউন্ডে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ভেতরে এবং গেটের কাছে প্রচুর আর্মড পুলিশ। ক'টা কালো ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। একজন পুলিশ অফিসারের হাতে ওয়াকিটকি। অনবরত তিনি কী সব মেসেজ দিয়ে যাচ্ছেন।

সমস্ত পরিবেশটা দারুণ থমথমে। কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, বাইরে বেরুতেও না।

ভাস্কর বলে, 'কী ব্যাপার দাদা?'

সমরেশ বিমূঢ়ের মতো বলে, 'কী জানি, কিছু বুঝতে পারছি না।'

'নিশ্চয়ই গড়বড় কিছু হয়েছে।'

'চল, দেখা যাক।'

গাড়ি থেকে নেমে গেটের কাছে আসতেই ভেতরে সামান্য দূরে একজন চেনা পুলিশ অফিসারকে পেয়ে যায় সমরেশরা। তাঁর কথায় গেটের আর্মড গার্ড রাস্তা ছেড়ে দেয়।

সমরেশরা ভেতরে গিয়ে অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে চ্যাটার্জি সাহেব? মনে হচ্ছে সীরিয়াস কিছু—'

মধ্যবয়সী চ্যাটার্জি সাহেব অর্থাৎ ললিত চ্যাটার্জি লালবাজারের একজন দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ঝানু অফিসার। তিনি গলা নামিয়ে বলেন, 'খুবই সীরিয়াস। নিশানাথবাবুকে কিছুক্ষণ আগে মার্ডার করা হয়েছে।'

হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন পলকের জন্য থমকে গিয়ে পরক্ষণে বলের মতো লাফাতে থাকে। এমন একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল!

নিজেকে সামলে নিতে বেশ খানিকটা সময় লাগে সমরেশের। তারপরেই তার ভেতরকার দুর্দান্ত ক্রাইম রিপোর্টারটি তৎপর হয়ে ওঠে। সে বলে, 'ব্যাপারটা ঘটল কখন?'

'সাড়ে তিনটে নাগাদ। পেশেন্টদের ওয়ার্ডে ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হওয়ার আগে।'

'কেউ ধরা পড়েছে?'

'না। আপনি এক কাজ করুন, এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে চলে যান। ওখানে ডক্টর দত্ত আর ক্রাইম সেকসানের মনোজিৎ রয়েছে। দু'জনেই আপনার চেনা। ওদের কাছে ডিটেলে জানতে পারবেন।'

এখন ঘড়িতে পৌনে পাঁচটা। সোয়া একঘণ্টা আগে নিশানাথকে খুন করা হয়েছে আর সেই খবরটা সমরেশ পেল কিনা এত দেরিতে! দারুণ আপসোস হচ্ছে তার। অফিসে ক'ঘণ্টা আড্ডা না দিয়ে লাঞ্চের পরই সে যদি হাসপাতালে চলে আসত! অন্তত শুভাশিস দত্তকে আরেক বার ফোন করা উচিত ছিল।

এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের দিকে যেতে যেতে সমরেশ লক্ষ করল, হাসপাতালে লোকজন বেশ কম, ভিড় টিড় তেমন নেই। ডান পাশে অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টের বিরাট ওয়ার্ড। সেখানে পেশেন্টরা চুপচাপ যে যার বেডে শুয়ে বা বসে আছে। এখনও ভিজিটিং আওয়ার্স চলছে,

কিন্তু তাদের আত্মীয়স্বজনদের দেখা যাচ্ছে না। তার মানে ভিজিটরদের আজ ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ডাক্তার, নার্স এবং ক্লাস ফোর স্টাফের লোকজনরা সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে, প্রায় দমবন্ধ করেই যেন এধারে ওধারে চলাফেরা করছে।

এমন মারাত্মক ঘটনা সাউথ ক্যালকাটা হাসপাতালে আর কখনও ঘটেনি। অন্তত সমরেশের তা জানা নেই। ফলে দশ একর জায়গা জুড়ে বিশাল হাসপাতাল কমপাউণ্ডটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

এমার্জেন্সি ডিপার্টমেণ্টে আসতেই দেখা গেল কাল রাতের চেয়েও আজ অনেক বেশি পুলিশ চারিদিকে থিকথিক করছে। আর দেখা যাচ্ছে বহু ভি. আই. পি.' কে। এম. এল. এ., এম. পি. অধ্যাপক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, বৈজ্ঞানিক—এমনি সব মানুষ। তাঁরা সবাই শোকাতুর এবং আতঙ্কগ্রস্ত। চাপা গলায় সকলে কথা বলছিলেন।

সমরেশ ভি. আই. পি-দের দেখিয়ে নিচু গলায় ভাস্করকে বলে, 'এদের ছবি তুলে নাও।'

ভাস্কর এক মিনিটের মধ্যে ক্যামেরা রেডি করে ছবি তুলতে শুরু করে। আর সমরেশ নিশানাথবাবুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এম. পি, এম. এল. এ এবং মন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়া জেনে নিয়ে নোট করতে থাকে। কিভাবে নিশানাথ খুন হয়েছেন, সে তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তার আগেই যে প্রতিক্রিয়া জেনে নিচ্ছে তাঁর একমাত্র কারণ এতজন ভি. আই. পি-কে পরে একসঙ্গে পাওয়া যাবে না। তা'ছাড়া এরা সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। বেশিক্ষণ এখানে থাকবেন না, পাঁচ দশ মিনিট কি বড় জোর আধ ঘণ্টা বাদে সবাই চলে যাবেন। কিন্তু শুভাশিস দত্ত আর পুলিশ অফিসারদের এখানে অনেকক্ষণ পাওয়া যাবে। তাঁদের কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডের যাবতীয় খুঁটিনাটি খবর জোগাড় করতে অসুবিধা হবে না।

ছবি তোলা এবং প্রতিক্রিয়া নোট করার পর ডাক্তার শুভাশিস দত্তর কামরায় চলে আসে সমরেশ। সেখানে তাঁকে, মনোজিৎকে এবং আরো দু'জন পুলিশ অফিসারকে পাওয়া যায়। ডাক্তার দত্ত আর মনোজিৎ ছাড়াও অন্য পুলিশ অফিসার দু'জনও সমরেশের চেনা। ওরা নিশানাথ হত্যার বিষয়েই আলোচনা করছিলেন।

শুভাশিস সমরেশকে দেখে বলেন, 'কী ব্যাপার, আপনি এত লেট? অন্য কাগজের লোকেরা তো কখন এসে খবর নিয়ে চলে গেছে। আপনি

ইনফরমেসান পাননি ?'

সমরেশ একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলে, 'না।' নিজের ওপর তার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল। সবাই বলে, সে নাকি অনেক আগে থেকেই ঘটনার গন্ধ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাজির হয়ে যায়। তার চার পাঁচ বছরের কেরিয়ারে এই প্রথম ঘটনার জায়গায় সবার শেষে এসে পৌঁছুল সমরেশ। হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল তার।

কিন্তু যা হবার তা তো হয়েই গেছে। নিজেকে দ্রুত ধাতস্থ করে নিয়ে সমরেশ বলে, 'প্লীজ, এবার ডিটেলে বলুন, ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল।'

শুভাশিস যা উত্তর দিলেন তা এইরকম। সকালের দিকে নিশানাথের জ্ঞান ফিরে আসে। তারপর থেকে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। যদিও প্রচুর রক্তপাত হয়েছে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্বল তবু ডাক্তাররা শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে নিশানাথের প্রাণের আশঙ্কা আর নেই। তিনি অবশ্যই বেঁচে যাবেন।

যথারীতি তাঁর কেবিনের সামনে দু'জন আর্মড গার্ড পাহারা দিচ্ছিল। আধ ঘণ্টা পর পর একজন নার্স আর ঘণ্টাখানেক পর পর ডাক্তার দত্ত নিজে গিয়ে তাঁকে দেখে আসছিলেন। দুপুর নাগাদ অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় দু-একটা কথাও বলেছিলেন নিশানাথ, সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু সাড়ে তিনটে নাগাদ আর্মড গার্ডরা হঠাৎ পর পর দুটো গুলির আওয়াজ পায়। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল একটা চিৎকার। তারা তক্ষুনি নিশানাথের কেবিনে দৌড়ে যায়। পাঁচ মিনিট আগে নার্স তাঁকে ইঞ্জেকসান দিয়ে গেছে। তখন কেবিনে নিশানাথ ছাড়া আর কেউ ছিল না।

আর্মড গার্ডরা দেখতে পায় রক্তে নিশানাথের বেড ভেসে যাচ্ছে। তাঁর মাথায় এবং ঘাড়ে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। ফায়ারিং-এর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে যায়।

শুনতে শুনতে শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায় সমরেশের। সে বলে, 'দিনের বেলা—চারপাশে এত লোকজন, ডাক্তার, নার্স, তার ওপর কেবিনের ঠিক বাইরে দু'জন আর্মড গার্ড। এর মধ্যে মার্ডারার ঢুকল কিভাবে আর সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডটা ঘটিয়ে বেরিয়েই বা গেল কেমন করে ?'

শুভাশিস জানান, কেবিনের পেছন দিকে সরু একটা প্যাসেজ রয়েছে। সেটা বহুকাল ব্যবহার করা হয় না। প্যাসেজের পর উঁচু কমপাউন্ড ওয়াল। তারপর বড় রাস্তা। খুনীরা দেওয়াল টপকে ঐ

প্যাসেজটা কাজে লাগিয়েছিল। তারপর রেইন ওয়াটার পাইপ বেয়ে কেবিনের ওধারের জানালা পর্যন্ত উঠে ফায়ার করে। আর্মড গার্ডদের একজন ওদের দেখতে পেয়ে অনেকটা ঘুরে তাড়া করে যায়। কিন্তু ততক্ষণে ওরা পাঁচিল টপকে বড় রাস্তায় চলে গেছে। সেখানে একটা জীপ স্টার্ট দেওয়া ছিল, ওরা সেটায় চড়ে পালিয়ে যায়।

সমরেশ এবার মনোজিৎকে বলে, 'আপনাদের ঐ প্যাসেজের দিকটায় পাহারা রাখা উচিত ছিল।'

মনোজিৎ বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ। সেটাই ভুল হয়ে গেছে। আসলে আমরা ভাবতেই পারিনি, হাসপাতালের ভেতর ফুল ডে-লাইটে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে। নাঃ, এমন একটা মানুষকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না।' আক্ষেপে প্রায় ভেঙে পড়ে সে, 'সামান্য একটা ভুলের জন্য নিশানাথবাবুর মতো মানুষ খুন হয়ে গেলেন।'

মনোজিৎ-এর অনুশোচনা যে যথেষ্ট আন্তরিক, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শুভাশিষ বলেন, 'টেক্সাসেই এরকম ব্যাপার-স্যাপার ঘটে বলে শুনেছি। কলকাতায় এমন ডেসপারেট মার্ডারার রয়েছে কে জানতো!'

সমরেশ বলে, 'মনে হয়, ভাড়াটে খুনী। প্রোফেসানাল মার্ডারার।'

মনোজিৎ সায় দেয়, 'হুঁ।'

'বয়েস কিরকম হবে?'

'আর্মড গার্ডরা বলেছে সাতাশ-আটাশের মতো। মোটামুটি দু'জনের ডেসক্রিপসানও দিয়েছে। পেটানো হেলথ, ছ'ফিটের মতো হাইট। একজন ফর্সা, আরেকজন কুচকুচে কালো। কালোর গালে চাপ দাড়ি। দু'জনেরই হাতে স্টিলের বালা। পরনে চাপা জীনস আর টাইট গেঞ্জি।'

'আপনাদের কাছে ক্রিমিনালদের যে লিস্ট আছে তার মধ্যে এইরকম ডেসক্রিপসনের লোক থাকতে পারে?'

'মিলিয়ে দেখতে হবে। থাকতেও পারে, আবার না থাকারও সম্ভাবনা আছে। যা দিনকাল, নতুন নতুন সব ক্রিমিনাল তৈরি হচ্ছে। নতুন হলে ধরা খুব মুশকিল। তবে—'

'কী?'

'অ্যাকসানের মোডাস অপারেন্ডি দেখে মনে হচ্ছে, একেবারে আনকোরা হবে না। নতুন ইনএক্সপিরিয়েন্সরা এত নিখুঁত অপারেসান করতে পারে না।'

'ধরা পড়লে যেন সবার আগে খবর পাই। আমি অবশ্য রেগুলারলি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাব।'

'ঠিক আছে।'

এবার সমরেশ শুভাশিসের দিকে তাকায়। হঠাৎ কি মনে পড়ে গেছে তার। উৎসুক মুখে বলে, 'সেই লোকটা আর ফোন করেছিল?'

বুঝতে না পেরে শুভাশিস জিজ্ঞেস করেন, 'কার কথা বলছেন?'

'সেই যে নন-বেঙ্গলি লোকটি—'

হঠাৎ খাড়া হয়ে বসেন শুভাশিস। বলেন, 'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশানাথবাবু খুন হওয়ার পাঁচ সাত মিনিট বাদে লোকটা ফোন করেছিল।'

সমরেশ বলে, 'কী বললে সে?'

'জানতে চাইল, নিশানাথ মারা গেছেন কিনা। আমি হ্যাঁ বলতেই লাইন কেটে গেল।'

মনোজিৎ বলে, 'কই আমাকে তো এই ফোনের কথা বলেননি!'

শুভাশিস বলেন, 'আমার কি মাথার ঠিক ছিল! অনবরত চারদিক থেকে ফোন আসছে। খবরের কাগজ, টিভি, রেডিও থেকে লোক আসতে শুরু করেছে। মন্ত্রী-টন্ত্রী থেকে শুরু করে কত ধরনের ভি. আই. পি'রা যে আসতে লাগলেন তার হিসেব নেই। এ সব সামলাতে গিয়ে ঐ লোকটার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু এই মার্ডারে ওটা একটা ভেরি ইমপর্টান্ট ক্লু। ঐ লোকটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সমরেশ বলে, 'নিশানাথবাবুর ডেড বডি কি পোস্ট মর্টেমের জন্যে পাঠানো হয়েছে?'

শুভাশিস বলেন, 'না। ফরেন্সিক এক্সপার্টরা কিছুক্ষণ আগে ওঁর কেবিন দেখে গেলেন। এবার হয়ত পুলিশ বডি নিয়ে যাবে—তাই না মনোজিৎবাবু?'

মনোজিৎ বলে, 'হ্যাঁ।'

সমরেশ বলে, 'আমরা নিশানাথবাবুর একটা ফটো তুলতে চাই।'

শুভাশিস বলেন, 'ডেড বডি এখন পুলিশের হেফাজতে। ওঁদের কাছ থেকে পারমিসান নিতে হবে।'

মনোজিৎকে সমরেশ অনুরোধ করতে সে রাজী হয়ে যায়। কিছুক্ষণ

পর ভাস্করকে দিয়ে মৃত নিশানাথের ছবি তুলিয়ে সোজা 'দৈনিক মহাভারত'-এর অফিসে চলে আসে সে।

নিশানাথের হত্যাকাণ্ড নিয়ে গোটা নিউজ ডিপার্টমেণ্ট জুড়ে তুমুল হইচই চলছিল। সমস্ত খবর 'ডিটেলে' জানার জন্য সমরেশকে সবাই ছেঁকে ধরে। তাদের যাবতীয় কৌতূহল দ্রুত মিটিয়ে কপি লিখতে বসে যায় সমরেশ। ঘণ্টাখানেকের ভেতর লেখা শেষ করে ভবতোষের হাতে যখন জমা দিচ্ছে, একটি জুনিয়র রিপোর্টার এসে বলে, 'সমরেশদা আপনার একটা ফোন এসেছে।'

সমরেশ ভবতোষকে বলে, 'আপনি কপিটা পড়ুন ভবতোষদা। কে ফোন করল দেখি।'

'আচ্ছা—'

টেলিফোন তুলতেই ওধার থেকে তাপসের গলা ভেসে আসে, 'যাক, শেষ পর্যন্ত ধরা গেল। এর আগে দু-তিনবার তোমাকে ফোন করেছি।'

সমরেশ বলে, 'আমি হসপিটালে ছিলাম। নিশানাথবাবুর ব্যাপারটা নিয়ে—মানে বুঝতেই পারছ—'

'হ্যাঁ, তাই ভেবেছিলাম। তুমি কি এখন ফ্রি ?'

'হ্যাঁ। কেন ?'

'যত তাড়াতাড়ি পার, একবার থানায় চলে এসো।'

সমরেশ রীতিমত অবাকই হয়ে যায়। বলে, 'কী ব্যাপার ?'

তাপস বলে, 'জয়তী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

সমরেশ চমকে ওঠে। যে মেয়েটা মনে মনে তাকে ঘৃণা করে, যে চায় না সমরেশ তার কাছে যায়, সমস্ত অতীতকে যে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে, হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে সে তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে! হৃৎপিণ্ডের ভেতর দ্রুত তালে কিছু বেজে যাবার শব্দ শুনতে শুনতে সমরেশ বলে, 'এক্ষুনি চলে আসছি। উইদ ইন হাফ অ্যান আওয়ার।'

'আচ্ছা।'

ফোন নামিয়ে রেখে ভবতোষের কাছে চলে আসে সমরেশ। ভবতোষ টেবিলে ঝুঁকে তারই কপিটার ওপর কত পয়েণ্ট টাইপে কী মেজারে কম্পোজ হবে, তার নোট দিচ্ছেন।

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'ঠিক আছে ভবতোষদা ?'

'সুপার্ব।' মুখ তুলে ভবতোষ বলেন, 'কালও আমরা বাজারে

সেনসেসান ফেলে দেব। আরে, দাঁড়িয়ে কেন? বসো বসো—'

'এখন আর বসব না ভবতোষদা। নিশানাথবাবুর কেসের ব্যাপারে এখনই এক জায়গায় যেতে হবে। আমার ধারণা, সেখানে এমন কিছু পেতে পারি যাতে সেনসেসান টেন টাইমস বেড়ে যাবে।'

দারুণ উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ান ভবতোষ। বলেন, 'অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে চলে যাও। কী পেলে, যত রাত্তিরই হোক, ফোন করে জানিয়ে দিও। তোমার কপির সঙ্গে জুড়ে দেবো।' তাঁর কণ্ঠনালী দ্রুত ওঠানামা করতে থাকে। এটা তাঁর উত্তেজনা এবং টেনসানের প্রকাশ।

'দেখি কী পাওয়া যায়। অফিসের গাড়ির দরকার নেই। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'তোমার ফোনের জন্যে কিন্তু ওয়েট করব।'

'ঠিক আছে।'

সমরেশ বেরিয়ে পড়ে।

দশ

থানায় তাপস অপেক্ষা করছিল। সমরেশ আসতেই তাকে সঙ্গে করে মেয়েদের লক-আপের দিকে এগিয়ে যায়।

সমরেশ একই সঙ্গে কৌতূহল আর উত্তেজনা বোধ করছিল। পাশা-পাশি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করে, 'কেন আমার সঙ্গে জয়ন্তী দেখা করতে চায় তুমি কিছু জানো?'

তাপস বলে, 'হয়ত তোমাকে এক্সক্লুসিভ কোনো খবর দেবে।' তার-পর গলার স্বরটা পালটে রগড়ের ভঙ্গিতে বলে, 'খুনের মামলার সুন্দরী যুবতী কয়েদী একজন ইয়াং ক্রাইম রিপোর্টারকে রাত্তিরবেলা ডেকে গোপন কিছু বলতে চায়—ব্যাপারটা হাইলি সাসপিসাস! তার ওপর একসময় দু'জনের আবার ভাব-ভালবাসা টাসা ছিল।' বলতে বলতে গলার স্বর আরো একবার বদলে যায় তাপসের, 'ঐ দেখ, ব্যাটারা এখনও বকর বকর করে যাচ্ছে।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'কাদের কথা বলছ?'

সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তাপস বলে, 'ঐ যে—'

দেখা যায়, লক-আপের গরাদের এধারে দুটো লোক দাঁড়িয়ে আছে। কালো কোট দেখে শনাক্ত করা যায় একজন উকিল। দ্বিতীয় লোকটি

মধ্যবয়সী, পরনে ধুতি আর হাফ শার্ট, মুখটা পেঁপের মতো। ওপর দিকটা সরু, নিচের অংশ ছড়ানো। নাকের তলায় চৌকো গোঁফ, চোখে ধূর্ত চাউনি। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, তার দু'ধারে চুল পাট করে আঁচড়ানো। ওরা জয়তীর সঙ্গিনী জবরদস্ত চেহারার সেই মেয়েমানুষ দুটোর সঙ্গে নিচু গলায় ষড়যন্ত্রকারীর মতো কী সব কথা বলছিল।

তাপস ফের বলে, 'ওরা আজ দু'বার এল। দুপুরে আর এখন। ঐ মেয়েমানুষ দুটো ওদের ক্লায়েন্ট। জামিনে ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে এসেছে।'

'ওদের আজ কোর্টে নিয়ে যাওনি ?'

'না। জয়তীকে নিয়ে যেতে হল। তারপর এখানে ফিরেই ছুটলাম লালবাজার। সেখান থেকে ফিরতে না ফিরতে খবর পেলাম নিশানাথ-বাবু খুন হয়েছেন। দৌড়লাম হাসপাতালে। এত সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কখন আর মেয়েমানুষ দুটোকে কোর্টে নিয়ে যাই ! কাল ফার্স্ট আওয়ারে ওদের আদালতে প্রডিউস করব।'

সমরেশরা লক-আপের কাছে চলে এসেছিল। পায়ের শব্দে চমকে উঠে উকিল এবং তার সঙ্গী, দ্রুত ঘাড় ফেরায়। তারপর অত্যন্ত ব্যস্তভাবে মেয়েমানুষ দুটোকে বলে, 'আজ চলি।' তাপসদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'গুড নাইট স্যার। কাল কিন্তু আমার ক্লায়েন্টদের কোর্টে প্রডিউস করবেন। সামান্য কারণে তারা লক-আপে পচছে।' চলার গতি না থামিয়ে তারা ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যায়।

তাপস উত্তর দেয় না।

লক-আপের কাছে আসতেই সেই মেয়েমানুষ দুটো চট করে ডান পাশের দেওয়ালের শেষ মাথায় গিয়ে পেছন ফিরে বসে পড়ে।

জয়তী বাঁ দিকের দেওয়ালের পাশে চুপচাপ বসে ছিল। সে আস্তে আস্তে উঠে এসে গরাদের ওধারে দাঁড়ায়।

তাপস বলে, 'তোমরা কথা বল। আমি আমার কামরায় আছি।' লম্বা প্যাসেজ ধরে সে চলে যায়।

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে দেখা করতে বলেছ ?'

জয়তী মাথাটা আস্তে একধারে হেলিয়ে দেয়। তারপর বলে, 'একটা খবর পেলাম। সত্যি কিনা বুঝতে পারছি না।'

খবরটা কী হতে পারে, দ্রুত আন্দাজ করে নেয় সমরেশ। বলে, 'তুমি

নিশ্চয়ই নিশানাথবাবুর খবর জানতে চাইছ ?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

'ঠিক বলছ ?'

'মিথ্যে বলে আমার কী লাভ ?' বলে সমরেশ জানিয়ে দেয়, কখন কিভাবে নিশানাথকে হত্যা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে নিজে হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহ দেখে এসেছে এবং এ ব্যাপারে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তার ওপর রিপোর্ট বানিয়ে নিউজ এডিটরের হাতে জমা দিয়ে এখন 'দৈনিক মহাভারত'-এর অফিস থেকে সোজা এখানে চলে আসছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে জয়তী। তার মুখের ওপর দিয়ে সংশয়, দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা একসঙ্গে ছায়া ফেলে যায়। একসময় দূরমনস্কর মতো সে বলে, 'আমার কি কোনো গোলমাল হয়ে গেল !'

প্রবল আগ্রহে সমরেশের দুই হাত লক-আপের গরাদ চেপে ধরে। সে বলে, 'কিসের গোলমাল ?'

'নিশানাথ সামন্তর ব্যাপারে। কোথাও বোধহয় আমার ভুল হয়ে গেছে।' বলেই সমরেশের একটা হাত আঁকড়ে ধরে জয়তী, 'তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে।'

স্নায়ুমণ্ডলীতে তীব্র উত্তেজনা টের পায় সমরেশ। আজ সকালেই জয়তী তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কাল এবং আজ দু-দু'বার সে এখানে এসেছে কিন্তু ক'টা কথাই বা বলেছে জয়তী ! সে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল, সমরেশের কোনোরকম সাহায্য চায় না। তার সঙ্গে ভবিষ্যতে দেখা হোক, এটা জয়তীর আদৌ কাম্য নয়। অথচ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কী এমন ঘটে গেছে যাতে সে-ই নিজের থেকে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে ! অনুমান করা যাচ্ছে, নিশানাথের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এর কারণ। হয়ত এ বিষয়ে সে কিছু বলবে। তাই যদি হয়, পুলিশকে জানানোই তো স্বাভাবিক ছিল। তবে কি তার প্রতি জয়তীর ঘৃণা, অবিশ্বাস এবং বিতৃষ্ণা কেটে যেতে শুরু করেছে ? অপরিসীম ঔৎসুক্যে সমরেশ বলে, 'বল।'

'নিশানাথ সামন্তকে আমি ছাড়া আর কেউ খুন করতে পারে, ভাবতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, আমার ভাই বিশুকে যারা গুম করেছে তারা এর পেছনে থাকতে পারে—'

'কারা তারা ?'

কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়ে কোনো স্বয়ংক্রিয় নিয়মে দ্রুত পেছন ফেরে জয়তী। তার দেখাদেখি সমরেশও মুখ ফেরায়। দু'জনেরই চোখে পড়ে, সেই মেয়েমানুষ দুটো ডান পাশের দেওয়াল থেকে অনেকটা এগিয়ে এসে স্থির দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ্য করছে। প্রতিটি কথা যে তারা শুনেছে, সন্দেহ নেই।

জয়তী এবং সমরেশ ঘুরে তাকাতেই ধড়মড় করে মেয়েমানুষ দুটো ফের দেওয়ালের কাছে সরে যায়।

জয়তী কয়েক পলক তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর চাপা গলায় বলে, 'আজ থাক! কাল দুপুরে ওদের কোর্টে নিয়ে যাবে। তখন যদি কষ্ট করে আসতে পারো—বলব।'

বোঝা যাচ্ছে, মেয়েমানুষ দুটোর সামনে মুখ খুলতে চায় না জয়তী। যা বলার গোপনেই বলবে। আর কেউ তা শুনুক, সেটা তার কাছে একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এখনই শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সমরেশ। অস্থির গলায় সে বলে, 'ও-সি আমার বন্ধু। ওকে বলি একটা ফাঁকা ঘরের ব্যবস্থা করে দিক। সেখানে তুমি আমাকে বলতে পারো।'

কিছুক্ষণ কী ভাবে জয়তী, তারপর বলে, 'না। কালই শুনো।'

অনেক বার বলা সত্ত্বেও রাজী হয় না জয়তী। অগত্যা খানিকটা নিরাশ হয়েই সমরেশকে ফিরে যেতে হয়। এটুকুই ভরসা, কাল দুপুরে মেয়েমানুষ দু'টি যখন থাকবে না, সেই সময় জয়তীর কাছ থেকে নিশানাথের খুনের ব্যাপারে জরুরি কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, তার সম্বন্ধে জয়তীর মনোভাব বদলাতে শুরু করেছে।

ফ্ল্যাটে ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ সুচিত্রার সঙ্গে ফোনে কথা বলে সমরেশ।

প্রায় দুপুর পর্যন্ত সুচিত্রা এবং সে একসঙ্গে ছিল। কোর্ট থেকে বেরিয়ে সুচিত্রা তার একটা কেসের ব্যাপারে চলে যায়, আর সমরেশ চলে আসে 'দৈনিক মহাভারত'-এর অফিসে। তখন থেকে এতটা রাত পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব কিছু সুচিত্রাকে জানিয়ে দেয় সমরেশ। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে, খেয়াল নেই।

এগার

ঘুম ভাঙে টেলিফোনের একটানা আওয়াজে। ধড়মড় করে উঠে বসতেই সমরেশের চোখে পড়ে, বেশ বেলা হয়েছে, ঝকঝকে রোদে ঘর ভরে গেছে।

হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে কানে লাগাতেই তাপসের গলা ভেসে আসে, 'তোমাকে খুব খারাপ একটা খবর দিচ্ছি ভাই।'

সমরেশ চমকে ওঠে, 'কী ? কী হয়েছে ?'

তাপস এবার যা বলে তা এইরকম। আজ সকালে কনফেসান আদায়ের জন্য জয়তীকে একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়েছিল সে। এটা রুটিন ওয়ার্কের মধ্যে পড়ে। মিনিট দশেক কথা বলে আবার তাকে লক-আপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নিজের কামরায় এসে তাপস যখন চা খেতে খেতে আজকের মর্নিং এডিসানের কাগজ পড়ছে সেই সময়ে মেয়েদের লক-আপের দিক থেকে তুমুল চিৎকার ভেসে আসে। কাগজ-টাগজ ফেলে দৌড়ে সেখানে চলে যায় তাপস। যা তার চোখে পড়ে তাতে নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। সেই মেয়েমানুষ দুটো গলার শিরা ছিঁড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে আর বেঁহুশ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে জয়তী।

হইচই শুনে থানার অন্য অফিসার এবং কনস্টেবলরাও দৌড়ে আসে। সবার সামনে মেয়েমানুষ দুটো জানায়, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য জয়তীকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে তাপস এমন বেদম [illegible]রেছে যে টলতে টলতে লক-আপে এসে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তার নাকমুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুতে থাকে।

শ্বাসরুদ্ধের মতো সমরেশ জিজ্ঞেস করে, তারপর ?'

তাপস বলে, 'জয়তীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তার কাছে পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'বাঁচবে তো ?'

'ডাক্তার কোনো কথা দিতে পারছেন না। কেস ইজ ভেরি সীরিয়াস। সাঙ্ঘাতিক ইনজুরি হয়েছে অ্যাবডোমে[illegible] আর গলায়। গলা টিপে ধরে তলপেটে প্রচণ্ড মারা হয়েছে।'

'কে মারতে পারে ?'

'কে আবার, ঐ মেয়েমানুষ দুটো।'

সংশয়ের সুরে সমরেশ প্রশ্ন করে, 'ওরা ওকে মারবে কেন?'

তাপস বলে, 'বুঝতে পারছ না, ওদের এজেন্ট হিসেবে এখানে ঢোকানো হয়েছে।'

বিদ্যুৎচমকের মতো সমরেশের এবার মনে পড়ে, কাল রাতে জয়তী যখন তার সঙ্গে কথা বলছিল, মেয়েমানুষ দুটো চোখের তারা স্থির করে গোগ্রাসে প্রতিটি শব্দ যেন গিলছিল। তা ছাড়া ওদের উকিল এবং হাফ শার্ট আর ধুতিপরা লোকটা তাকে এবং তাপসকে দেখামাত্র প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত সন্দেহজনক। তাপস যা বলছে তা একেবারে অসম্ভব মনে হচ্ছে না। নিশানাথকে গতকাল যে খুন করা হল, তার পেছনে কারা আছে, জয়তী হয়ত জানে। তাই তাকে চিরকালের মতো চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য ঐ মেয়েমানুষ দুটোকে কৌশলে লক-আপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবু কোথায় যেন একটা খটকা থেকে যায়। সমরেশ বলে, 'জয়তীই তো নিশানাথকে খুন করতে চেয়েছিল। তবে তাকে শেষ করে দেবার জন্য লোক লাগানো হ'ল কেন, আমার মাথায় ঢুকছে না।'

তাপস বলে, 'ভেরি সিম্পল। যখন ষড়যন্ত্রকারীরা দেখল নিশানাথের জ্ঞান ফিরেছে, প্রফেসানাল মার্ডার পাঠিয়ে তাঁকে খুন করালে। তাদের ভয় হল, তিনি সুস্থ হলে অনেক গোপন খবর বেরিয়ে পড়বে। জয়তীর ব্যাপারটা অন্যরকম। রাগ এবং ইমপালসের মাথায় সে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্যের মতো নিশানাথবাবুকে গুলি করেছিল। কিন্তু যখন দেখলে অন্য কেউ তাঁকে মার্ডার করেছে, তার সন্দেহ হয়। তোমাকে একটু আগে বললাম না, ষড়যন্ত্রকারীদের হয়ত সে চেনে। তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। অবশ্য আমার ধারণা ঠিক না-ও হতে পারে। জয়তী যতক্ষণ না মুখ খুলছে, নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।'

তাপসের কথা শুনতে শুনতে সমরেশের মনে হয়, মাথার ভেতর আগুনের চাকার মতো কিছু ঘুরে যাচ্ছে। কাল রাত দশটায় জয়তীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা পর রক্তাক্ত বেহুঁশ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে যেতে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল! কাল জোর করে জয়তীকে লক-আপ থেকে বার করে এনে তার কথা শুনে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যা করা যায়নি তার জন্য এখন নিষ্ফল আক্ষেপ ছাড়া আর

কিছু করণীয় নেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, জয়তীকে বাঁচানো যাবে কিনা। এই চিন্তাটা সমরেশের বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরমার করে দিতে থাকে। তার মনে হয়, আট বছর পরও তার জীবনের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে জয়তী।

লাইনের ওধার থেকে তাপসের গলা ভেসে আসে, 'আমি একেবারে ফেঁসে গেলাম সমরেশ। লক-আপে আমার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় জয়তী ওভাবে জখম হয়েছে। কোর্টে কেস উঠলে ঐ মেয়েমানুষ দুটো সাক্ষী দেবে, কনফেসান আদায়ের জন্য আমি ব্রুটালি টরচার করেছি। ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাস করতেও পারে। তার আগে ডিপার্টমেণ্টাল এনকোয়ারি হলে হয়ত আমাকে সাসপেণ্ড করা হবে। ডি. সি-কে ফোনে সব জানিয়েছি। তিনিও আমাকে অনেক দিন চেনেন, অ্যাসুওরেন্সও দিয়েছেন। তবুও দুশ্চিন্তা কাটছে না।' একটু থেমে ফের শুরু করে 'এরকম একটা জঘন্য ব্যাপার করতে পারি, নিশ্চয়ই তুমি বিশ্বাস করবে না।'

সমরেশ বুঝতে পারে, একটি বর্ণও মিথ্যে বলছে না তাপস। স্বীকারোক্তির জন্য মারধর বা অন্য কোনোরকম টরচার করলে কাল জয়তীকে কোর্টে নিয়ে যাবার আগেই করতে পারত। তা ছাড়া সে যখন জানতে পেরেছে, জয়তীর সঙ্গে সমরেশের ঘনিষ্ঠতা ছিল, একই শহরে তারা থাকত, এবং এখনও মেয়েটার সম্বন্ধে তার মনের কোথাও খানিকটা নরম জায়গা রয়েছে, তখন থেকেই পুলিশের আইনকানুন বাঁচিয়ে জয়তীর ব্যাপারে যতটা ভদ্র ব্যবহার করা সম্ভব—করছে। তার সম্পর্কে তাপস যথেষ্টই সহানুভূতিশীল।

সমরেশ বলে, 'না, করি না।'

তাপস বলে, 'এখন দরকার যত তাড়াতাড়ি পারা যায় জয়তীকে সুস্থ করে তোলা। সেটা অবশ্য ডাক্তারদের হাতে। জয়তীই বলতে পারবে কারা কিভাবে মেরেছে। সে বাঁচলে আমি বাঁচব। নইলে বোধহয় ফিনিশড হয়ে যাব।'

সমরেশ বুঝিবা তাপসের কথা শুনতে পাচ্ছিল না। ঘোরের ভেতর থেকে সে বলে ওঠে, 'যেভাবেই হোক, ওকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।' গলার স্বরে সবটুকু জোর দিয়ে বলে সমরেশ।

এরপর জয়তীকে কোন হাসপাতালের কোন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে,

ইত্যাদি খুঁটিনাটি খবর জেনে নিয়ে যখন লাইন ছেড়ে দিতে যাবে, সেই সময় হঠাৎ সমরেশের কিছু মনে পড়ে যায়। সে বলে, 'ভাল করে জয়তীকে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তো?'

তাপস বলে, 'অবশ্যই। আগেই তো তোমাকে বললাম।'

সমরেশ বলে, সামান্য ত্রুটির জন্যে কিন্তু নিশানাথবাবু মার্ডার হয়েছেন। ওঁর সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট আরো টাইট হওয়া উচিত ছিল।'

'আই নো, আই নো। সে জন্যে আমাদের আপসোসের শেষ নেই। কিন্তু জয়তীর বেলা তা হবে না। যে কেবিনে তাকে রাখা হয়েছে তার প্রতিটি দরজায় আর জানালায় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আর্মড গার্ড পাহারা দিচ্ছে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে একটা মাছিরও সেখানে গলবার উপায় নেই। আমার কী ধারণা জানো?'

'কী?'

'যারা নিশানাথবাবুকে মার্ডার করিয়েছে, জয়তীর ওপর অ্যাটেম্পটাও তাদেরই কাজ।'

'অফ কোর্স।'

এরপর আর দু-একটা কথা বলে সমরেশ ফোন নামিয়ে রাখে।

তার গলা পেয়ে খাটের পাশের ছোট টেবিলটার ওপর এক কাপ চা রেখে গিয়েছিল লক্ষ্মী। চা জুড়িয়ে কখন তার ওপর সর পড়ে গেছে, খেয়াল নেই।

ফোন নামিয়ে রাখার পর অনেকক্ষণ হাঁটুতে মুখ রেখে চুপচাপ বসে থাকে সমরেশ। তাপসের কাছে জয়তীর খবরটা পাওয়ার পর থেকেই বুকের ভেতর চাপা একটা কষ্ট টের পাচ্ছিল সে। এখন সেটা তীব্র হতে হতে সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেই যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রায় আশি ফিট নিচে কলকাতা মেট্রোপলিসের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। গাঁ গাঁ করে ছুটে যাচ্ছে দুধের গাড়ি, ট্রাক, প্রাইভেট কার, খবরের কাগজের ভ্যান, ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রচুর লোকজন্ এবং তাদের হইচই চিৎকার তো আছেই। কিন্তু কোনো দৃশ্যই যেন চোখে পড়ছে না সমরেশের, কোনো শব্দই সে শুনতে পাচ্ছে না।

কতটা সময় কেটে গেছে, কে জানে। হঠাৎ মায়ের ডাকে চমকে মুখ তোলে সমরেশ।

হিরণ্ময়ী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে গরদের থান, কাঁচাপাকা চুল পিঠময় ছড়ানো। বোঝাই যায়, এর ভেতর স্নান এবং পুজো হয়ে গেছে তাঁর। বলেন, 'কি রে, অমন চুপ করে বসে আছিস! চা জুড়িয়ে যে জল হয়ে গেল! কী হয়েছে?'

মাথা সামান্য হেলিয়ে চায়ের কাপটার দিকে তাকায় সমরেশ। উত্তর দেয় না।

হিরণ্ময়ী বলেন, 'পুজোর ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম, ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিস—'

সমরেশ বলে, 'তাপসের সঙ্গে।'

ছেলেকে তীক্ষ্ন চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবার লক্ষ্য করেন হিরণ্ময়ী। কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করেন। তারপর উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞেস করেন, 'কোনো খবর আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'তুমি ব্যালকনিতে গিয়ে কাগজ-টাগজ দেখতে থাকো। এখনও বাথ-রুমে যাই নি। মুখটুখ ধুয়ে তোমার কাছে আসছি। তখন শুনো।'

কিছুক্ষণ পর মায়ের কাছে চলে আসে সমরেশ। হিরণ্ময়ী পুজোর পোশাক পালটে সাদা ধবধবে থান পরে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন। হাতে আজকের মর্নিং এডিসানের 'দৈনিক মহাভারত' ধরা আছে ঠিকই কিন্তু সেটা তিনি পড়ছেন বলে মনে হয় না। তাঁর চোখে-মুখে গভীর উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তার ছাপ।

সমরেশ হিরণ্ময়ীর মুখোমুখি অন্য একটা চেয়ারে বসে পড়ে, তারপর জয়তী সম্পর্কে তাপসের কাছে যা শুনেছিল, সব তাঁকে জানায়।

শোনার পর আতঙ্কগ্রস্তের মতো হিরণ্ময়ী বলেন, 'বলিস কী রে! ঠিক শুনেছিস তো?'

আস্তে মাথা নাড়ে সমরেশ, 'হ্যাঁ, মা।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন হিরণ্ময়ী। তাপসের কাছ থেকে জয়তীর খবরটা পাওয়ার পর যে প্রশ্নটা বার বার সমরেশকে অস্থির করে তুলেছে, হিরণ্ময়ী একসময় সেটাই করেন, 'মেয়েটা বাঁচবে তো?'

সমরেশ বলে, 'হাসপাতালের ডাক্তাররা কোনো কথা দেয় নি।'

ভয় এবং আতঙ্ক ছাপিয়ে গভীর সহানুভূতিতে মন ভরে যায়

হিরণ্ময়ীর। জয়তীকে একদিন তিনি স্নেহ করতেন এবং এখনও, আট বছর পরেও যে সেটা অটুট, তা এখন স্পষ্ট করে অনুভব করতে থাকেন। বলেন, 'মেয়েটা যে কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল! শেষ পর্যন্ত প্রাণটা না চলে যায়।'

উত্তর না দিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সমরেশ।

এবার হিরণ্ময়ী বলেন, 'সমু আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবি? মেয়েটাকে একবার দেখে আসতাম।'

জয়তীর জন্য মায়ের এই ব্যাকুলতাটুকু ভাল লাগে সমরেশের। সে বলে, 'এখন ডাক্তাররা ওর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেবে না। যদি জ্ঞান ফেরে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।'

'ও কী অলক্ষুণে কথা! জ্ঞান নিশ্চয়ই ফিরবে, তুই দেখিস।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিষণ্ণ মুখে হিরন্ময়ী বলেন, 'বাপ নেই, মা নেই, ভাইটা নিখোঁজ। তার ওপর নিজের এই অবস্থা। মেয়েটা একেবারে শেষ হয়ে গেল! এমন দুর্ভাগ্য যেন কারো না হয়।'

আরো দিন চারেক কেটে যায়। এখনও জ্ঞান ফেরেনি জয়তীর। আদৌ ফিরবে কিনা, সে সম্পর্কে কোনোরকম গ্যারাণ্টি দিতে পারছেন না হাসপাতালের ডাক্তাররা। যেটুকু ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে জয়তীর বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম।

নিশানাথের খুন এবং জয়তীকে খুনের চেষ্টা, এই দুটো ব্যাপারে চারিদিক এখন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। চায়ের দোকান, রাস্তার আড্ডা, কফি হাউস, অফিসের ক্যানটীন—সব জায়গা এই নিয়ে সরগরম। রোজ খবরের কাগজগুলোতে নতুন নতুন স্টোরি বেরুচ্ছে। তবে ঘটনাগুলোর প্রতিবেদনে 'দৈনিক মহাভারত'-এর ধারে কাছে কেউ আসতে পারছে না। ক'দিনে এর সার্কুলেসন তিরিশ হাজার বেড়ে গেছে। কাগজের যা ডিমাণ্ড, সেই অনুযায়ী সাপ্লাই দেওয়া যাচ্ছে না। মর্নিং এডিসন ছাপতে ছাপতে এত দেরি হয়ে যাচ্ছে যে ঠিক সময়ে হকারদের হাতে পোঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কলকাতার রীডাররা আগে কাগজ পেতেন ছ'টার মধ্যে, এখন আটটার আগে কোনোদিনই ছাপা শেষ হয় না। তবু অসীম আগ্রহে 'দৈনিক মহাভারত'-এর জন্য তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন। যাই হোক, ম্যানেজমেণ্ট চাইছে এই বাড়তি সার্কুলেসনটা ধরে

রাখতে। সে জন্য এডিটর, নিউজ এডিটর, সার্কুলেসন ম্যানেজার থেকে শুরু করে 'দৈনিক মহাভারত'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পর্যন্ত সবাই সমরেশের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। আরো সেনসেসানাল, আরো এক্সক্লুসিভ খবর চাই। এর জন্য যত টাকা দরকার তাঁরা দেবেন। তা ছাড়া আসছে মাসে সমরেশকে বিরাট একটা প্রোমোসনও দেওয়া হবে, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একটা নতুন মডেলের মারুতি।

এদিকে সমরেশ যা যা খবর জোগাড় করছে বা করে যাচ্ছে, সেগুলো এক সঙ্গে একদিনেই লিখে ফেলছে না। অনেকটাই হাতে রেখে দমবন্ধ-করা ধারাবাহিক রহস্য-উপন্যাসের স্টাইলে কাগজে বার করে চলেছে। পাঠকের কৌতূহল এখন চূড়ান্ত জায়গায় পেঁছে গেছে।

কিন্তু জয়তীর জ্ঞান না ফিরলে, সে সুস্থ না হয়ে উঠলে আর বেশি-দূর এগুনো যাবে না। কেন সে নিশানাথকে খুন করেছে এবং জয়তীকেও শেষ করে দিতে চেয়েছে—এ সবই অজানা থেকে যাবে। যেভাবে হোক, যতদিন লাগুক, জয়তীকে বাঁচিয়ে তোলা দরকার।

এর মধ্যে রোজ দু বেলা নিজে হাসপাতালে গিয়ে জয়তীর খবর নিয়েছে সমরেশ। তা ছাড়া তিন চার বার করে ফোনও করেছে। সুচিত্রাও তার সঙ্গে প্রায়ই হাসপাতালে গেছে। সে-ও জয়তীর জন্য ভীষণ চিন্তা-গ্রস্ত। কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই জয়তীর। পুলিশ পাহারায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে সে।

ওধারে জয়তীর বাঁচা-মরার সঙ্গে তাপসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাকে সাসপেন্ড করা হয়নি ঠিকই, তবে ডি. সি তাকে ডেকে কড়াভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য জয়তীর ওপর টরচার করেনি—এটা তাকে প্রমাণ করতেই হবে। নইলে এর ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। খবরের কাগজে এই নিয়ে প্রচুর গোলমেলে খবর বেরিয়ে গেছে। ব্যাপারটা চেপে যাওয়া সম্ভব না। পুলিশ প্রশাসন তা চায়ও না। ডি.সি আরো জানিয়েছেন, দু'ভাবে তাপস নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারে। এক সেই মেয়েমানুষ দুটোর—যাদের নাম মায়া আর অঞ্জলি—কাছ থেকে কনফেসান বার করা, যে তারাই জয়তীকে ঐরকম মারাত্মকভাবে জখম করেছে। দুই, জয়তী সুস্থ হয়ে উঠলে তার কাছ থেকে জেনে নেওয়া—সত্যিই কারা তাকে ওভাবে মারধর করেছে।

নিয়ম অনুযায়ী মায়া আর অঞ্জলিকে কোর্টে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

উকিল জামিনের জন্য আর্জি করেছে কিন্তু পুলিশ অর্থাৎ তাপসের তরফ থেকে জোরালো যুক্তি খাড়া করে বোঝানো হয়েছে ওদের জামিন দিলে ইনভেস্টিগেসনের ক্ষতি হবে। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত কারণেই জামিন না-মঞ্জুর করেছেন এবং মেয়েমানুষ দুটিকে ফের পুলিশ হাজতে পাঠানো হয়েছে।

থানার অন্য কোনো কাজই এখন করছে না তাপস। ক'দিন ধরে মায়া অঞ্জলি আর জয়তীকে নিয়েই পড়ে আছে সে। অন্য যে সব ক্রিমিনাল রয়েছে তাদের কেসগুলো সামলাচ্ছে বিমল। মাঝে মাঝে অবশ্য তার পরামর্শ নিয়ে যাচ্ছে।

এখন খাওয়া ঘুম বিশ্রাম, কোনো কিছুর ঠিক নেই তাপসের। সারা রাত প্রায় জেগে জেগেই উদভ্রান্তের মতো কাটিয়ে দিচ্ছে সে। দিনের বেলা কম করে তিন চার বার মায়া আর অঞ্জলিকে থানারই একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দু'জনকে প্রচুর ভয় দেখিয়েছে সে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রশ্ন করে করে তাদের নার্ভ চুরমার করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু মেয়েমানুষ দুটো কঠিন ধাতুতে তৈরি, তাদের কাবু করা যায়নি। অনবরত তারা বলে গেছে, সেদিন তাপস জয়তীকে লক-আপ থেকে অন্য কামরায় কনফেসানের জন্য নিয়ে যাবার কয়েক মিনিট বাদে যখন ফিরে আসে তখনই তার নাকমুখ থেকে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। লক-আপে ঢুকেই জয়তী বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। তারা তাকে মারা তো দূরের কথা, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেনি।

মায়া আর অঞ্জলির নার্ভে চাপ দিতে চেয়েছিল তাপস কিন্তু ক'দিনে তার নিজেরই স্নায়ুমণ্ডলী বিধ্বস্ত হয়ে যাবার মুখে এসে পড়েছে।

মেয়েমানুষ দুটোকে জেরার পর রোজ অন্তত তিন চার বার করে থানার জিপে হাসপাতালে গেছে তাপস, ফোন যে কত বার করে করেছে তার হিসেব নেই।

হাসপাতালে রোজই একবার না একবার সমরেশের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আর দেখা হলেই সমরেশ জিজ্ঞেস করেছে, 'মায়া আর অঞ্জলির কাছ থেকে কিছু বার করতে পারলে?'

হতাশভাবে মাথা নেড়েছে তাপস, 'না।'

'তা হলে?'

'কী যে করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' ঐ মেয়ে দুটোর

মতো নার্ভের জোর লাইফে আমি আর কোনো ক্রিমিনালের দেখিনি। অনেক চোর গুন্ডা খুনী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তাদের কেউ দু'দিনের বেশি শিরদাঁড়া খাড়া রাখতে পারেনি। হড় হড় করে কনফেসান করে ফেলেছে। কিন্তু এরা আমার স্ট্রোক করে ছাড়বে। তা ছাড়া একটা মুশকিল কী হয়েছে জানো?'

'কী?'

'জয়তীর এই ব্যাপারটার পর পিটিয়ে যে কনফেসান আদায় করব, সে সাহসও হচ্ছে না। যদি মারধর করতে গিয়ে বেমক্কা বডির গোলমেলে জায়গায় লেগে যায় তা হলে কী হবে বুঝতেই পারছ। জয়তীর ব্যাপারটা তো রয়েছেই, তার ওপর এই মেয়েমানুষ দুটোর কেউ জখম টখম হয়ে গেলে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'হুঁ—' চিন্তিতভাবে মাথা নেড়েছে সমরেশ।

তাপস বলেছে, 'এদিকে ডি.সি দু বেলা আমাকে ফোন করছেন, নইলে ডেকে পাঠাচ্ছেন। তাঁর একটাই কথা, জয়তীর ব্যাপারটা কী হল? বুঝতে পারছি উনিও হেল্পলেস। আরো ওপর থেকে তাঁকে প্রেসার দেওয়া হচ্ছে। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। আমার কেরিয়ারে এমন ক্রাইসিসে আর কখনও পড়ি নি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর তাপস বলেছে, 'আমাকে একমাত্র বাঁচাতে পারে জয়তী। কিন্তু চার দিনেও তার জ্ঞান ফিরল না।'

এই হাসপাতালের ডাক্তার অমিতাভ ব্যানার্জি এবং তাঁর জুনিয়াররা জয়তীর দায়িত্ব নিয়েছে। রোজই ডাক্তার ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করে তাপস একই প্রশ্ন করে যায়—জয়তীর প্রাণের আশা আছে কিনা। তিনি রোজই এক উত্তর দিয়ে যান, ডাক্তারদের কোনো কারণেই হতাশ হতে নেই। জয়তীর হৃৎপিণ্ড যখন এখনও একটু ধুকধুক করছে তখন শেষটা না দেখে ছাড়বেন না।

রোজ একই প্রশ্নের একই উত্তরে সমরেশরা আদৌ ভরসা পায় বলে মনে হয় না।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পাঁচ দিন বাদে সবাই যখন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, সেই সময় হঠাৎ যেন অলৌকিক ভাবেই জ্ঞান ফিরে

আসে জয়ন্তীর।

অন্য সব দিনের মতো বেলার দিকে খোঁজ নিতে হাসপাতালে গিয়েছিল সমরেশ আর সুচিত্রা। ডাক্তার ব্যানার্জির সঙ্গে দোতলার করিডরে দেখা হয়ে যায়। আগে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। ক'দিন এখানে যাতায়াত করতে করতে আলাপ হয়ে গেছে। তাঁর পেশেণ্ট অর্থাৎ জয়তী সম্পর্কে সমরেশ আর সুচিত্রা যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, তারা যে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় আছে, তা জেনে গেছেন তিনি। তাঁর কেন যেন ধারণা হয়েছে জয়তী সমরেশদের আত্মীয় টাত্মীয় হবে। বিশেষ করে সমরেশের।

ডাক্তার ব্যানার্জি নিজের থেকে কয়েক পা এগিয়ে আসেন। বলেন, 'আপনাদের একটা সুখবর দিচ্ছি।' বলতে বলতে তাঁর চোখমুখে স্নিগ্ধ একটু হাসি ফুটে বেরোয়। এতদিন তাঁকে দেখে মনে হত চিন্তাক্লিষ্ট, গম্ভীর। টেনসানে সর্বক্ষণ কপালে ভাঁজ পড়ে থাকত। এখন তাঁকে ভারমুক্ত মনে হচ্ছে।

'কী খবর ডক্টর ব্যানার্জি?' আশায় এবং উত্তেজনায় গলার স্বর কেঁপে যায় সমরেশের।

'জয়তী সান্যালের জ্ঞান ফিরে এসেছে।'

ডাক্তার ব্যানার্জির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমরেশের হৃৎপিণ্ড পলকের জন্য থমকে গিয়ে পরক্ষণে এত জোরে লাফাতে থাকে, মনে হয়, তার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। আটাশ বছরের জীবনে এত আনন্দ এত উত্তেজনা আর কখনও কোনো কারণে হয়েছে কিনা সমরেশের মনে নেই। প্রবল আবেগ দুরন্ত স্রোতের মতো তার শিরার ভেতর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে। ডাক্তার ব্যানার্জির হাত আঁকড়ে ধরে সে বলে, 'সত্যিই সুখবর। আপনি ওর প্রাণ দিলেন।'

সুচিত্রাও খুশি হয়েছে। সে চাপা ইণ্ট্রোভার্ট ধরনের মানুষ। তার আবেগের প্রকাশ খুবই মাপা আর সংযত। একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সমরেশের প্রতিক্রিয়া দেখতে থাকে সে।

সমরেশ বলে, 'আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে ডক্টর ব্যানার্জি।'

তার মনোভাব আঁচ করে নিয়ে ডাক্তার ব্যানার্জি বলেন, 'জয়তী স্যান্যালের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে, এই তো?'

ডাক্তার ব্যানার্জি কি একজন পাক্কা থট রিডার? একটু অবাক হয়ে থাকে সমরেশ। তারপর হেসে ফেলে, 'রাইট স্যার। দয়া করে ব্যবস্থা

করে দিন।'

ডাক্তার ব্যানার্জি রাজী হন না। বলেন, 'ইমপসিবল।'

সমরেশও নাছোড়বান্দার মতো বলে যায়, 'না বলবেন না প্লীজ—'

'এখন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পাঁচদিন পর সেন্স ফিরেছে। এখন পুরো চব্বিশ ঘণ্টা আমরা ওকে ওয়াচ করব। তারপর আপনার রিকোয়েস্ট সম্পর্কে ভাবা যাবে। কাল এই সময় একবার আসুন। পেশেণ্টের কণ্ডিসান ভাল থাকলে দেখা হয়ে যাবে।'

পরিষ্কার করে বলা সত্ত্বেও সমরেশ প্রায় কাকুতি মিনতি করতে থাকে। মৃত্যুভয়মুক্ত জয়তীকে দেখার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করছিল সে। তাছাড়া একজন প্রফেসানাল জার্নালিস্ট হিসেবে তার পক্ষে এই দেখা হওয়াটা খুবই জরুরি। কেননা 'দৈনিক মহাভারত' প্রতিদিনই জয়তীর কেসের ব্যাপারে কিছু না কিছু সেনসেসান চাইছে।

অনুরোধ, হাতজোড় করা, কোনো কিছুতেই কাজ হয় না। ডাক্তার তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থেকে যান।

অগত্যা চব্বিশটি ঘণ্টা অর্থাৎ পুরো একটি দিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সমরেশ বলে, 'ঠিক আছে, কালই তাহলে আসব।' বলে সুচিত্রাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

রাস্তায় এসে সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'তোর এখন কি কোনো কাজ আছে?'

সুচিত্রা বলে, 'আজ কোর্টে যাব না। তবে বাড়ি ফিরে একটা কেস হিস্ট্রি দেখতে হবে। কাল কেসটার ডেট পড়েছে।'

'ঠিক আছে, তুই তা হলে চলে যা।'

'তুই কী করবি?'

'আপাতত ফোনে তাপসকে জয়তীর খবরটা দেওয়া দরকার। পাঁচ রাত ও ঘুমোয়নি।'

'তুই কি তোদের ফ্ল্যাটে ফিরে ফোন করবি?'

'কেন বল তো?'

'তাহলে একটা ট্যাক্সি ধরে তোকে নামিয়ে দিয়ে যেতাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ মেম সাহেব। তুই একাই চলে যা। পাশের রাস্তায় আমার এক কলীগ থাকে। আমি তার বাড়ি থেকে ফোন করব।'

'ঠিক আছে।'

খানিক দূরে মোড়ের মাথায় একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। সুচিত্রা সেদিকে চলে যাচ্ছিল, সমরেশ পেছন থেকে ডাকে, 'এই শোন—'

সুচিত্রা ঘুরে দাঁড়ায়, 'কী বলছিস ?'

'কাল কিন্তু তোকে আমার সঙ্গে হাসপাতালে আসতে হবে। মনে হচ্ছে, এবার 'বেইল' নিতে আপত্তি করবে না জয়তী।'

'মনে হয়।'

সুচিত্রা আর দাঁড়ায় না। সে যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে এই রাস্তারই অন্য মোড় ঘুরে কয়েক পা গেলেই একটা গলি। সেখানে 'দৈনিক মহাভারত'-এর পলিটিক্যাল করেসপনডেণ্ট শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য-দের বাড়ি। সমরেশ সোজা সেখানে চলে আসে।

শ্যামলেন্দুদের বাড়িটা পুরানো আমলের দোতলা। সে বাড়িতেই ছিল। কলিং বেল টিপতেই নিজে এসে দরজা খুলে দেয়। বলে, 'আরে ব্রাদার, তুমি!'

কী উদ্দেশ্যে এসেছে, সেটা জানিয়ে দেয় সমরেশ।

শ্যামলেন্দু বলে, 'এসো এসো—' সমরেশকে সঙ্গে করে দোতলায় ড্রইং রুমে নিয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে, 'যূথি—যূথি, কে এসেছে দেখবে এসো—'

ডান দিকের কোনো একটা ঘর থেকে যূথি অর্থাৎ যূথিকার গলা ভেসে আসে 'যাই—'

শ্যামলেন্দুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। লম্বাটে পাতলা চেহারা। প্রথম দেখলে যে কোনো লোকের মনে হবে, এমন সরল মানুষ হয় না। অন্তত একজন পলিটিকাল করেসপনডেণ্ট হিসেবে তাকে ভাবতে অসুবিধে হয়। কিন্তু নিউজ পেপার ওয়ার্ল্ড জানে শ্যামলেন্দুর মতো তুখোড় জার্নালিস্ট খুব কমই পাওয়া যাবে! অবশ্য তার স্বভাবটি ছেলেমানুষের মতো। দারুণ আমুদে আর ফূর্তিবাজ মানুষ।

একটু পরেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় যূথিকা। চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের মতো বয়স। ভারি সুশ্রী দেখতে। লম্বাটে ডিম্বাকৃতি মুখ, ভাসা ভাসা চোখ, পাতলা ঠোঁট, সুগোল গলা, মেদশূন্য টান টান শরীর, সুগঠিত সাজানো দাঁতের সারি, ভাঁজহীন মসৃণ ত্বক এবং সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে সারাক্ষণ স্নিগ্ধ একটি হাসি—সব মিলিয়ে তার বয়সটাকে যেন অনেক কমিয়ে দিয়েছে। দেখা মাত্র তাকে খুবই ভাল

লেগে যায়।

স্বামীর মতো যূথিকার মধ্যে একটা আপন-করা ব্যাপার আছে। প্রথম আলাপেই সে মানুষকে কাছে টেনে নিতে পারে।

মুখের চিরস্থায়ী হাসিটিকে আরেকটু ছড়িয়ে দিতে দিতে যূথিকা বলে, 'কী আশ্চর্য, তুমি! সেই এসেছিলে মাস ছয়েক আগে। এতদিন বাদে এদিকের রাস্তা মনে পড়ল!' সমরেশকে সে তুমি করেই বলে।

প্রথম আলাপের দিনই সমরেশের মনে হয়েছিল সত্যিকারের স্নেহ-প্রবণ একটি বৌদি পেয়ে গেল। যূথিকা আপনি টাপনি করে বললে তার ভাল লাগবে না। নিজের থেকেই সে তাকে তুমি করে বলতে বলেছে। আসলে যূথিকার সুন্দর ব্যবহার, স্নেহ এবং আদরযত্নের কাছে প্রথম দিনই নিজেকে সঁপে দিয়েছিল সে।

সমরেশ ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'না মানে, নানারকম ঝঞ্ঝাট—'

'আমাকে ঝঞ্ঝাট দেখিও না। ক্রাইম রিপোর্ট করে তোমার দারুণ নাম হয়েছে তো, তাই ল্যাজ মোটা হয়ে গেছে। এখন আর বৌদিকে মনে থাকবে কেন?'

বিব্রতভাবে কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল সমরেশ, তার আগেই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে শ্যামলেন্দু বলে ওঠে, 'আরে ভাই ইতনা রোজ বাদ মশহুর পত্রকার ঘরমে আয়া, ফির তুম খালি হাতোসে চলী আয়ী। চায় লাও, মিঠাই লাও, ভুজিয়া লাও, চপ লাও, কাটলেট লাও—' জীবনের প্রথম আঠারটা বছর এলাহাবাদে কাটিয়েছে সে। তাই মাঝে মাঝে তার মুখ দিয়ে হিন্দিটা বেরিয়ে আসে। অনেক সময় স্রেফ মজা করার জন্যও সে এই ভাষাটা কাজে লাগিয়ে থাকে।

সঙ্গগুণে এবং স্বামীর সঙ্গে তাল দেবার জন্য যূথিকাও হিন্দি বলে থাকে। সে শ্যামলেন্দুর দিকে তাকায়, 'আরে ভাই, লাতী হ্যায়। ফিকর মাত করো।' সমরেশকে বলে, 'দশ মিনিটের ভেতর আসছি। দেখব, তুমি কত বড় মশহুর পত্রকার হয়েছ!' বলেই ওধারের প্যাসেজ ধরে চলে যায়।

সমরেশ জানে, যূথিকা যা বলে গেল সেটা শুধুই মজা করার জন্য। তবু ভয়ের একটা ভঙ্গি করে শ্যামলেন্দুকে বলে, 'শ্যামলদা, বৌদির হাত থেকে তোমাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে।'

শ্যামলেন্দুর ঘাড় থেকে হিন্দিটা এখনও নামেনি। সে বলে, 'আরে ভাই, মুঝে কোন বাঁচায়েগা ঠিক নেহী, তুমকো বাঁচানেকো গিরান্টি মঁয় দেঁ, নেহী সাকতা।'

দুই হাতের তালু উলটে দিয়ে হাল ছেড়ে দেবার মতো একটা ভঙ্গি করে সমরেশ। বলে, 'আই অ্যাম ফিনিশড।'

দু'জনে প্রাণ খুলে হাসতে থাকে। ওদের হাসাহাসির ভেতর যূথিকা বিশাল এক ট্রে-তে প্রচুর নোনতা খাবার, কেক. প্যাস্ট্রি, রাজভোগ, ল্যাংচা এবং চা নিয়ে আসে। সেণ্টার টেবিলে সাজিয়ে দিতে দিতে বলে, 'সবটা খেতে হবে। কিচ্ছু ফেলে রাখা চলবে না।'

এবার সত্যিসত্যিই আঁতকে ওঠে সমরেশ, 'বৌদি, যা দিয়েছেন তা আমার এক উইকের রেশন। আমার স্টমাকটা ভীষণ ছোট, পুরো এক গো-ডাউনের মাল ওখানে কি ধরে?' একটা ফাঁকা প্লেটে দুটো সিঙাড়া আর একটা কেক তুলে নেয় সে।

যূথিকা বলে, 'ওটি হবে না। যা দিয়েছি লাইক আ গুড বয় সব খেতে হবে।'

ঢোঁক গিলে সমরেশ বলে, 'বৌদি--বৌদি, এটা কিন্তু আমার পক্ষে ভীষণ পানিশমেণ্ট।'

'পানিশমেণ্টই তো দিতে চাইছি।' যূথিকা বলতে থাকে, 'ছ' মাস পর এলে এরকম শাস্তি পেতে হবে।'

শ্যামলেন্দু হেসে হেসে বলে, 'এখন বোঝো ঠেলা।'

সমরেশ একবার শ্যামলেন্দুকে দেখে নেয়। তারপর যূথিকার দিকে ফিরে বলে, 'ও, কে ম্যাডাম এবার থেকে উইকে একবার করে এসে হাজিরা দিয়ে যাব।'

'ওয়ার্ড অফ অনার?'

'ওয়ার্ড অফ অনার।'

'লক্ষ্মী ছেলে। তা হলে যা পার খাও। নো প্রেসার, নো জবরদস্তি—'

সমরেশ একটা সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে বলে, 'আমার এই বৌদিটির তুলনা নেই।'

যূথিকা বলে, 'নো ফ্ল্যাটারি, আসল কথাটি বল তো ভাই। কিচ্ছু লুকোবে না—'

'কী' ? উৎসুক চোখে তাকায় সমরেশ।

খুব আন্তরিক গলায় এবার যূথিকা বলে, 'তার আগে বলি, নিশানাথ সামন্তর কেসটা নিয়ে তুমি একেবারে সেনসেসান ফেলে দিয়েছ। মনে হচ্ছে আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাস পড়ছি। এত ভাল ক্রাইম রিপোর্ট আগে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ বৌদি।'

এবার গলার স্বরটা নামিয়ে দেয় যূথিকা, বলে, 'নিশানাথবাবুকে খুন করা হল। ওই মেয়েটা, মানে জয়তীর ওপর মার্ডারের অ্যাটেম্পট হয়েছে। কেমন আছে মেয়েটা—জানো ?' তার গলার স্বরে খানিক আগে হালকা মজা টজা মাখানো ছিল। এখন সেটা একেবারেই পালটে গেছে।

সমরেশ বলে, 'চারদিন পর আজ জ্ঞান ফিরেছে।' সে আরো জানায় হাসপাতালে সকালে তাকে দেখে যূথিকাদের বাড়ি এসেছে। বলতে বলতেই হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে সমরেশ, 'বৌদি যে জন্যে বিশেষ করে আপনাদের বাড়ি এসেছি, সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম। আমি একটা ফোন করব—'

যূথিকা এবং শ্যামলেন্দু একসঙ্গে বলে ওঠে, 'অবশ্যই—'

ড্রইংরুমের এক কোণে উঁচু সরু টুলের ওপর মেরুন রং-এর টেলিফোনটা রাখা আছে। প্রায় দৌড়েই সেখানে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে থাকে সমরেশ এবং একবারের চেষ্টাতেই তাপসকে পেয়ে যায়। বলে 'একটা দারুণ খবর আছে।'

তাপস জানতে চায়, 'কী ?'

'জয়তীর সেন্স ফিরেছে।'

'রীয়ালি !' টেলিফোনের ভেতর দিয়ে তাপসের চিৎকার ভেসে আসে। তার গলা ভীষণ কাঁপছিল।

সমরেশ বলে, 'তোমার যা মানসিক অবস্থা তাতে মিথ্যে খবর দিতে পারি ?'

'তুমি কি হাসপাতাল থেকে ফোন করছ ?'

'না। খানিক আগে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ওখানে জয়তীর খবরটা পেলাম। কাছেই আমার এক কলীগের বাড়ি। সেখান থেকে ফোন করছি।'

'লাইফে এর চেয়ে ভাল খবর আর কখনও পাইনি। থ্যাঙ্ক ইউ,

থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আমি এখনই হাসপাতালে যাচ্ছি।'

'না না, আজ যেও না। জয়তী ইজ ভেরি উইক। ডাক্তার তার সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। কাল যেও।'

'আচ্ছা।'

ফোন নামিয়ে রেখে শ্যামলেন্দু এবং যূথিকার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে একসময় উঠে পড়ে সমরেশ।

বার

জয়তীর জ্ঞান ফেরার পর কয়েকটা দিন কেটে গেছে। এখন সে অনেকটাই সুস্থ।

জ্ঞান ফেরার পরদিনই জয়তীর স্বীকারোক্তি টেপ করে নিয়ে গিয়েছিল তাপস। জয়তী জানিয়েছে তাপস নয়, তাকে মারাত্মকভাবে জখম করেছিল মায়া আর অঞ্জলি। খুন করারই উদ্দেশ্য ছিল, নেহাত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। এই টেপ বাজিয়ে তাপস ডি. সি'কে শুনিয়েছে, আর শুনিয়েছে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে। শোনার পর দুটো ব্যাপার ঘটেছে। তাপস সবরকম সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে আর ম্যাজিস্ট্রেট মেয়েমানুষ দুটোকে জামিন দেননি, জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের কারণে আরো কয়েকদিন হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কেন তারা জয়তীকে খুন করার চেষ্টা করেছিল, কারা তাদের এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছিল, এই সব প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

এই মেয়েমানুষ দু'টি দাগী প্রফেসানাল অপরাধী। তাদের মুখ থেকে কিছু বার করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তবে জয়তী বেঁচে যাওয়ায় তাদের মনের জোর কমে যেতে শুরু করেছে। রোজ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্নান খাওয়া আর ঘুমের সময়টুকু ছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করে শুধু এটুকুই জানা গেছে, একটা অচেনা লোক প্রচুর টাকা দিয়ে তাদের জয়তীকে খুন করতে বলে। লোকটা কে, কী তাদের আইডেনটিটি, তাদের খুন করানোর মোটিভই বা কী, এ সব তারা জানে না। টাকার লোভে এমন মারাত্মক দুষ্কর্ম করে তারা অনুতপ্ত, যে শাস্তি তাদের দেওয়া হোক, তারা মাথা পেতে নেবে, ইত্যাদি।

তাপসের মনে হয়েছে, মেয়ে দুটো হয়ত মিথ্যে বলেনি, তবে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। স্বীকারোক্তির জন্য সে ঠিক করেছে, চেষ্টা চালিয়েই যাবে।

এদিকে জ্ঞান ফেরার পরদিন থেকে হাসপাতালে রোজ তিন চার বার করে জয়তীকে দেখতে গেছে সমরেশ। অত বার না পারলেও অন্তত একবার করে তার সঙ্গে সুচিত্রাও গেছে।

তাপসের কাছে জবানবন্দি দেওয়া ছাড়া প্রথম দশ বারো দিন ডাক্তার দু-একটার বেশি কথা বলতে দেন নি। সে এমনই দুর্বল আর নির্জীব হয়ে পড়েছে যে সামান্য 'হুঁ' 'হাঁ' করতেও ভীষণ কষ্ট হ'ত, চোখের পাতা আপনা থেকেই বুজে আসত। কাজেই আজ কেমন আছ? বা 'শরীর সুস্থ লাগছে তো?' ইত্যাদি দু-একটা প্রশ্ন করেই সমরেশকে ফিরে যেতে হয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তির আট দিনের মাথায় জয়তী বিছানায় উঠে বসে। সমরেশ যথারীতি সকালের দিকে এসেছিল এবং প্রতিদিনের সেই প্রশ্নটাই আরেক বার করে, 'আজ কেমন লাগছে?'

দুর্বলতা পুরোপুরি কাটেনি। খুব আস্তে আস্তে জয়তী বলেছে, 'আগের থেকে অনেক ভাল।'

সেদিন মনে মনে সমরেশ ঠিক করে এসেছিল, সেই কথাটা জেনে নেবে। ভয়ঙ্কর রকমের জখম হয়ে হাসপাতালে আসার আগের রাত্তিরে নিশানাথের খুনের ব্যাপারে জয়তী গোপন এবং মারাত্মক কিছু খবর দিতে চেয়েছিল কিন্তু মায়া আর অঞ্জলি কাছাকাছি থাকায় শেষ পর্যন্ত মুখ খোলেনি। সমরেশের ধারণা, জয়তীর এই খবরটা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসা মেয়েটাকে শুরুতেই সে ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়নি। হয়ত তাতে ক্ষতিকর কোনো প্রতিক্রিয়া হবে। সে ভেবে রেখেছিল, পরে সুযোগ তৈরি করে নিয়ে ধীরে ধীরে খুব সতর্কভাবে সেই প্রসঙ্গে চলে আসবে।

জয়তী বলেছে, 'একটা বাজে মেয়ের জন্যে তোমার খুব কষ্ট হল।'

'মানে!' সমরেশ চমকে উঠেছে।

'রোজ তিন চার বার করে আমার খোঁজ নিতে আসছ। আমি কিন্তু এতটা সহানুভূতির যোগ্য নই।' বলতে বলতে জয়তীর মুখে বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটে উঠেছে।

সমরেশ বলেছে, 'এ সব কথা থাক।'

জয়তী উত্তর দেয়নি।

সমরেশ বলেছে, 'জানো, মা'র খুব ইচ্ছে তোমাকে দেখতে আসে।'

'মাসিমা!' হঠাৎ ভীষণ দিশেহারা হয়ে পড়েছে জয়তী।

'অনেক বার আমাকে বলেছে। তুমি অসুস্থ বলে আনিনি। এবার একদিন নিয়ে আসব।'

'না, না—' জোরে জোরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাথা নেড়েছে জয়তী।

'কেন?'

'মাসিমা যে জয়তীকে চিনতেন সে কবেই মরে গেছে। এখন আর কী দেখতে আসবেন! আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, উনি কি জানেন?'

'সব জানেন। আর জেনেই তো আসতে চাইছেন। তুমি না বলো না।'

জয়তী চুপ করে ছিল!

আরো দিন দুই বাদে এলোমেলো নানা কথার ফাঁকে খুব নরম গলায় সমরেশ বলে, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।'

সুচিত্রাও সঙ্গে এসেছিল। পলকহীন সে জয়তীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

অন্যমনস্কর মতো জয়তী কেবিনের জানালার বাইরে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, জবাব দেয় না।

সমরেশ তার দিকে ঝুঁকে ফের বলে, 'হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগের দিন রাত্তিরে নিশানাথবাবুর খুনের ব্যাপারে তুমি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলে। সেটা কিন্তু জানা হয়নি।'

তক্ষুণি উত্তর দেয় না জয়তী। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'তার আগে তোমার আরো কিছু জানা দরকার।'

'কী?'

'সমশেরগঞ্জ থেকে তোমরা চলে যাবার পর আমরা কোথায় গিয়ে ঠেকেছিলাম সেটা না জানলে এখনকার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না।'

সমরেশ গভীর আগ্রহে বলে, 'আমি সব শুনব। বল—'

জয়তী ফের জানালার বাইরে তাকিয়ে একটানা যা বলা যায় তা এইরকম। বাবা জেলে যাবার পর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হয় তাকে। তখন সে হায়ার সেকেণ্ডারি পড়ছিল। স্কুল না যাবার কারণ

পড়ার খরচ চালাবার মতো আর কেউ ছিল না। তাছাড়া স্কুলে গেলে সবাই অদ্ভুত চোখে তাকাত, কেউ কেউ টিটকিরি দিত। এ সব সহ্য করার মতো মনের জোর তার ছিল না। যার বাবা চুরির দায়ে জেলে গেছে, পৃথিবীতে তার দাঁড়াবার জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে।

একদিন মহেশ্বর জেলে আত্মহত্যা করে বসল। তারপর সমশেরগঞ্জ ছেড়ে জয়তীরা প্রথমে যায় জলপাইগুড়িতে এক আত্মীয়র বাড়ি। সেখানে দু' মাসের বেশি থাকা যায়নি। জলপাইগুড়ি থেকে মালদা, মালদা থেকে রায়গঞ্জ, ডায়মণ্ডহারবার, চন্দননগর, রানাঘাট হয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায়। বেঁচে থাকার জন্য পশ্চিম বাংলায় যেখানে তাদের যত আত্মীয়স্বজন রয়েছে সব জায়গায় গেছে। কিন্তু দু-একমাসের বেশি কেউ তাদের থাকতে দেয়নি। যাদের পয়সার জোর ছিল তাদের মন অত্যন্ত ছোট। আর যাদের মন বড়, তাদের দুঃখে যারা সহানুভূতি-শীল, তাদের তিনটি বাড়তি মানুষের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা নেই।

এইভাবে নানা জায়গায় ভেসে বেড়াতে বেড়াতে তিনটে বছর কেটে গেল। এর মধ্যে একদিন মায়ের মৃত্যু হল। বাকি রইল সে আর ছোট ভাইটা।

কলকাতায় দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে শেষ আশ্রয়টা খোয়াবার 'পর কোথায় যাবে, কিভাবে নিজে এবং ছোট ভাইটাকে বাঁচাবে যখন ঠিক করে উঠতে পারছে না তখন নিশানাথ সামন্তর অনাথ আশ্রমের সাইন-বোর্ডটা জয়তীর চোখে পড়ে। তক্ষুণি ভেতরে ঢুকে নিশানাথের সঙ্গে দেখা করে। তাঁর সহৃদয় দয়ালু ব্যবহার এবং চমৎকার কথাবার্তায় অভিভূত হয়ে যায় সে। নিজেদের সব কথা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে নিশানাথ ছোট ভাই অর্থাৎ বিশুকে তাঁর অরফ্যানেজে নিয়ে নেন।

তারপর নিজের জন্য একক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় জয়তীর। কখনও পয়সাওলা অবাঙালীর বাড়িতে সে আয়ার কাজ করেছে, কখনও সকাল থেকে অনেকটা রাত পর্যন্ত নিচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছে, কখনও মহিলাদের নানা অর্গানাইজেসনে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছে। ফাঁকে ফাকে প্রাইভেটে নিজের লেখাপড়া আর চাকরির চেষ্টাও চালিয়ে গেছে। এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও হায়ার সেকেণ্ডারি এবং বি. এ'টা কোনো-রকমে পাশ করেছিল। কিন্তু চাকরি হয়নি। থাকত ওয়ার্কিং গার্লদের একটা হোস্টেলে। জয়তীর ইচ্ছা ছিল চাকরি বাকরি হয়ে গেলে ঘর

ভাড়া করে বিশুকে অনাথ আশ্রম থেকে নিয়ে আসবে।

এত ধরনের উঞ্ছবৃত্তি তাকে করতে হয়েছে যে রোজ অরফ্যানেজে গিয়ে বিশুকে দেখে আসা সম্ভব হ'ত না। একমাস দু'মাস পর পর দেখতে যেত।

বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থেকে এবং চার বেলা সময়মত খেয়ে স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়ে গিয়েছিল বিশুর। আশ্রমে পড়ানোর ব্যবস্থাও ছিল, সেই সঙ্গে হাতের কাজও কিছু কিছু করতে হ'ত।

এইভাবে আরো আড়াই তিন বছর কেটে যায় কিন্তু সম্মানজনক স্থায়ী কোনো রোজগারের ব্যবস্থাই করতে পারে নি জয়তী। ক্রমশ ভাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকার ব্যাপারে সে হতাশ হয়ে পড়ে।

এই সময় একদিন অনাথ আশ্রমে যেতে নিশানাথ জয়তীকে বলেন, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে মা।'

জয়তী উৎসুক মুখে তাকিয়েছে, 'কী কথা ?'

'আমাদের আশ্রম খুব বড় নয়, এদিকে অনাথ ছেলেদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তুমি হয়ত শুনেছ, আমাদের এখান থেকে ফি বছর বহু ছেলেকে অনেকে অ্যাডপ্ট করে। শুধু দেশের লোকেরাই নয়, ফরেনাররাও এসে নিয়ে যায়। যাদের যাদের পোষ্য হিসেবে দিয়েছি তারা বেশ ভাল আছে, লেখাপড়া শিখে বড় বড় চাকরি বাকরি করছে। দে আর ওয়েল প্লেসড ইন লাইফ।

নিশানাথ কী বলতে চান, খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিল জয়তী। সে পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়েই থেকেছে।

নিশানাথ বলে যাচ্ছিলেন, 'এ-বছরও নেক্সট মানথে অনেকে অ্যাডপ্ট করার জন্য এখানে আসবেন। ভুল বুঝো না মা, তোমার তো এখনও চাকরি-বাকরি হল না। বলছিলাম কি, কেউ যদি বিশুকে অ্যাডপ্ট করতে চায়—মানে এ ব্যাপারে তোমার কী মত ?'

নিশানাথকে খুবই শ্রদ্ধা করত জয়তী। বিশ্বাস, নির্ভরতা, ভক্তি ইত্যাদি মিশিয়ে নিজের মনে এই মানুষটির এক উজ্জ্বল, পবিত্র ইমেজ তৈরি করে নিয়েছিল সে। তাঁর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থাটা চোখের সামনে কোনো অদৃশ্য টিভি স্ক্রিনে যেন ফুটে উঠেছে। তার চাকরি নেই, এটা সেটা করে কোনোরকমে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, থাকে ওয়ার্কিং গার্লদের হোস্টেলে আরো তিনজন বোর্ডারের সঙ্গে একফালি

একখানা ঘরে। নিশানাথ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁর অরফ্যানেজে বিশুকে বেশিদিন রাখা সম্ভব না, কেননা আরো অনেক নিরাশ্রয় ছেলে রয়েছে। পুরনো ছেলেদের ব্যবস্থা না হলে নতুনদের জন্য কিছু করা যাবে না। এদিকে নিজের যা হাল তাতে বিশুকে নিয়ে কোথায় তুলবে জয়তী? নিরুপায় হয়ে সে বলেছে, 'আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। তবে—'

'কী?'

'বিশু বিদেশে যাক, এটা আমি চাই না। এই কলকাতাতেই যদি তার ব্যবস্থা করে দেন আমার আপত্তি নেই।'

'ঠিক আছে।'

'মাঝে মাঝে গিয়ে তাকে দেখতে পাব তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'দেখবেন ওর ক্ষতি যেন না হয়। আমরা দুই ভা বড় কষ্ট করেছি।'

'নিশানাথ জয়তীর মাথায় হাত রেখে বলেছেন, 'তুমি আমার ওপর ভরসা রাখতে পার।'

'আপনি ছাড়া বিশ্বাস বা ভরসা করার মতো আমার আর কেউ নেই।'

'আসছে মাসের মাঝামাঝি একবার এসো। এর ভেতর সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

পরের মাসে জয়তীর পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না। কেননা ওই সময় যে মহিলা অর্গানাইজেসানের সঙ্গে সে কাজ ক ছিল তারা তাদের হ্যাণ্ডিক্রাফটের একজিবিশন করতে যাচ্ছে আমেদাবাদে। তাকেও ওদের সঙ্গে যেতে হবে।

জয়তী বলেছে, 'আমি তো থাকতে পারছি না। যা করার আপনিই করবেন।'

শুধু আমেদাবাদেই না, বম্বে, ইন্দোর, ভোপাল, নাগপুরেও তাদের একজিবিশন হয়েছিল। তিন মাস বাদে কলকাতায় ফিরেই জয়তী চলে যায় অনাথ আশ্রমে। নিশানাথবাবু তাকে দেখে বেশ ঘাবড়েই যান। জানান, মোট আটটি ছেলেকে দত্তক দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে বিশুও রয়েছে। তাকে অ্যাডপ্ট করেছে কলকাতারই এক অবাঙালি বিজনেসম্যান।

নিশানাথের বিচলিত ভাবটা লক্ষ্য করেছিল জয়তী। সে অবাক

হয়েছিল ঠিকই, সেই সঙ্গে কিছুটা দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল। সে বলেছে, 'ওদের ঠিকানা দিন। অনেকদিন বিশুকে দেখি না। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।'

নিশানাথ বলেছিলেন, 'ওরা কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে বেড়াতে গেছে। ফিরে এলে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'

এরপর প্রতি মাসে দু-তিনবার করে জয়তী অনাথ আশ্রমে আসতে থাকে। নিশানাথ একটা না একটা অজুহাত খাড়া করে তাকে ফিরিয়ে দেন। বিশুর ঠিকানা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত এমন হল, নিশানাথ আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন না। সমস্ত ব্যাপারটা এমনই সন্দেহজনক যে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে জয়তী। নিশানাথ সম্পর্কে তার যাবতীয় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং নির্ভরতা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। তার মনে হতে থাকে, নিশানাথ মহত্ত্বের একটা মুখোশ এঁটে রেখেছেন। আসলে ভেতরে ভেতরে লোকটা জঘন্য ক্রিমিনাল। বিশুকে তিনি নিশ্চয়ই বিক্রি করে দিয়েছেন।

অনাথ আশ্রমের অন্য লোকজনকে জিজ্ঞেস করেও বিশু সম্পর্কে কোনো সদুত্তর পায়নি জয়তী। তার ধারণা হয়েছিল, নিশানাথ এভাবেই এদের শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছেন।

সমশেরগঞ্জ থেকে চলে আসার পর যে রাস্তায় জয়তীকে হাঁটতে হয়েছে সেগুলো খারাপ লোকে বোঝাই। ভাল, সৎ, হৃদয়বান মানুষ এই পৃথিবীতে আর ক'টা? তাদেরই একজনের কাছ থেকে একটা রিভলবার জোগাড় করে সে নিশানাথকে খুন করতে গিয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে বেহুঁশ হয়ে যখন তিনি পড়ে আছেন, ভাড়াটে মার্ডারার পাঠিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। তখন থেকে নিশানাথ সম্পর্কে তাঁর ধারণা বদলাতে থাকে। তারপর সেই মেয়েমানুষ দুটো হাজতের ভেতর তাকে খুন করার উদ্দেশ্যে যখন বেদম মারে সেই সময় বুঝতে পারে, নিশানাথ নন, সমস্ত কিছুর পেছনে রয়েছে খুব সম্ভব সেই অবাঙালি বিজনেসম্যানটি যে বিশুকে পোষ্য নিয়েছিল।

এক নাগাড়ে সব জানিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে জয়তী। জড়ানো, চাপা গলায় বলে, 'জানি না বিশু বেঁচে আছে কিনা।'

সমরেশ উত্তর দেয় না। শুধু জয়তীর হাতের ওপর নিজের একটি হাত রাখে।

একদৃষ্টে জয়তীকে লক্ষ্য করছিল সুচিত্রা। হঠাৎ সে তাকে জিজ্ঞেস

করে, 'বিশুকে যে লোকটা অ্যাডপ্ট করেছিল তার নামটা কিন্তু একবারও বলনি।'

সমরেশ চকিত হয়ে ওঠে, 'আরে তাই তো।' কী নাম ওই বিজনেস-ম্যানটার?'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে জয়তী বলে, জানি না। নিশানাথবাবু বলেননি।'

সুচিত্রা বলে, 'লোকটার ঠিকানাও তা হলে জানেন না।'

'না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে জয়তী, 'নিশানাথবাবু আমাকে ঠিকানা দেননি।'

'কারণটা কী বলতে পারেন?'

'না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সুচিত্রা কী চিন্তা করে বলে, 'আশ্রম থেকে দত্তক যখন দেওয়া হয়েছিল, নিশ্চয়ই ওখানে ঠিকানা আছে। নামঠিকানাহীন লোকের হাতে তো কোনো বাচ্চাকে তুলে দেওয়া হ'তে পারে না।'

উৎসুক মুখে সমরেশ বলে, 'ঠিক বলেছিস। এই ব্যাপারটা নিয়ে আগেই ভাবা উচিত ছিল। পুলিশকে খবরটা জানানো দরকার।'

সুচিত্রা বলে, 'তা জানাস। তবে—'

'কী?'

'পুলিশ পুলিশের মতো ইনভেস্টিগেট করুক। আমরা আমাদের মতো একটু খোঁজ খবর নিই।'

'তাতে বিশেষ কিছু সুবিধে হবে কী?'

'এক্ষুণি কী করে বলি। পুলিশ সম্পর্কে মানুষের মনে এক ধরনের ভয় আছে। বিশেষ করে যেখানে খুনটুনের মতো ব্যাপার ঘটে গেছে সেখানে কেউ কিছু জানলেও বলতে চায় না। তবে আমাদের কাছে মুখ খুললেও খুলতে পারে।'

'ঠিক বলেছিস।'

সুচিত্রা বলে, 'আল্টিমেটলি তাপসরাই হয়ত মার্ডারারকে ধরে ফেলবে। আমরা যদি দু-একটা ক্লু পেয়ে যাই, ওদের সাহায্য করতে পারব। তা ছাড়া—'

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'আরো একটা দিকও আছে।'

'কি রকম ?'

'সেটা তোর প্রফেসানের ব্যাপারে। নতুন ক্লু জোগাড় করে যদি কাগজে লিখতে পারিস, আরো সেনসেসান হয়ে যাবে। 'দৈনিক মহাভারত,-এর সার্কুলেসান কোথায় পোঁছে যাবে, ভাবতে পারিস ?'

সমরেশ একটু হেসে বলে, 'সেনসেসানের চেয়ে অনেক বেশি দরকার মার্ডারারকে খুঁজে বার করা।'

সুচিত্রা বলে, 'হুঁ'। যতক্ষণ না পুলিশ তাকে ধরতে পারছে. জয়তীর প্রাণের ভয়টা থেকেই যাচ্ছে। আমার ধারণা তার ওপর ফের অ্যাটেম্পট হতে পারে।'

সমরেশ চমকে ওঠে। এ দিকটা সে ভেবে দেখেনি। ঠিকই তো, জয়তীর বেঁচে থাকাটা নিশানাথের খুনীর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। সে ওকে যেভাবেই হোক, খুন করতে চেষ্টা করবে। সমরেশ ভেতরে ভেতরে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। নিশানাথের মার্ডারার যে কতখানি মারাত্মক তা আগেই টের পাওয়া গেছে। কলকাতার আণ্ডার ওয়ার্ল্ডের ক্রিমিনালদের সঙ্গে তার ভালরকম যোগাযোগই রয়েছে। এই শহরে ভাড়াটে খুনীর অভাব নেই। পাঁচ দশ হাজার টাকা খরচ করলে এখানে হত্যাকাণ্ড ঘটানো যায়।

সুচিত্রা এক পলক সমরেশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি রে, কী ভাবছিস ?'

একটু চমকে ওঠে সমরেশ। বলে, জয়তীর কথা। তুই ঠিকই বলেছিস, নিশানাথবাবুর মার্ডারাররা ওকে বেঁচে থাকতে দেবে না। ভাবছি কাল সকালেই অনাথ আশ্রমে একবার যাব। তুই ন'টায় আমাদের ফ্ল্যাটে চলে আসিস।'

'আচ্ছা।' সুচিত্রা বলে. 'যত দেরি হবে ক্লু নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। চল, এবার যাওয়া যাক।'

রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে সুচিত্রা চলে যায়। ল্যান্সডাউন রোডে একজনের সঙ্গে তাকে দেখা করতে হবে।

সমরেশকে তার অফিসে নামিয়ে দিতে চেয়েছিল সুচিত্রা। সমরেশ রাজী হয়নি, দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মতো ফুটপাথের ওপর দিয়ে হেঁটে

চলেছে। আসলে এখন সে একটু একা থাকতে চায়। চারপাশের লোকজন, হইচই, রাস্তায় অফুরন্ত গাড়ির স্রোত—এ সব কোনোদিকেই তার লক্ষ্য ছিল না। জয়তীর নিরাপত্তার চিন্তাটা তাকে অস্থির করে রেখেছে।

আপাতত পুলিশ পাহারায় হাসপাতালে রয়েছে জয়তী। আরেকটু সুস্থ হলে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে জেল হাজতে। কিন্তু সেখানে তাকে বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না। কারণ নিশানাথবাবু খুন হয়ে যাবার পর জয়তীর অপরাধের গুরুত্ব অনেকটাই কমে গেছে। কোর্ট থেকে নিশ্চয়ই তাকে জামিন দেওয়া হবে। তখন সে কোথায় গিয়ে উঠবে? এখন পুলিশ তার ওপর লক্ষ্য রাখছে। কিন্তু পরে, অরক্ষিত জয়তীর পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। জামিন পাওয়ার পর একটা দিনও তাকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হবে কিনা সন্দেহ।

কিভাবে মেয়েটাকে অচেনা আততায়ীদের হাত থেকে বাঁচানো যায়? কলকাতা শহরের জনস্রোতের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জয়তীর নিরাপত্তার কোনো উপায়ই ভেবে বার করতে পারে না সমরেশ। তার মাথার ভেতর চাকার মতো অনবরত কিছু একটা ঘুরতে থাকে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো অফিসে এসে কোনোরকমে একটা 'কপি' তৈরি করে নিরঞ্জনের হাতে দিতেই সে বলে, 'কী ব্যাপার সমরেশ, এই দুফার বেলা আইসা কাম সাইরা যাও যে? ওই বেলা আইবা না?' এই সময়টা ভবতোষ অফিসে থাকেন না, তিনি আসেন তিনটে নাগাদ। দুপুরে কাজ চালিয়ে নেয় নিরঞ্জন।

সমরেশ বলে, 'না নিরঞ্জনদা, ওবেলা আমার একটা পার্সোনাল কাজ আছে।' আসলে তার কোনো কাজই নেই। জয়তীর নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়ে তাকে ভাল করে ভাবতে হবে। জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা, তার জন্য তারা অনেকটাই দায়ী! অল্প বয়সে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলার বা প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না সমরেশের। সেই কারণে জয়তীদের এত বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। যা হওয়ার হয়েছে। কিন্তু এখন আর কোনোভাবেই জয়তীকে মরতে দেওয়া যায় না। এত বড় একটা শহর, এত অসংখ্য মানুষ এখানে রয়েছে, বিশাল সুশৃংখল পুলিশবাহিনী, তবু অসহায় একটা মেয়েকে খুনীদের গুলি বা ছুরিতে প্রাণ দিতে হবে—এটা হ'তেই পারে না। জয়তীকে রক্ষা করার দায়িত্ব

কখন যে নিজের ওপর এসে পড়েছে, সমরেশ টের পায়নি। তাদের জন্য জয়তীদের যে সর্বনাশ হয়ে গেছে তার ক্ষতিপূরণ হয় না, কিন্তু একটা পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, এটা কোনোভাবেই হ'তে দেওয়া যায় না। জয়তীকে বাঁচাবার একটা কৌশল তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

নিরঞ্জন বলে, 'জবর মুশকিলে ফালাইলা তো—'

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'কিসের মুশকিল?'

'তুমি লেখতে আছিলা বইলা আগে কই নাই। কিছুক্ষণ আগে খবর আইছে বালিগঞ্জে এক গৃহবধূ হত্যা হইচে। তুমার একবার স্পটে যাওন যে দরকার।'

'রাজেন কি অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিন দাদা—'

'আরে ব্রাদার, ক্রাইম ট্রাইম লইয়া সগলে কি আর তুমার মতো ইন-ডেপথ স্টাডি করতে পারে, না খেলাইয়া লেখতে পারে। এট্টু কষ্ট কইরা যাও সোনা, নিশানাথবাবুর সেনসেসানের লগে আরেক খান সেনসেসান লাগাইয়া দাও। দুই সেনসেসানের চাক্কার উপর দিয়া 'দৈনিক মহাভারত' রেসের ঘুড়ার মতো দৌড়াইব। তুমি ছাড়া আর কারো উপুরে যে ভরসা করতে পারি না।'

নিরঞ্জনের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ফোন বেজে ওঠে। টেলিফোনটা তুলে নিরঞ্জন কাকে যেন বলে, 'হ, এইখানেই আছে। দিতে আছি।' ফোনটা সমরেশের দিকে বাড়িয়ে দেয়, 'তুমার লাইন—'

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'কে?'

'কথা কইলে বুঝতে পারবা।'

টেলিফোনটা নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ভবতোষের গলা ভেসে আসে, 'আরে ভাই, তোমার বাড়িতে দু'বার ফোন করেছি। শুনলাম, পুলিশ হাসপাতালে গেছ। সেখানে ফোন করে জানতে পারলাম, বেরিয়ে পড়েছ। অফিসে চান্স নিয়ে ধরতে পারলাম।'

সমরেশ বলে, 'নিশ্চয়ই বালিগঞ্জের গৃহবধূ মার্ডারের ব্যাপারে আমাকে খোঁজাখুঁজি করছেন?'

'নিরঞ্জনের কাছে তা হলে শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'এখনই নিজে গিয়ে খোঁজখবর নাও। নিশানাথ মার্ডারের মতো

দুর্ধর্ষ' একখানা কভারেজ চাই।'

সমরেশ বলে, 'নিরঞ্জনদা আমাকে সব বলেছেন। কিন্তু আমি ওঁকে বলেছি, আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে।'

ভবতোষ আঁতকে ওঠার মতো আওয়াজ করে বলেন, 'ভাই সমরেশ তুমি তো জানো, আমার অ্যানজিইনা পেক্টোরিস আছে, হার্টের অবস্থা ভীষণ খারাপ। আমাকে মারতে চাও?'

সমরেশ বলে, 'আপনি এতকাল যে সব অ্যাসাইনমেণ্ট দিয়েছেন, কোনোটা না বলিনি। কিন্তু আজ আমি মেণ্টালি ভীষণ ডিস্টার্বড। কিছুতেই পারব না।'

'কিন্তু ক্রাইম টাইমের ব্যাপারটা অন্যেরা ভালভাবে হ্যাণ্ডল করতে পারে না। তোমার ওপর 'দৈনিক মহাভারত' কতটা ডিপেণ্ড করে জানো?'

'সব জানি কিন্তু আজকের দিনটা আমাকে ক্ষমা করতেই হবে।' বলে ফোন নামিয়ে রাখে সমরেশ। ভবতোষকে আর কিছু বলার সুযোগ দেয় না।

অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে আসে সমরেশ। কলিং বেল টিপতেই লক্ষ্মী দরজা খুলে দেয়। নিঃশব্দে তার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পায়ের চটি দু'টো একরকম ছুঁড়ে ফেলে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে চোখের ওপর হাত দুটো আড়াআড়ি রেখে শুয়ে পড়ে। জয়তীর নিরাপত্তার জন্য কী করবে সে? কী করা উচিত? সুচিত্রাকে দিয়ে কোর্টে আপীল করে জজকে বলা যায়, পুলিশ হাজতেই যেন তাকে রাখা হয়। অবশ্য এটা সাময়িক ব্যবস্থা। একদিন না একদিন জয়তীকে বাইরে আসতেই হবে। তখন? আরো একটা কাজও করা যেতে পারে। ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের কারণে পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে ছোট বড় বহু অফিসারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁদের বলে জয়তীর জন্য পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে কিন্তু এটাও স্থায়ী সমাধান নয়। চিরকাল পুলিশের পক্ষে এভাবে পাহারাদারি অসম্ভব। তাছাড়া আজ হোক, কাল হোক, দু'মাস পরেই হোক, জেল হাজতের বাইরে আসতেই হবে জয়তীকে। বেরিয়ে কোথায় উঠবে সে? তার শেষ ঠিকানা ছিল একটা লেডিজ হোস্টেল। যে মেয়ে নিশানাথ সামন্তকে

গুলি করেছে, পুলিশের হেফাজত থেকে বেরুবার পর সেখানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। এমন একটা দাগী মেয়ের জন্য হোস্টেলের দরজা নিশ্চয়ই চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশের ব্যবস্থা যদি করাও যায়, কোথায় তাকে ওরা পাহারা দেবে ?

হঠাৎ কার ছোঁয়ায় চমকে মুখ থেকে হাত সরায় সমরেশ। খাটের কাছে কখন হিরন্ময়ী এসে দাঁড়িয়েছেন, সে টের পায়নি।

হিরন্ময়ী একটু উদ্বেগের সুরেই বলেন, 'কি রে, অসময়ে বাড়ি ফিরে এলি যে ? শরীর খারাপ লাগছে ?'

আস্তে আস্তে উঠে বসে সমরেশ। বলে, 'না।'

হিরন্ময়ী জানেন রোজ দু'বেলা সমরেশ পুলিশ হাসপাতালে জয়তীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। বলেন, 'আজ হাসপাতালে যাসনি ?'

'গিয়েছিলাম।'

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করে নেন হিরন্ময়ী। বুঝতে পারেন, সমরেশ খুবই বিচলিত এবং চিন্তাগ্রস্ত। জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে রে ?'

সমরেশ খাটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ব'সো।'

ধীরে ধীরে ছেলের কাছে বসে পড়েন হিরন্ময়ী। কোনো প্রশ্ন না করে উন্মুখ তাকিয়ে থাকেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর সমরেশ আস্তে আস্তে বলে, 'জয়তীকে নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছে মা।'

হিরন্ময়ীর চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়। বলেন, 'কিসের সমস্যা রে ?'

সমরেশ সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়। ছেলের দুশ্চিন্তাটা এবার মায়ের মধ্যেও চারিয়ে যায়। তিনি বলেন, 'তাই তো, এ যে খুব ভয়ের কথা।'

সমরেশ উত্তর দেয় না।

কিছুক্ষণ কী ভেবে হিরন্ময়ী বলেন, 'জামিন পেয়ে জয়তী কোথায় গিয়ে থাকবে, জিজ্ঞেস করেছিলি ?'

সমরেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'না।'

হিরন্ময়ী বলেন, 'তুই বিকেলে হাসপাতালে যাবি কি ?'

'হ্যাঁ।'

'আজ আমিও তোর সঙ্গে যাব।'

'আচ্ছা, যেও।'

বিকেলে হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে করে আবার হাসপাতালে আসে সমরেশ।

হিরণ্ময়ীকে দেখে দু'হাতে মুখ ঢাকে জয়তী। তারপর সমানে কাঁদতে শুরু করে। কান্নার উচ্ছ্বাসে তার সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠতে থাকে।

জয়তীকে গভীর আবেগে বুকের ভেতর টেনে নেন হিরণ্ময়ী। জয়তীর কান্না বুঝিবা তাঁর মধ্যেও চারিয়ে যাচ্ছিল। ভারী গলায় বলেন, 'কাঁদে না মা, কাঁদে না।'

অবরুদ্ধ স্বরে জয়তী বলে, 'কেন এখানে এলেন মাসিমা?'

'আমি যে আসব সমু তোমাকে আগে জানায় নি?'

'জানিয়েছে। কিন্তু আমার মুখ দেখাও যে পাপ।'

হিরণ্ময়ী বলেন, 'এমন কথা বলতে নেই রে মেয়ে।'

'আপনি তো আমার সব কথাই শুনেছেন।' জয়তী বলতে থাকে, 'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।'

'ছিঃ জয়তী, এসব চিন্তা মনেও এনো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জয়তী উত্তর দেয় না, অনবরত কেঁদেই যায়।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে শান্ত করেন হিরন্ময়ী। তারপর এক-সময় বলেন, 'হ্যাঁ রে মা, সমু বলছিল তোমার নাকি কোথাও থাকার জায়গা নেই। এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়ে উঠবে?'

জয়তী উদাসীন ভঙ্গিতে বলে, জানি না। যে হোস্টেলে থাকতাম সেখানে আমার জায়গা হবে না। একটা খুনীকে কে আর আশ্রয় দেবে?' একটু চুপ করে থাকার পর বলে, 'আমি চাইব, জেল থেকে আমাকে যেন আর কোনোদিন বেরুতে না হয়।'

'আবার পাগলামি!' হিরণ্ময়ী সস্নেহে বলেন, 'সমু আর সুচিত্রা আমাকে বলেছে, খুব তাড়াতাড়িই তোমাকে জামিন দেবে। তাছাড়া সাজাটাও বেশি হবে না। কিন্তু—'

তাঁর মনোভাব যেন বুঝতে পারছিল জয়তী। বিমর্ষ হেসে বলে, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন, তারপর আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব—এই তো?'

'হুঁ্যা।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন হিরণ্ময়ী।

জয়তী বলে, 'ওসব নিয়ে আমি কিছু ভাবি না। যা হবার হবে। বাবা নেই, মা নেই, বিশুর কী হয়েছে জানি না। আমার বেঁচে থেকে কী লাভ?'

হিরণ্ময়ী জয়তীর কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'অত ভেঙে পড়তে নেই মা। পুলিশ যেভাবে খোঁজাখুঁজি করছে, বিশুকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। দুঃসময় চিরকাল থাকে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' বলতে বলতে তিনি ছেলের দিকে ফেরেন, 'হ্যাঁ রে সমু, জয়তীকে কবে জামিনে খালাস দেবে?'

সমরেশ বলে, 'ও আরেকটু সুস্থ হলে পুলিশ থেকে কোর্টে নিয়ে যাবে। খুব বেশি হলে একটা সপ্তাহ। সুচিত্রা বলেছে, যেদিন জয়তীকে কোর্টে প্রোডিউস করা হবে সেদিনই ওর জামিন হয়ে যাবে।'

চিন্তিতভাবে হিরণ্ময়ী বলেন, তা হলে তো খুব তাড়াতাড়িই ওর একটা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

এবার হিরণ্ময়ী জয়তীর দিকে ফেরেন। সে নিরুৎসুক মুখে দু'-জনের কথা শুনছিল। হিরণ্ময়ী তাকে বলেন, 'চিন্তা ক'রো না মা। একটা কিছু হয়ে যাবে।'

জয়তী উত্তর দেয় না।

হিরণ্ময়ী বলেন, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার আমরা যাই, তুমি বিশ্রাম ক'রো।'

জয়তী আবছা গলায় বলে, 'আচ্ছা।'

উঠে পড়তে পড়তে হিরণ্ময়ী বলেন, 'আবার আসব। কোনো ভয় নেই মা—'

হাসপাতাল থেকে মাকে নিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে নেমে গিয়েছিল। বাড়ি এসে অন্যমনস্কর মতো কিছুক্ষণ এ ঘর ও ঘর করেছে সমরেশ। তারপর টিভিতে সাড়ে সাতটায় বাংলা সংবাদ এবং সাড়ে ন'টায় ইংরেজি খবর শুনে সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুম আসেনি।

অনেকক্ষণ অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করার পর উঠে পড়ে সমরেশ। ওয়াল ক্যাবিনেটের ড্রয়ার খুলে সমশেরগঞ্জে তোলা জয়তীর পুরনো ছবিগুলো বার করে দেখতে থাকে। জয়তীর নিষ্পাপ হাস্যোজ্জ্বল মুখ-

গুলো তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বুকের ভেতর থেকে অদ্ভুত এক কষ্ট উঠে এসে শক্ত ডেলার মতো গলার কাছে আটকে যায়।

একসময় ছবিগুলো বিছানার ওপর ছড়িয়ে রেখে আস্তে আস্তে বাইরের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়।

কলকাতা কখনও ঘুমোয় না। তবু এই মধ্যরাতে চারিদিক প্রায় ফাঁকাই ক্কচিৎ নিশাচর দু-একটা লোক দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সুনসান রাস্তায় হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে একটা ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কার অথবা কোনো ট্রাক। ঠুন ঠুন আওয়াজ করে মাতাল সওয়ারীকে শুঁড়িখানা থেকে বাড়ি পেঁৗছে দিচ্ছে রিকশাওলারা।

মাথার ওপর বিশাল চাঁদোয়ার মতো ঝকঝকে নীলাকাশ। তার গায়ে রুপোর ফুলের মতো অজস্র তারা। এখন বুঝিবা শুক্লপক্ষ চলছে। দিগন্তের তলা থেকে গোলাকার চাঁদ উঠে এসেছে। দুধের মতো ধবধবে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। চিরকালের চেনা নোংরা দুর্গন্ধময় ধুলিধুসর কলকাতাকে পূর্ণিমার রাতে অপার্থিব মনে হচ্ছে।

রেলিংয়ের ওপর হাতের ভর রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ জয়তী সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে পেঁৗছে যায় সমরেশ। মনে মনে ভেবে নেয়, দু-একদিনের ভেতর মা আর সুচিত্রাকে তা জানিয়ে দেবে।

তের

কথামতো পরদিন সুচিত্রা তার এক ক্লায়েন্টের গাড়ি নিয়ে ঠিক ন'টায় সমরেশকে তার ফ্ল্যাট থেকে তুলে নিয়ে যায়। তারা যাবে নিশানাথ সামন্তর অনাথ আশ্রমে।

ক্লায়েন্টের ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল।

ব্যাক সীটে বসে আছে সুচিত্রা আর সমরেশ। দু'ধারের জানালার বাইরে দু'জনের মুখ ফেরানো। রাস্তার লোকজন, দোকান-পাট, গাড়িটাড়ি এবং অন্যান্য দৃশ্যাবলী দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে।

একসময় ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে সঙ্গিনীর দিকে তাকায় সমরেশ। কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ করে। তারপর চাপা গলায় ডাকে, 'সুচিত্রা—'

সুচিত্রা ঘুরে বসে। বলে, 'কিছু বলবি ?'

'হ্যাঁ।' বলেই চুপ করে যায় সমরেশ।

সুচিত্রা উন্মুখ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মনে মনে বক্তব্যটা গুছিয়ে নিয়ে খানিক পরে সমরেশ বলে, 'কাল রাত্তিরে আমি ভাল করে ঘুমোতে পারিনি।'

সুচিত্রা বলে, 'কেন রে? তোর তো ইনসমনিয়া টিনসমনিয়া বলে কিছু নেই। শোয়ামাত্র নাক ডাকিয়ে পাড়া মাত করে ফেলিস।'

সুচিত্রা মজার গলায় হালকাভাবে কথাগুলো বলেছে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ নেই সমরেশের। সে বলে, 'সারা রাত জয়তীর কথা ভেবেছি।'

সুচিত্রা উত্তর না দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে সমরেশকে লক্ষ করে যায়।

সমরেশ বলে, 'জয়তীর ব্যাপারে আমি একটা ডিসিসান নিয়ে ফেলেছি।'

সুচিত্রা সামান্য ভারী গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী ডিসিসান?'

'আজ না, দু-চারদিন পর তোকে বলব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সুচিত্রা বলে, 'আশ্চর্য।'

একটু অবাক হয়েই সমরেশ বলে, 'কিসের আশ্চর্য!'

'কাল রাত্তিরে জয়তীর সম্বন্ধে আমিও কিছু ভেবেছি।'

'কী?'

'এখন না, পরে বলব।'

সমরেশ এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করে না। শুধু বলে, 'ঠিক আছে।'

কিছুক্ষণ পর সুচিত্রা বলে, 'আমার কী মনে হয় জানিস?'

সমরেশ তার মুখের দিকে তাকায় শুধু, কিছু বলে না।

সুচিত্রা বলে, 'হয়ত দেখা যাবে, জয়তী সম্পর্কে আমাদের দু'জনের ভাবনা একই রকম।'

সমরেশ চুপ করে থাকে।

একসময় শহরের পূর্বদিকের শেষ মাথায় নিশানাথ সামন্তর অনাথ আশ্রমে পৌঁছে যায় তারা।

দীঘা থেকে ফিরে নিশানাথবাবুকে গুলি করার খবর পেয়ে একবারই মাত্র অনাথ আশ্রমে এসেছিল সমরেশ। আজ আবার এল। অবশ্য চার পাঁচ বছর আগে বেশ কয়েক বার এখানে এসেছে সে। তখনই

রামতারণ মল্লিকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। নিশানাথ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেও রামতারণ তার পাশে না থাকলে এটা চালানো অসম্ভব হ'ত। এমন খাঁটি সমাজসেবী ক্বচিৎ কখনও দেখা যায়। নিশানাথের মতোই চিরকুমার, পিছুটান বলতে কিছু নেই, একেবারে ঝাড়া হাত-পা মানুষ। এই অনাথ আশ্রমের ছেলেরাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

গাড়িটা বাইরের রাস্তায় রেখে সুচিত্রা আর সমরেশ ভেতরে ঢুকে পড়ে তারা যতক্ষণ না ফিরছে, ড্রাইভার গাড়িতে অপেক্ষা করবে।

ক'দিন আগে সমরেশ যখন এখানে এসেছিল, সমস্ত অনাথ-আশ্রমটা ছিল থমথমে, একটা দম-চাপা আতঙ্ক চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল। আজ আবহাওয়া অনেকখানি স্বাভাবিক। আশ্রমের ছেলেরা এধারে ওধারে হইচই, হুটোপুটি করছে।

সুচিত্রাকে সঙ্গে করে সমরেশ সোজা অফিস ঘরে চলে আসে। রামতারণ মল্লিককে সেখানেই পাওয়া যায়। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি। এখনও তাঁর স্বাস্থ্য বেশ মজবুত। মাঝারি হাইট, তরতরে মুখ, মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতরে দু'টি শান্ত চোখ, চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতির ওপর খদ্দরের হাফ-হাতা পাঞ্জাবি।

রামতারণ টেবিলের ওপর ঝুঁকে একটা মোটা খাতায় কী সব লেখালেখি করছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকান। সমরেশকে দেখে একটু উৎসুকভাবেই বলেন, 'আসুন—আসুন—বসুন—'

মুখোমুখি বসে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে যায় সমরেশ, একটা বিশেষ দরকারে আপনার কাছে এসেছি।'

'বলুন—'

'আপনি নিশ্চয়ই খবরের কাগজে দেখেছেন, যেদিন নিশানাথবাবু জয়তী সান্যালের গুলিতে সীরিয়াসলি উণ্ডেড হয়ে হাসপাতালে যান, একজন অবাঙালি ফোনে বার বার খবর নিচ্ছিল তিনি বেঁচে আছেন কিনা।'

একটু চিন্তা করে রামতারণ বলেন, 'হ্যাঁ।'

সমরেশ এবার জিজ্ঞেস করে, 'আপনি আরো একটা ইনফরমেসন পেয়ে থাকবেন, জয়তী সান্যালকে খুনের অ্যাটেম্পট হয়েছিল। লাকিলি সে বেঁচে গেছে'।'

রামতারণ বলেন, এ খবরটাও তাঁর জানা। তিনি আরো জানেন, জয়তী এখন ভাল আছে, তার মৃত্যুর আশঙ্কা আর নেই।

সমরেশ বলে, 'কাল জয়তী জানিয়েছে, ওর যে ভাই বিশু আপনাদের এখানে থাকত তাকে একজন অবাঙালি অ্যাডপ্ট করে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে।'

'যে হাসপাতালে নিশানাথবাবুর মৃত্যুর খবর নিচ্ছিল আর যে বিশুকে পোষ্য নিয়েছে, তারা দু'জনে কি এক লোক বলে আপনার মনে হয় ?' প্রশ্নটা করে সোজা রামতারণের দিকে তাকায় সমরেশ।

রামতারণ বলেন, 'তা কী করে বলব ?'

এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল সুচিত্রা। এবার সে বলে, 'আচ্ছা, যে লোকটা বিশুকে অ্যাডপ্ট করেছিল তার কি নাম ?

'এক মিনিট।' অফিস ঘরের একটা দেওয়াল ঘেঁষে সারি সারি ক'টা আলমারি। তার ভেতর থেকে একটা মোটা খাতা বার করে পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় থামেন রামতারণ। সেখানে পর পর অনেকগুলো নাম লেখা রয়েছে। নামগুলোর তলায় আঙুল বুলোতে বুলোতে এক জায়গায় তাঁর হাত স্থির হয়ে যায়। বলেন, 'এই যে—প্রতাপচাঁদ আগরওয়াল।'

সুচিত্রা তার ঢাউস লেডিজ ব্যাগ থেকে একটা নোট বই আর পেন বার করে নামটা লিখতে লিখতে বলে, 'প্রতাপচাঁদের ঠিকানাটা বলুন—'

'বারোর এ অখিল চৌধুরী স্ট্রীট, বেলেঘাটা।'

নাম ঠিকানা লেখা হলে সুচিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'এমন সব মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল, প্রতাপচাঁদ কি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ?'

'না।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সুচিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'পোষ্য দেওয়া ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। নানারকম সাক্ষীসাবুদ দরকার। তাছাড়া অনুষ্ঠানের ডকুমেণ্ট হিসেবে ছবি তুলে রাখতে হয়।'

'হ্যাঁ, জানি।' ঘাড়টা ডান দিকে সামান্য হেলিয়ে দেন রামতারণ।

'সেই ছবির কপি নিশ্চয়ই আছে আপনাদের কাছে ?'

আচমকা রামতারণের চোখেমুখে ভয়ের ছায়া পড়ে। কিছুটা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'ছিল।'

'ছিল মানে ? এখন নেই ?' সুচিত্রার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'না। নিশানাথবাবুকে জয়ন্তী যেদিন গুলি করে তার আগেও ওটা দেখেছি কিন্তু পরে আর ছবিটা পাওয়া যায়নি।'

'কোথায় যেতে পারে?'

'বুঝতে পারছি না। তবে নিশানাথবাবু যখন হাসপাতালে, সেই সময় একদিন রাত্তিরে অনাথ আশ্রমে চোর পড়েছিল। প্রথমটা ভেবেছিলাম, টাকাপয়সা চুরি করতেই এসেছে, কিন্তু একটা পয়সাও খোয়া যায়নি। পরে লক্ষ্য করলাম ছবিটা নেই।'

'কতদিন পরে?'

'ধরুন সপ্তাহ খানেক।'

'ছবিটা থাকত কোথায়?'

একটা আলমারি দেখিয়ে রামতারণ বলেন, 'ওটার ভেতর, অ্যালবামের মধ্যে। যারা যারা এতকাল এখান থেকে ছেলে অ্যাডপ্ট করেছে, তাদের সবার ছবি রয়েছে। শুধু ওই পারটিকুলার ছবিটাই মিসিং।'

সুচিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'ওই অ্যালবামটা কি আপনারা প্রায়ই বার করে দেখেন?'

'না। যখন কেউ অ্যাডপ্ট করে তখন ছবি তুলে প্রিজার্ভ করার জন্যে ওটা বার করি।'

'এর ভেতর কেউ অ্যাডপ্ট করেছে?'

'না।'

'তা হলে ওটা বার করেছিলেন কেন?'

রামতারণ এবার যা উত্তর দেয় তা এইরকম। বছর ছয়েক আগে এক জার্মান ভদ্রলোক এখান থেকে একটি ছেলেকে অ্যাডপ্ট করে ফ্রাঙ্কফুর্ট নিয়ে যায়। দত্তক নেবার সময় যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তার ছবির একটা কপি তাঁর কাছে ছিল কিন্তু সেটা নষ্ট হয়ে যায়। তিনি ক'দিন আগে অন্য প্রয়োজনে কলকাতায় এসেছিলেন। ভেবেছেন, যখন এসেই পড়া গেছে তখন অনাথ আশ্রম থেকে সেই ছবিটার একটা কপি করিয়ে নিয়ে যাবেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ওটা থাকা দরকার। জার্মান ভদ্রলোকের জন্য ছবি বার করতে গিয়ে দেখা যায় প্রতাপচাঁদদের ছবিটা নেই।

সুচিত্রা বলে, 'ছবিটা সম্পর্কে পুলিশকে জানিয়েছেন?'

রামতারণ বলেন, 'ব্যাপারটার যে তেমন গুরুত্ব আছে তখন বুঝতে পারিনি। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে এখন মনে হচ্ছে পুলিশকে

জানানো উচিত ছিল।'

'আচ্ছা, আলমারিটা তালা দেওয়া থাকে ?'

'না। কিছু পুরনো ফাইল আর অ্যাডপসানের ছবির গোটাকয়েক অ্যালবাম ছাড়া ওগুলোতে আর কিছু নেই। ছবিগুলোর যে কোনো বিশেষ গুরুত্ব থাকতে পারে, আমরা ভাবিনি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সুচিত্রা ধীরে ধীরে প্রশ্নটা করে, 'আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই সেই ছবিটার নেগেটিভ আছে ?'

একটু চিন্তা করে রামতারণ বলেন, 'বোধহয় নেই।'

'মানে ?'

'যতদূর মনে পড়ছে প্রতাপচাঁদ বা অন্য কেউ ফোটোগ্রাফার নিয়ে এসেছিলেন। ছবি তোলার পর একটা কপি আমাদের দিয়ে গেছেন। নেগেটিভ থাকলে ওঁদের কারো কাছেই থাকার কথা।'

'ওদের বলতে ?'

'সেদিন প্রতাপচাঁদ ছাড়া আরো কয়েকজন আমাদের এখান থেকে ছেলে অ্যাডপ্ট করেছিলেন।'

এবার সুচিত্রার ডান পাশ থেকে উৎসুক সুরে সমরেশ বলে, 'তাই নাকি ?'

রামতারণ বলেন, 'হ্যাঁ।'

'ওঁদের নাম-ঠিকানা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে আছে।'

'আছে। দরকার ?'

'হ্যাঁ।'

রামতারণ ফের সেই মোটা খাতাটা খুলে নামগুলো পর পর পড়ে যান। এর মধ্যে একজন ফ্রেঞ্চ, একজন কানাডিয়ান, একজন ওয়েস্ট জার্মান। বাকি পাঁচজন অবশ্য ভারতীয়, তাঁরা এই কলকাতারই বাসিন্দা।

সমরেশ বলে, 'আশা করি ওদের কাছে ছবির কপি আছে।'

রামতারণ বলেন, থাকা তো উচিত। কেননা অ্যাডপসানের পরদিনই একটা লোক আমাদের এখানে ন'খানা ছবি দিয়ে গিয়েছিল। যে আট জন অ্যাডপ্ট করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য একখানা করে, বাকিটা আমাদের অফিস রেকর্ড হিসেবে রেখে দিয়েছিলাম।

সমরেশ বলে, নাম আর ঠিকানাগুলো আরেকবার পড়ুন। সুচিত্রা তুই টুকে নে।'

সুচিত্রার নোটবুকটা টেবিলের ওপরেই পড়েছিল। সে প্রতাপচাঁদের নামের পর বাকি সাতটা নাম এবং ঠিকানা টুকে নেয়।

সমরেশ বলে, 'ফরেনারদের সঙ্গে তো খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করা যাবে না। তবে বাকিদের সঙ্গে আজই দেখা করব। দেখি যদি কারো কাছে ছবিটা পাওয়া যায়।'

রামতারণ জিজ্ঞেস করেন, 'ছবিটার ওপর আপনারা এত জোর দিচ্ছেন কেন ?'

সমরেশ বলে, 'আপনাদের এখানে এত জিনিস থাকতে চোর শুধু একটা ছবি নিয়ে গেল কেন, এটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।'

রামতারণের শান্ত চোখ হঠাৎ ঝকঝকিয়ে ওঠে। তিনি বলেন, আপনাদের কি ধারণা, ওই ছবিতে এমন কেউ আছে যে ধরা পড়ার ভয়ে নিজের আইডেনটিটি নষ্ট করে দিতে চায় ?'

'আমাদের সেই রকমই ধারণা।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সমরেশই আবার শুরু করে, 'জয়তীর কাছে শুনেছি, ওর ভাই বিশুকে দত্তক দেবার সময় ও কলকাতায় ছিল না। তিন চার মাস পর ফিরে যখন আপনাদের এখানে আসে, নিশানাথবাবু দেখা করতে চাননি। এখানকার সবার ওপর নাকি নির্দেশ ছিল, তাকে যেন নিশানাথবাবুর কাছে না নিয়ে যাওয়া হয়। কারণটা কী, বলতে পারেন ?'

রামতারণ তক্ষুণি উত্তর দেন না। মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ কী ভাবেন, তারপর বিব্রতভাবে সমরেশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন 'জয়তী কিছু বলেনি ?'

'বলেছে।' তবু আপনার কী ধারণা, জানতে চাই।'

'বিশুর অ্যাডপসানের ব্যাপারে নিশানাথবাবু সুখী হননি আমাকে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, তবে আভাসে ইঙ্গিতে যেটুকু বুঝেছি, তিনি এ নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। খুন হওয়ার কিছুদিন আগে থেকে সারা রাত ঘুমোতেন না। আর জয়তীকে দেখলেই চমকে উঠতেন। শেষ দিকে মারাত্মক এক ভয় যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল।'

'কেন জয়তীকে ভয় পেতেন, নিশানাথবাবু কখনো বলেছেন ?'

'না। এমনিতে খুব চাপা স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তবে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান রামতারণ।

'তবে কী ?' টেবিলের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে সমরেশ।

রামতারণ দ্বিধান্বিতভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। তারপর বলেন, 'দেখুন, নিশানাথবাবুর ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। শরীর টরীর খারাপ হলেও ওটা না লিখে শুতেন না। আমার বিশ্বাস ওঁর ডায়েরিতে বিশুর ব্যাপারটা পাওয়া যাবে।'

'ডায়েরিটা আমাকে একটু দিতে পারেন ?' উত্তেজনায় সমরেশের গলা প্রায় কাঁপতে থাকে।

বিমর্ষ মুখে রামতারণ বলেন, 'সম্ভব নয়। নিশানাথবাবু খুন হওয়ার পর পুলিশ এসেছিল। তারা তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে কিন্তু ডায়েরি পায়নি। অবশ্য—'

'অবশ্য কী ?'

'এইমাত্র আমার মনে পড়ছে, শেষ দিকটায় উনি অনাথ আশ্রমে খুব বেশি থাকতেন না। মাঝে মাঝে এখানে আসতেন।'

'কোথায় থাকতেন তা হলে ?'

'উনি পার্ক সার্কাসে একটা চ্যারিটেবল হেলথ সেণ্টার খুলেছিলেন। সেখানেই থাকতেন।'

'হেলথ সেণ্টারের ঠিকানাটা কী ?'

রামতারণ ঠিকানা বললেন। আগের মতোই সুচিত্রা তার নোটবুকে সেটা লিখে নিল।

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'হেলথ সেণ্টারে ওঁর ডায়েরি টায়েরি পাওয়া যেতে পারে ?'

রামতারণ বলেন, 'খুব সম্ভব পাবেন।'

সমরেশ বলে, 'অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি। এবার উঠি। পরে দরকার হলে আবার আসব।'

'যখন ইচ্ছে আসবেন।'

চোদ্দ

অনাথ আশ্রম থেকে বেরিয়ে সুচিত্রা আর সমরেশ গাড়িতে উঠে পড়ে।

সুচিত্রা বলে, 'এখন কী করবি ?'

সমরেশ বলে, 'তোর ক্লায়েন্টের গাড়িটা যখন পাওয়া গেছে, এখনই প্রতাপচাঁদ বাজোরিয়া আর যে চারজন একই দিনে আশ্রমের চারটে ছেলেকে অ্যাডপ্ট করেছিল তাদের সঙ্গে দেখা করব। কোর্টে আজ তোর কোনো কেস নেই তো ?'

'না।'

সুচিত্রা নোটবুক বার করে রামতারণের দেওয়া নাম-ঠিকানা ভাল করে দেখে নেয়। প্রতাপচাঁদ থাকেন বেলেঘাটায়। বাকি চারজন হলেন সঞ্জীবন সেন, পরমেশ ভট্টাচার্য, অখিলবন্ধু সাহা এবং মন্মথ তালুকদার।

সঞ্জীবনের ঠিকানা ভবানীপুরে, পরমেশের দক্ষিণেশ্বরে, অখিলবন্ধুর বাগবাজারে, আর মন্মথর লেক গার্ডেনসে।

সুচিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কোন দিক থেকে শুরু করবি ? নর্থ থেকে সাউথে, না সাউথ থেকে নর্থে ?'

সমরেশ বলে, 'সাউথ থেকে নর্থে। প্রথমে লেক গার্ডেনস-এ যাওয়া যাক। সবার শেষে যাব ইস্টে—প্রতাপচাঁদের কাছে।' একটু থেমে বলে 'হোল ডে লেগে যাবে মনে হচ্ছে।'

'হুঁ।'

'দুপুরে কোথাও লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যাবে। আর তাপসকে একট ফোন করা দরকার।'

'তাপসকে ফোন করবি কেন ?'

'পার্ক সার্কাসের চ্যারিটেবল হেলথ সেন্টারে গেলে আমাদের ডায়েরি দেখাতে না-ও পারে। কিন্তু পুলিশকে বাধা দিতে পারবে না।'

'রাইট।'

লেক গার্ডেনস-এ এসে কোনো কাজ হয় না।

একটা বিরাট হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের চারতলার গোটা ফ্লোরটা নিে থাকেন মন্মথরা। প্রায় চার হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। কিন্ লিফটে করে ওপরে উঠে দেখা গেল, দরজায় ভারী ভারী তালা ঝুলছে অগত্যা নিচে নেমে দারোয়ানের কাছে খোঁজ করতে জানা যায়, মন্ম

তালুকদার সপরিবারে দেরাদুন গেছেন, একমাস পর ফিরবেন।

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'ওদের ফ্যামেলিতে কে কে আছেন ?

দারোয়ান জানায়, মন্মথরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। তবে কয়েক মাস আগে একটি ছেলেকে পোষ্য নিয়েছেন তার নাম অজয়।

'অজয় এখন কোথায় ?'

'ওঁদের সঙ্গে গেছে।'

'ছেলেটির সঙ্গে মন্মথবাবুদের সম্পর্ক কেমন বলতে পার ?'

সন্দিগ্ধ চোখে সমরেশকে দেখতে দেখতে দারোয়ান জিজ্ঞেস করে, 'কেন বলুন তো ?'

সমরেশ বলে, দরকার আছে। যে অনাথ আশ্রম থেকে মন্মথবাবু অজয়কে এনেছেন, আমরা সেখান থেকেই আসছি। যাদের আমরা পোষ্য দিই, তাদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে গিয়ে খোঁজ খবর নিই। যদি বুঝি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার হচ্ছে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।' শেষ কথাগুলো দারোয়ানের সন্দেহ কাটানোর জন্য স্রেফ বানিয়েই বলে সে।

দারোয়ানের সংশয় হয়ত কেটে যায়। সে আন্তরিক গলায় বলে, তালুকদার সাহেব আর তাঁর স্ত্রী নিজের ছেলের মতো ভালোবাসেন অজয়কে। ভাল স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। বড় ক্লাবে সাঁতার শেখান, দর্শপ্রিয় পার্কে টেনিস খেলাতে নিয়ে যান। নিজের মা-বাবাও ছেলেকে এত যত্ন করে না।'

সমরেশ বলে. 'ছেলেটা তা হলে ভালই আছে ?'

'নিশ্চয়ই। এই ফ্ল্যাট বাড়ির যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করুন। সবাই এক কথা বলবে।'

'আচ্ছা ভাই, খবরটা পেয়ে আমাদের অনেক উপকার হল। চলি—'

বাইরে এসে গাড়িতে উঠে সমরেশ বলে, 'লেক গার্ডেনসে কোনো গোলমাল নেই। এবার তা হলে ভবানীপুর যাওয়া যাক।'

লেক গার্ডেনস থেকে ভবানীপুরে নিউ রোডে এসেও নিরাশ হতে হল। সঞ্জীবন সেন, তাঁর স্ত্রী এবং যে ছেলেটিকে ওঁরা পোষ্য নিয়েছিলেন সেই হারুকে পাওয়া গেল না। সঞ্জীবন সেনের সারা ভারত জুড়ে নানা ধরণের ব্যবসা রয়েছে। ব্যবসার কাজে প্রায়ই তাঁকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়। এবার তাঁকে যেতে হয়েছে বোম্বাই। সঙ্গে নিয়ে গেছেন স্ত্রী এবং হারুকে। তাঁদের বিশাল লন এবং বাগানওলা চমৎকার বাংলো

টাইপের বাড়িতে রয়েছে মালী, ড্রাইভার এবং অন্য সব কাজের লোক। তাদের জিজ্ঞেস করে সমরেশরা জানতে পারে হারু তার নতুন মা-বাবার কাছে বেশ সুখেই আছে, লেক গার্ডেনসের মন্মথ তালুকদারদের মতো সঞ্জীবনরা তার লেখাপড়া, বড় ক্লাবে খেলাধুলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হারু যে ভাল আছে, পাড়ার লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেও জানা যাবে।

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'হারুকে, দত্তক নেবার সময় অনাথ আশ্রমে একটা ছবি তোলা হয়েছিল। সেই ছবিটা বাড়িতে আছে কি? থাকলে আমরা একবার দেখতে চাই।'

কাজের লোকেরা জানায়, এরকম একটা ছবি তারা দেখেন। তবে সেটা রয়েছে, সেন সাহেবের বেড রুমে। কিন্তু ছবিটা দেখানো যাবে না, কেননা ওই ঘরটা তালা দিয়ে চাবি নিয়ে ওঁরা চলে গেছেন। দিন পনের কুড়ি বাদে সেন সাহেবরা কলকাতায় ফিরবেন। তখন যদি সমরেশরা একটু কষ্ট করে আসে, সেন সাহেবদের সঙ্গে আলাপও হবে, সেই সঙ্গে ছবিটাও তারা দেখে যেতে পারবে।

সঞ্জীবন সেনের বাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতে সাড়ে বাড়োটা বেজে যায়।

সমরেশ বলে, 'ভীষণ খিদে পেয়েছে। চল এখানেই কোথাও খেয়ে নিই। তারপর নর্থ ক্যালকাটায় এক্সপীডিসানে বেরুনো যাবে।'

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হয় না। আশুতোষ মুখার্জি রোডে একটা পরিচ্ছন্ন পাঞ্জাবী হোটেল পেয়ে যায় ওরা। এখানে একধারে একটা পাবলিক টেলিফোন রয়েছে।

হোটেলে ঢুকে প্রথমে থানায় ফোন করে, তাপসকে ফোন করে নিশা-নাথবাবুর ডায়েরির কথা জানিয়ে দেয় সমরেশ। পার্ক সার্কাসে হেলথ সেণ্টারের খবরটা দিয়ে বলে, 'আজই ডায়েরিটা জোগাড় করে ফেল। ওটার ভেতর অনেক ক্লু পেয়ে যাবে বলে ধারণা।'

তাপস বলে, 'দশ মিনিটের ভেতর আমি পার্ক সার্কাসে বেরিয়ে পড়ছি।'

'পরে দেখা হবে—' বলে লাইন কেটে সুচিত্রাকে নিয়ে তো হোটেলের এক কোণে একটা টেবিল নিয়ে মুখোমুখি বসে সমরেশ। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটার সামনে এসে হাজির। তাকে অর্ডার দিয়ে সমরেশ সুচিত্রাকে

বলে, 'ভারি মুশকিল হল তো ?'

সুচিত্রা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, 'কিসের ?'

'দু'জনকে পাওয়া গেল না। অন্য দু'জনও যদি কলকাতায় না থাকেন ?'

'তা হলে সত্যিই খানিকটা অসুবিধা হবে। তবে আমার ধারণা, কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবেই। গিয়ে দেখাই যাক না'—

লাঞ্চ শেষ করে আগে দু'জনে চলে যায় দক্ষিণেশ্বর। ঠিকানা খুঁজে পরমেশ ভট্টাচার্যর পুরনো আমলের বিশাল তেতলা বাড়িটা বার করতে অসুবিধা হয় না।

পরমেশের বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। অভিজাত চেহারার এই মানুষটি এই বয়সেও যথেষ্ট সুপুরুষ। গায়ের রং টকটকে ফর্সা তার ওপর হলদে আভা মাখানো। শরীরের বাঁধন কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে গেলেও স্বাস্থ্য বেশ ভালই। পরণে ফিনফিনে ধুতি এবং পাশে ফিতে লাগানো মেরজাই, পায়ে শুঁড়তোলা বিদ্যাসাগরী চটি, চোখে সরু সিল্কের সুতোয় বাঁধা রিমলেশ চশমা। পোশাকে আশাকে উনিশ শতকের চালটি বজায় রেখেছেন পরমেশ।

আসার উদ্দেশ্য গোপন করে না সমরেশ। সংক্ষেপে সব জানিয়ে বলে এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

পরমেশ মানুষটি অমায়িক এবং সজ্জন। বলেন, 'অবশ্যই।' আসুন—' যথেষ্ট আপ্যায়ন করেই সমরেশ আর সুচিত্রাকে ড্রইং রুমে নিয়ে গিয়ে বসান।

বাইরের এই ঘরটির সিলিং থেকে ঝুলছে বিশাল ঝাড়বাতি। ভারী ভারী সোফা, কার্পেট, গ্লাসটপ সেণ্টার টেবিল, অ্যাকুয়েরিয়াম এবং দুষ্প্রাপ্য কিউরিও দিয়ে ঘরটা সাজানো।

সমরেশদের মুখোমুখি বসতে বসতে বলেন, 'বলুন, কী বলবেন ?' পরক্ষণে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'প্লীজ, এক মিনিট, আগে একটু চা আনতে বলে দিই।'

পরমেশ উঠতে যাবেন, হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দেয় সমরেশ, 'দয়া করে কিছু আনাবেন না। আমরা এইমাত্র লাঞ্চ খেয়ে এসেছি।'

পরমেশ খুঁতখুঁত করতে থাকেন, 'প্রথম দিন আমাদের বাড়ি এলেন। একটু কিছু—'

সমরেশ হাত জোড় করে বলে, 'আজ ক্ষমা করুন। পরে আরেক দিন এসে খেয়ে যাব।'

'কথা দিলেন কিন্তু—,

'নিশ্চয়ই। এবার তা হলে কাজের কথা শুরু করা যাক। অনাথ আশ্রম থেকে আপনি যেদিন একটি ছেলেকে অ্যাডপ্ট করেন—কী যেন নাম তার?'

'ডাকনাম সোনা, ভাল নাম সন্দীপ—'

'সেদিন আরো আট ভদ্রলোক ওখানকার আটটি ছেলেকে অ্যাডপ্ট করে। মনে আছে কি?'

পরমেশ বলেন, 'মনে থাকবে না কেন? এই তো ক'মাস আগের কথা। আমি ছাড়া চারজন ফরেনার, বাকি সবাই ইন্ডিয়ান। যে ইন্ডি-য়ানদের কথা বলছি তাঁরা কলকাতাতেই থাকেন।

সুচিত্রা স্থির চোখে পরমেশকে লক্ষ্য করেছিল। সে বলে, 'যে ক'জন কলকাতায় আছেন তাঁদের সঙ্গে অ্যাডপ্ট করার পর আর দেখা হয়েছিল?'

পরমেশ খানিক চিন্তা করে বলেন, 'লেক গার্ডেনসের মন্মথবাবুর আর ভবানীপুরের সঞ্জীবনবাবুর সঙ্গে প্রায়ই ফোনে কথা হয়। অবশ্য এখন ওঁরা কলকাতায় নেই। প্রতাপচাঁদবাবু কখনও ফোন টোন করেননি। তবে কিছুদিন আগে আমাদের বাড়ি একবার এসেছিলেন।'

সমরেশ এবং সুচিত্রা চকিত হয়ে ওঠে। সুচিত্রা সতর্ক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, 'কেন এসেছিলেন? কোনো দরকারে?'

'দরকারটা তেমন কিছু নয়। অ্যাডপসানের দিন অনাথ আশ্রমে দু-একটার বেশি কথা হয়নি, তাই ভাল করে আলাপ করতে এসেছিলেন। আর একটা ফোটো চেয়ে নিয়ে গেলেন।'

'যে গ্রুপ ফোটোটা অ্যাডপসানের দিন তোলা হয়েছিল তার কপিটা তো?'

অপরিসীম বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন পরমেশ। তারপর বলেন, 'আপনারা জানলেন কী করে?'

সুচিত্রা বলে, 'আমরা জানি। ইন ফ্যাক্ট ওই ফোটোটার জন্যেই আমরা আপনার কাছে এসেছি।'

'কিন্তু—'

'বলুন।'

'প্রতাপচাঁদবাবু ছবিটা চেয়ে নিয়ে গেছেন। বললেন, তাঁর নিজের ফটোটা হারিয়ে গেছে। আমার ফোটোটার একটা কপি করিয়ে ফেরত দিয়ে যাবেন।'

সুচিত্রা বলে, 'কিন্তু দিয়ে যাননি, তাই ত?'

বিভ্রান্তের মতো পরমেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ।'

'ওটা আর কোনদিনই ফেরত পাবেন না।'

'মানে?'

'আপনি বোধহয় জানেন না, ওই ছবির একটা কপি অনাথ আশ্রমে ছিল, সেটা চুরি গেছে। সঞ্জীবনবাবু আর মন্মথবাবু কলকাতায় ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলে শুনবেন, ওঁদের ফোটোও হয় চুরি গেছে, নইলে প্রতাপচাঁদবাবু নিয়ে গেছেন।'

পরমেশ কী বলবেন ভেবে পান না, সুচিত্রাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন শুধু। অনেকক্ষণ পর বলেন, 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝে উঠতে পারছিনা।'

'কী?'

'ওই সামান্য একটা ছবি নিয়ে প্রতাপচাঁদবাবুর কী লাভ?'

সুচিত্রা সোজাসুজি পরমেশের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন নিশানাথবাবুকে কেউ খুন করেছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' পরমেশ বলতে থাকেন, 'খবরটা পেয়ে মন এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে কী বলব! অমন একজন গ্রেট পার্সন! আমরা ওঁর আশ্রমেও গিয়েছিলাম। কিন্তু ছবির ব্যাপারটা—'

নিজেদের মধ্যে যা আলোচনা করেছে সেটাই বলে সুচিত্রা। অর্থাৎ ওই গ্রুপ ফোটোটায় যারা আছে তাদের কেউ নিজের আইডেনটিটি নিশ্চিহ্ন করতে চায়।

পরমেশের চোখেমুখে টেনসান দেখা দেয়। তিনি বলেন, 'তার মানে প্রতাপচাঁদকে আপনারা সন্দেহ করছেন—'

'ঠিক ওভাবে বলবেন না। আমরা ট্রুথকে খোঁজার চেষ্টা করছি। একটা লোক কেন ছবি নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না, সেটা জানা দরকার।' যাই হোক, প্রতাপচাঁদবাবুর ঠিকানা আর ফোন নম্বর আপনার কাছে আছে

আশা করি।'

একটু অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন পরমেশ। বলেন, 'ভদ্রলোক বেলেঘাটার দিকে থাকেন, এর বেশি আর বলতে পারব না। মানে ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা নিয়ে রাখিনি। আসলে কোনোরকম সন্দেহ টন্দেহ—' বলতে বলতে তিনি থেমে যান।

সমরেশ বলে, 'খুব স্বাভাবিক। একটা ছবি নিয়েছে বলে কি কাউকে সন্দেহ করা যায়! যদি প্রতাপচাঁদ ছবিটা সত্যিই ফেরত দিতে আসেন কিংবা কোনোভাবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে, কাইন্ডলি আমাদের জানাবেন।' বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে পরমেশকে দেয়, 'আমার নাম-ঠিকানা আর ফোন নাম্বার রইল।'

পরমেশ বলেন, 'আচ্ছা—'

'আরেকটা অনুরোধ করব'।'

'বলুন।'

'আপনি যে ছেলেটিকে অ্যাডপ্ট করেছেন, তাকে একবার যদি ডাকান—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—'

পরমেশ উঠে পড়েন। মিনিট দুই পর একটি বার তের বছরের ছেলেকে সঙ্গে করে ফিরে আসেন। বলেন, 'এই যে, একেই নিশানাথ-বাবুদের ওখান থেকে নিয়ে এসেছি।'

শ্যামলা রঙের সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ছেলেটির পরনে দামী প্যাণ্ট আর শার্ট, পায়ে স্লিপার। সে যে আরামে এবং আনন্দে আছে, দেখামাত্র টের পাওয়া যায়। সমরেশ তাকে কাছে বসিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম তো হারু।'

ছেলেটি মাথা হেলিয়ে আধফোটা গলায় বলে, 'হ্যাঁ।'

'বিশুকে তুমি চিনতে?'

অচেনা লোকজন দেখে একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে হারু, সেই সঙ্গে খানিকটা নার্ভাসও। সে ভীরু চোখে পরমেশের দিকে তাকায়।

পরমেশ ভরসা দেবার ভঙ্গিতে বলেন, 'কোনো ভয় নেই। ওঁরা যা জিজ্ঞেস করছেন, তার উত্তর দাও।'

হারু জানায়, সে বিশুকে শুধু চিনত না, অনাথ আশ্রমে একই ঘরে থাকত।

সমরেশ বলে, 'তা হলে তোমরা খুব বন্ধু।'

'হ্যাঁ।'

'কেমন ছেলে ছিল বিশু?'

'খুব ভাল।'

'তুমি তাকে কবে দেখেছ?'

'যেদিন আশ্রম থেকে আমরা মা-বাবার সঙ্গে চলে এলাম সেদিন।'

'তারপর আর দেখা হয়নি?'

'না।'

'প্রতাপচাঁদবাবু একদিন এ বাড়িতে এসেছিলেন, তুমি কি তা জানো?'

কথা বলতে বলতে আড়ষ্টতা অনেকখানিই কেটে গিয়েছিল হারুর। সে বলে, 'জানি।'

সমরেশ বলে, 'সেদিন কি বিশুকে সঙ্গে করে এনেছিলেন?'

'না। আমি বলেছিলাম, বিশুকে যেন পরে একদিন নিয়ে আসেন। উনি বলেছিলেন, খুব শীগগিরই আনবেন।'

এই সময় পরমেশ বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হারু বলেছিল। আমিও বলেছিলাম।'

সমরেশ একটু ভেবে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার যখন এত বন্ধু, বিশু নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে ফোন করত।'

'না।'

'তুমিও করতে না?'

'আমি ফোন করতে জানতাম না, কিছুদিন হল শিখেছি। তবে বিশুদের ফোন নাম্বার তো জানি না, তাই—'

'ঠিক আছে হারুবাবু, তুমি এখন যেতে পার।' বলে পরমেশের দিকে তাকায় সমরেশ, 'আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম। এবার উঠি।'

পরমেশ ব্যস্তভাবে বলেন, 'না না, বিরক্ত করা আবার কী? ছবিটা দিতে পারলে খুশি হতাম।'

সমরেশদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যান পরমেশ। সমরেশ বলে, 'দরকার হলে আবার কিন্তু আসব।'

'যখন ইচ্ছে আসবেন।'

দক্ষিণেশ্বর থেকে বাগবাজার। রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে অখিলবন্ধু

সাহাকে খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না।

অখিলবন্ধুর বয়স চৌষট্টি পঁয়ষট্টি। পরনে ধুতি আর হাফহাতা পাঞ্জাবি, গলায় কণ্ঠি, এবং কপালে ও কানের লতিতে চন্দনের ছাপ। ভদ্রলোক আদ্যোপান্ত বৈষ্ণব।

কথায় বার্তায় অখিলবন্ধু চমৎকার। সারাক্ষণ বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ে নত হয়ে আছেন। বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের মালপো ভোগ না খাইয়ে তিনি কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে রাজী হলেন না।

খাওয়া দাওয়ার পর অখিলবন্ধু যা জানালেন তা এই রকম। তাঁর পরিবার খুবই ছোট। স্বামী আর স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই তাঁদের। একটি ছেলে ছিল, অল্প বয়সে মারা গেছে। তাঁর বা তাঁর স্ত্রীর দিকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন বলতেও কেউ নেই। এদিকে রাধাগোবিন্দজির কৃপায় কলকাতায় তাঁদের তিনখানা বড় বাড়ি, মোটা ব্যাংক ব্যালান্স এবং ফিক্সড ডিপোজিট আর কয়েক লাখ টাকার কোম্পানির শেয়ার রয়েছে। তাঁদের মৃত্যুর পর এই বিশাল সম্পত্তি বেওয়ারিশ হয়ে যাবে। অবশ্য উইল করে কোনো সেবা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা জনহিতকর অন্য কোনো সংস্থাকে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে ব্যাপারে আদৌ আগ্রহ নেই অখিলবন্ধুর। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বংশটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হবে, এটা তিনি চান না। তাই অনাথ-আশ্রম থেকে একটি ছেলেকে এনে যাগযজ্ঞ করে তাকে গোত্রান্তরিত করেছেন, তার নামের সঙ্গে নিজেদের পদবীটি যুক্ত করেছেন যাতে তাঁর বংশটি লোপ না পায়।

অখিলবন্ধুর কাছ থেকে জানা যায়, আশ্রম থেকে অ্যাডপসানের দিনের একটা গ্রুপ ফোটো তাঁকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু দিনকয়েক আগে, নিশানাথের মৃত্যু তখনও হয়নি, প্রতাপচাঁদ বাজোরিয়া এসে সেটি চেয়ে নিয়ে যান।

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'নেবার সময় কী বলেছিলেন প্রতাপচাঁদ ?'

অখিলবন্ধু বলেন, 'কয়েকদিন বাদে ছবিটা কপি করিয়ে ফেরত দিয়ে যাবেন।'

অর্থাৎ পরমেশের কাছ থেকে প্রতাপচাঁদ যে কৌশলে ফোটোটা বাগিয়ে ছিলেন ঠিক সেই ভাবেই অখিলবন্ধুর কাছ থেকেও নিয়ে গেছেন। সমরেশ বলে, 'ফোটোটা ফিরিয়ে দেয়নি নিশ্চয়ই।'

অখিলবন্ধু বলে, 'না। কিছু গোলমাল আছে নাকি ?'

'হ্যাঁ। পরে সব জানতে পারবেন। আচ্ছা যে ছেলেটিকে আপনারা দত্তক নিয়েছেন তার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি ?'

'অবশ্যই। এক্ষুণি ডেকে আনছি।'

কিছুক্ষণের ভেতর একটা পনের ষোল বছরের ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন অখিলবন্ধু, 'এই যে—এর নাম গৌর।'

গৌরকে দেখে বোঝা যায় সে বেশ সুখেই আছে। তার কাছ থেকে জানা যায়, বিশুর সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্ব না থাকলেও তাকে সে ভাল করেই চিনত। না, এক ঘরে তারা থাকত না, এমন কি এক বাড়িতেও না। আশ্রমে ছেলেদের থাকার জন্য ছিল মোট চারখানা বাড়ি। শান্তিভবন, আনন্দভবন, শ্রীভবন, কল্যাণভবন। শান্তিভবনে থাকত গৌর আর শ্রীভবনে বিশু।

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'কেমন ছেলে ছিল বিশু ?'

'খুব ভাল। ক্লাসে ফার্স্ট সেকেণ্ড হত। দারুণ ফুটবল খেলত। ছবি আঁকতে পারত, আশ্রমের কোনো ফাংসান হলে ওকে দিয়ে গানও গাওয়ানো হত। ভারি সুন্দর গলা ছিল বিশুর।

একটু চুপচাপ।

তারপর সমরেশ একটু ভেবে বলে, 'তুমি যেদিন এখানে তোমার নতুন মা-বাবার কাছে এলে সেদিন বিশুও তার নতুন মা-বাবার কাছে যায়। মনে আছে ?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় হেলিয়ে দেয় গৌর।

'ও যার সঙ্গে গিয়েছিল তার নাম জানো ?'

'জানি। প্রতাপচাঁদ বাজোরিয়া। ক'দিন আগে এ বাড়িতে এসেছিলেন।'

'কেন এসেছিলেন জানো ?'

'না।'

সমরেশ বুঝতে পারে, গ্রুপ ফোটোটার ব্যাপারে অখিলবন্ধু গৌরকে কিছু বলেননি। সে গৌরের চোখের দিকে তাকিয়ে এবার প্রশ্ন করে, 'তোমাদের এ বাড়িতে টেলিফোন আছে ?'

প্রথমটা হকচকিয়ে যায় গৌর। প্রতাপচাঁদ এবং বিশুর সঙ্গে ফোনের সম্পর্কটা কী, ধরতে না পেরে রীতিমত অবাক হয়েই বলে, 'আছে।'

'বিশু কি তোমাকে কখনও ফোন করেছে ?'

সমরেশের এই প্রশ্নটায় বিস্ময় কেটে যায় গৌরের। ফোনের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেবার কারণটা এবার পরিষ্কার হয়ে যায়। সে বলে, 'না।'

সমরেশ বলে, 'তুমিও কি কখনও ফোন করেছিলে?'

'না। আমি বিশুর ফোন নম্বর জানি না।'

আরো কিছুক্ষণ কথা বলে উঠে পড়ে সমরেশরা।

পনেরো

বাগবাজার থেকে এবার সোজা বেলেঘাটায়।

রমানাথ আঢ্য রোডের বিশাল কমপাউণ্ডওলা ছিমছাম দোতলা বাড়িটার সামনে এসে সমরেশ আর সুচিত্রা যখন নামে, চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

পুরনো বেলেঘাটার ঘিঞ্জি, নোংরা বস্তি ভেঙে যে ঝকঝকে টাউনশিপ তৈরি হয়েছে, রমানাথ আঢ্য রোড তার ভেতরেই পড়ে। এখান থেকে যেদিকেই তাকানো যাক, নতুন নতুন আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি। অ্যাসফাল্টের চকচকে চওড়া অনেকগুলো রাস্তা রমানাথ আঢ্য রোড থেকে বেরিয়ে নানা দিকে চলে গেছে। প্রতিটি রাস্তার দু'ধারে বিরাট বিরাট গাছ ডালপালা মেলে অকাতরে ছায়া বিলিয়ে যাচ্ছে।

উঁচু, জবরদস্ত লোহার গেটের সামনে একটা নেপালী দারোয়ান টুলের ওপর বসেছিল। সমরেশদের দেখে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায়।

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'এটা কি বাইশ নম্বর বাড়ি?'

দারোয়ান ঘাড় হেলিয়ে দেয়, 'জি—'

'প্রতাপচাঁদজি বাড়ি আছেন?'

'নেহী—'

'আর কেউ আছেন?'

'নেহীঁ—'

'সবাই বেরিয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। বিশ রোজ হো চুকা—'

'কলকাতার বাইরে গেছেন?'

'মালুম নেহী—'

'কবে ফিরবেন, বলে গেছেন ?'

'নেহী লোটেগা।'

সমরেশ এবং সুচিত্রা চমকে ওঠে। সমরেশ বলে, 'মতলব ?'

দারোয়ান এবার যা জানায় তা এইরকম। প্রতাপচাঁদ বাজোরিয়া এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গেছেন, এখানে ফেরার সম্ভাবনা আর নেই।

সমরেশ কী বলবে, ভেবে পায় না। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

সুচিত্রা মেয়ে হলেও একজন তুখোড় ল'ইয়ার। এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটাই সে করে, 'বাড়ি বিক্রি করে গেছেন ?'

'নেহী—'

'তবে ?'

দারোয়ান জানায়, এই বাড়িটা প্রতাপচাঁদের নয়, সে এখানে ভাড়ায় থাকত।

সুচিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'বাড়ির মালিক কে ?'

রাস্তার মোড়ে একটা বড় বাড়ি দেখিয়ে দারোয়ান জানায়, 'লাহিড়ী সাব, ওহী কোঠিমে রহতা হ্যায়।'

লাহিড়ী সাব অর্থাৎ মথুরানাথ লাহিড়ীর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। এই বয়সেও টান টান, সতেজ চেহারা। চামড়া কিছু শিথিল হয়ে গেলেও এখনও টকটকে রং। কলকাতায় তাঁদের তিন পুরুষের স্টিভেডরি ব্যবসা। ঠাকুরদা এবং বাবা অঢেল পয়সা করেছেন, তাছাড়া রয়েছে প্রচুর ল্যান্ড প্রোপার্টি। বাড়িই কম করে রয়েছে বারোটা। আদি বাড়িটা ছাড়া বাকিগুলো ভাড়া দিয়েছেন। এ বাবদে যা আয় হয় তা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো।

মথুরানাথের কাছ থেকে জানা গেল, মাস দশেক আগে তাঁর রমানাথ আঢ্য রোডের বাইশ নম্বর বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন প্রতাপচাঁদ। ওদের ছোট ফ্যামিলি। স্বামী আর স্ত্রী। লোকটি অত্যন্ত বিনয়ী আর অমায়িক। কথায় বার্তায় এবং ব্যবহারে চমৎকার। প্রতি মাসের এক তারিখে নিজে এসে ভাড়া দিয়ে যেতেন। তাছাড়া আরো একটা বড় গুণ

ছিল তাঁর। বিপদে আপদে পাড়ার লোকেরা তার কাছে গেলে খালি হাতে ফিরত না।

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'প্রতাপচাঁদ যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন আপনাকে জানিয়ে গেছে ?'

মথুরানাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই। শর্ত অনুযায়ী একমাস আগে আমাকে নোটিশ দিয়েছিলেন। ইন ফ্যাক্ট এমন একটি ভাল ভাড়াটে চলে যাওয়ায় বলতে পারেন মনটা আমার খারাপই হয়ে গেছে।'

'কী করতেন প্রতাপচাঁদ ?'

'শুনেছি, বড়বাজারে কাপড়ের বিরাট বিজনেস আছে। বম্বে, মাদ্রাজের বিরাট বিরাট টেক্সটাইল কোম্পানির ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ার ডিলার ছিলেন প্রতাপচাঁদ।'

'ওঁর বড় বাজারের ঠিকানাটা দিতে পারেন ?'

এবার একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন মথুরানাথ। বলেন, 'না, মানে ওটা রাখা হয়নি। প্রতাপচাঁদ যা বলেছেন তাই বিশ্বাস করেছিলাম। মনে হচ্ছে কিছু গোলমাল আছে!'

—'আছে। আমার ধারণা ওই ধরনের কোনো বিজনেস নেই প্রতাপ-চাঁদের।'

'কিন্তু—'

'না না—' হাত তুলে সমরেশ বলে, 'আপনার কোনো ত্রুটি হয়নি। অকারণে কে আর কাকে সন্দেহ করে ? বিশেষ করে যে লোকের কথা-বার্তা এবং ব্যবহার এত ভাল তাকে কে অবিশ্বাস করবে ?'

[illegible]াপ।

তারপর সমরেশ ফের শুরু করে, 'আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন প্রতাপচাঁদ একটি ছেলেকে অ্যাডপ্ট করেছেন ?'

মথুরানাথ বলে 'জানি বৈকি। ওঁরা নিঃসন্তান। ছেলেপুলে হবার কোনো সম্ভাবনাই ওঁদের নেই, তাই তো বিশু বলে একটা ছেলেকে দত্তক নিয়ে এলেন কী এক আশ্রম থেকে। এই নিয়ে ক'দিন কী ধুমধামই না চলল! পাড়ার লোকদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ান, যাকে বলে ভুরি-ভোজ।'

'বিশুকে আপনি তা হলে দেখেছেন ?'

'কী আশ্চর্য, যার জন্যে নেমন্তন্ন খেলাম তাকে দেখব না! শুধু ও

বাড়িতেই না, আমাদের এই বাড়িতেও বিশুকে তিন চার দিন নিয়ে এসেছিলেন প্রতাপচাঁদ।'

সমরেশ কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুচিত্রা প্রশ্ন করে, 'বিশুকে আপনি শেষ কবে দেখেছেন?'

খানিক চিন্তা করে মথুরানাথ বলেন, 'তা ঠিক মনে নেই। তবে যতদূর মনে পড়ছে তিন চার মাস আগে।'

'প্রতাপচাঁদেব সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছে, মনে পড়ে?'

'এই তো সেদিন। ধরুন দিন কুড়ি আগে। বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে দেখা করতে এসেছিল।'

'বিশুকে শেষ যে দেখেছিলেন তারপর কি সে ও বাড়িতে ছিল?'

'তা তো বলতে পারব না। নিজের কাজকর্ম নিয়ে আমাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্য কোনো দিকে নজর দিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়।'

'সে তো বটেই। আচ্ছা—'

'বলুন—'

'বিশুকে দত্তক নেবার পর আপনার ফ্যামিলি ছাড়া পাড়ার আর যাদের যাদের প্রতাপচাঁদ নেমন্তন্ন করেছিল তাদের ঠিকানাগুলো যদি দেন—'

'নিশ্চয়ই।' বলে কয়েকজনের নাম ঠিকানা দিলেন মথুরানাথ। তারপর বলেন, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারছি না।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'কোন ব্যাপারটা?'

'বিশু সম্পর্কে এত খোঁজখবর নিচ্ছেন কেন?'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন ফেমাস সোসাল ওয়ার্কার নিশানাথ সামন্তকে মার্ডার করা হয়েছে।'

'জানি বৈকি। রোজই খবরের কাগজে এই নিয়ে রিপোর্ট বেরুচ্ছে।'

'আমাদের ধারণা বিশুর সঙ্গে এই মার্ডারের সম্পর্ক রয়েছে।'

মথুরানাথ চকিত হয়ে ওঠেন, 'কিরকম?'

সমরেশ বলে, 'সেটাই আমরা বার করতে চেষ্টা করছি। আজ আমরা উঠি। পরে দরকার হলে আবার আসব।'

'অলওয়েজ ওয়েলকাম—'

সমরেশ তার নাম-ঠিকানাওলা একখানা কার্ড মথুরানাথকে দিয়ে

বলে, 'এটা আপনার কাছে রইল। বিশু বা প্রতাপচাঁদের যদি খবর পান, দয়া করে তক্ষুণি আমাকে একটা ফোন করে দেবেন।'

মথুরানাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমরেশরা রাস্তায় নামে।

সুচিত্রা বলে, 'এতটা ছোটাছুটি একেবারে মীনিংলেস হয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে প্রতাপচাঁদ লোকটা অসম্ভব ধূর্ত।'

সমরেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হুঁ—'

'নিজের সবরকম ট্রেস মুছে দিয়ে সে ভ্যানিস হয়ে গেছে।'

'হুঁ।'

'দা কেস ইজ অ্যাবসোলুটলি হোপলেস। ওকে আর ধরা যাবে বলে মনে হয় না।'

'দেখা যাক।'

সুচিত্রা ঘড়ি দেখে জিজ্ঞেস করে, 'এখন কী করবি?'

সমরেশ বলে, 'প্রতাপচাঁদ সম্পর্কে আরেকটু খোঁজখবর নিয়ে যাই।'

একটু অবাক হয়েই সুচিত্রা বলে, 'কোথায় খোঁজখবর নিতে যাবি?'

'এই পাড়াতেই। বিশুকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর পাড়ার কিছু লোককে ডেকে প্রতাপচাঁদ ভোজ খাইয়েছিল না?'

'ও, এই জন্যেই তাঁদের নাম-ঠিকানা নিয়েছিলি?'

'একজাক্টলি। দেখি ওঁদের সঙ্গে কথা বলে, যদি কিছু ক্লু পাওয়া যায়।'

প্রতাপচাঁদের ভোজে এ পাড়ার মোট সাতজন নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এঁরা সবাই বিশিষ্ট মানুষ। বেলেঘাটার লোকজন তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।

সাতজনের সকলকে পাওয়া গেল না। তিনজন সকালের দিকে বেরিয়ে গেছেন, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। বাকি চারজনের সঙ্গে কথা বলে তেমন কিছুই জানা গেল না। মথুরানাথের মতো এঁরাও প্রতাপচাঁদ সম্পর্কে ঢালাও সার্টিফিকেট দিলেন। এমন ভদ্র, নম্র, সহৃদয় মানুষ নাকি হয় না।

শুধু চারজনকেই না, রমানাথ আঢ্য রোডে চায়ের দোকান, স্টেশনারি দোকান, ইউথ ক্লাব, ইত্যাদি নানা জায়গায় গিয়ে টের পাওয়া গেল প্রতাপ-চাঁদ এ অঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয়। পয়সাওলা লোক হলেও কোনোরকম

অহঙ্কার ছিল না। মেলামেশার ব্যাপারে কোনোরকম বাছবিচার ছিল না। যেচে সবার সঙ্গে আলাপ করতেন, তাঁর ব্যবহার ছিল আন্তরিক। বিপদে আপদে সে পাশে এসে দাঁড়াত। কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, স্কুলে কারো ছেলের মাইনে বাকি পড়েছে কিংবা কারো মা-বাবার চিকিৎসা হচ্ছে না—এ জাতীয় আর্জি নিয়ে গেলে প্রতাপচাঁদ কাউকেই ফেরাতেন না। ইউথ ক্লাবকে কত টাকা যে দিয়েছেন তার হিসেব নেই।

নানা জায়গায় ঘুরে, অজস্র মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত আটটা বেজে যায়। এখন চারিদিক আলোয় ঝলমল করছে।

এবার ফেরার পালা।

ব্যাক সীটে পাশাপাশি বসেছে সুচিত্রা আর সমরেশ। শোফার স্নায়ু টান টান করে অগুনতি বাস, অটো, ট্রাক আর প্রাইভেট কারের ভেতর দিয়ে তাদের গাড়িটাকে ছুটিয়ে চলেছে।

সুচিত্রা বলে, 'প্রতাপচাঁদ লোকটা কেমন ঠিক বুঝতে পারছি না। কেউ তো ওর বিরুদ্ধে কিছু বলল না। লোকের কাছে দারুণ ইমেজ তৈরি করে রেখেছে।'

'হুঁ—' অন্যমনস্কর মতো সমরেশ বলে, 'কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন?'

'কোন কথা?'

'প্রতাপচাঁদ কিন্তু দু'জনের কাছ থেকে ছবি নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয়নি।'

'তা দেয়নি। কিন্তু—'

'তোর মনে একটা খটকা থেকে যাচ্ছে। ভাবছিস, যাকে লোকে এত ভাল ভাল সার্টিফিকেট দিচ্ছে তার পক্ষে খারাপ কিছু করা সম্ভব নয়। তাই না রে?'

সুচিত্রা চুপ করে থাকে।

সমরেশ এবার বলে, 'কিন্তু একটা ব্যাপার ভুললে চলবে না।'

'যেমন?'

'এত বড় বড় সব সেনসেসানাল কাণ্ড ঘটে গেল, নিশানাথবাবু খুন হলেন, জয়তীকে মার্ডার করার জন্যে লোক লাগানো হল, কাগজে এত লেখালিখি হচ্ছে কিন্তু প্রতাপচাঁদের পাত্তা নেই। সে যদি পরিষ্কার লোক হয় তার তো প্রথমেই এগিয়ে আসা উচিত ছিল।'

এদিকটা খেয়াল ছিল না সুচিত্রার। সে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

সমরেশ থামেনি, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানিস, থার্ড ক্লাস ক্রিমিনালদের চট করে চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু ঘুঘু ক্রিমিনালদের ধরা মুশকিল। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে তারা দুটো ইমেজ তৈরি করে রাখে। একটা ভাল, আরেকটা খারাপ। জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড। আমার কোনো সন্দেহই নেই প্রতাপচাঁদই হচ্ছে নাটের গুরু। তাকে ধরতেই হবে।'

সুচিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'ধরবি কী করে? কোথাও নিজের কোনো চিহ্নই তো সে রেখে যায়নি।'

'সেটা ঠিক কিন্তু জয়তী এখনও বেঁচে আছে, আর সে যতদিন আছে প্রতাপচাঁদ একেবারেই সেফ নয়। জয়তী তাকে সহজে ছাড়বে না। তাই ওর লাইফের ওপর আবার অ্যাটেম্পট হবে। আমাদের সবার চোখ কান খোলা রাখতে হবে। জয়তীকে সামনে রেখে আমাদের ফাঁদ পাততে হবে। অবশ্য তার আগে—'বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় সমরেশ।

উৎসুক সুরে সুচিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'তার আগে কী?'

'জয়তীর সেফটির জন্যে কিছু একটা করতে হবে। তাপস পরশু বলছিল চার পাঁচ দিন পর ওকে কোর্টে প্রোডউস করবে, আর সেদিনই ওকে জামিন দেওয়া হবে।'

'হুঁ।'

'কিন্তু কোর্টে তোকে একটা আপিল করতে হবে।'

'কিসের আপিল?'

'নিরাপত্তার জন্যে আরো কিছুদিন যেন জয়তীকে পুলিশ কাস্টডিতে রাখা হয়।'

'তা না হয় রাখা হবে, কিন্তু—' বলতে বলতে চুপ করে যায় সুচিত্রা।

সমরেশ বলে, 'কিন্তু কী?'

'চিরকাল তো আর জয়তীকে পুলিশের পাহারায় রাখা যাবে না।'

ঠিক। সেদিন তোকে বলেছিলাম আমি জয়তীর ফিউচার নিয়ে কিছু ভেবেছি। কিন্তু চট করে তা করা সম্ভব নয়। যতদিন না করতে পারছি, পুলিশের জিম্মায় ওকে রাখতেই হবে।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় সমরেশের, 'আরে, তুইও তো ওর সম্বন্ধে কী একটা প্ল্যান

করেছিস—'

'হ্যাঁ।' বলে জানালার বাইরে মুখ ফেরায় সুচিত্রা। অন্যমনস্কের মতো রাস্তার নানা দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সেদিনও জয়তী সম্পর্কে তার পরিকল্পনার কথা জানায়নি সুচিত্রা, আজও চুপ করে থাকে। অবশ্য জয়তীর ভবিষ্যৎ নিয়ে সে যা ভেবেছে তা-ও সুচিত্রাকে বলেনি সমরেশ। কয়েক পলক সুচিত্রাকে লক্ষ্য করে সে, তবে আর কোনো প্রশ্ন করে না।

একসময় গাড়ি শিয়ালদা স্টেশন ডাইনে রেখে ফ্লাই-ওভারের ওপর দিয়ে মৌলালির কাছে চলে আসে।

জানালার বাইরে চোখ রেখেই সুচিত্রা হঠাৎ বলে, 'এখন অফিসে যাবি তো?'

সমরেশ বলে 'হ্যাঁ। বেশিক্ষণ থাকব না, কালকের জন্য একটা স্টোরি লিখেই বাড়ি চলে যাব।'

'আমার আজ কোনো কাজ নেই। বলিস তো তোর অফিসে গিয়ে ওয়েট করতে পারি। লেখা হয়ে গেলে তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাব।'

'না না, সারাদিন প্রচন্ড ছোটাছুটি গেছে। এখন আর তোকে আমার জন্যে আটকে থাকতে হবে না। আমাকে অফিসের সামনে নামিয়ে দিয়ে স্ট্রেট বাড়ি চলে যা।'

সুচিত্রা দৈনিক মহাভারত-এর অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করার কথা বলেছিল বটে, কিন্তু অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করছে সে। সেই সকাল থেকে এত জায়গায় ঘোরাঘুরি, এত লোকের সঙ্গে কথা বলা—এ সব অভ্যাস নেই তার। কপালের দু'ধারে শিরাগুলো সমানে দপ দপ করছে। গলার কাছটা ভার ভার, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে।

সুচিত্রা বলে, 'ঠিক আছে।'

ষোল

আরো দু'টো দিন কেটে যায়।

এর মধ্যে তাপস নিশানাথ সামন্তর চ্যারিটেবল হেলথ সেন্টারে হানা দিয়ে তাঁর কুড়িখানা ডায়েরি নিয়ে এসেছে। ফি বছরের জন্য একখানা করে ডায়েরি। রোজ দিনলিপি লেখার অভ্যাস ছিল তাঁর। ভোর থেকে রাত সাড়ে দশটায় শুতে যাবার আগে পর্যন্ত প্রতিদিন তিনি যা করতেন,

যাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হত, সব সংক্ষেপে লিখে রাখতেন।

এ বছরের ডায়েরিতে মাস ছয়েক আগে প্রতাপচাঁদের নাম প্রথম পাওয়া গেছে। তারপর প্রায় রোজই এ নামটা চোখে পড়েছে। গোড়ার দিকে বিশুকে প্রতাপচাঁদের হাতে দত্তক দিয়ে খুশি হয়েছিলেন নিশানাথ। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ছেলেটা সুখে থাকবে, মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে। কিছু দিন পরে এই বিশ্বাসের ভিতটা আলগা হয়ে যেতে শুরু করছিল। যারা আশ্রম থেকে ছেলেদের দত্তক নেয়, তাদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। যে ছেলেরা কলকাতায় থাকে মাঝে মাঝে তাদের গিয়ে দেখেও আসেন। অবশ্য নতুন মা-বাবাদের সঙ্গে তারাও আশ্রমে এসে দেখা করে যায়। আর যারা বাইরে চলে যায় তাদের চিঠি লেখা ছাড়া উপায় নেই।

এতদিন অনাথ আশ্রম থেকে বহু ছেলেকে নানা মানুষ দত্তক নিয়ে গেছে। কখনও গোলমাল হয়নি। প্রতাপচাঁদ আর বিশুর ব্যাপারেও কোনো খিঁচ ছিল না, কিন্তু মাস তিনেক আগে থেকে প্রতাপচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফোন করলে তাকে পাওয়া যেত না। বেলেঘাটায় তার বাড়িতে গেলে দেখা হত না। দারোয়ান বলত বাজোরিয়া সাহেব নেই, কখন ফিরবেন জানি না। বিশুর কথা জিজ্ঞেস করলে বলত, সে-ও বাজোরিয়া সাহেবের সঙ্গে বাইরে গেছে। প্রতাপচাঁদের সঙ্গেই সে ফিরবে।

দিনের পর দিন বেলেঘাটায় ছোটাছুটি করেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছিল না। বিশুর জন্য দুশ্চিন্তা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। ভাল করে খেতে পারতেন না নিশানাথ, সারারাত ঘুমোতে পারতেন না, ঘরময় অস্থির-ভাবে পায়চারি করে বেড়াতেন।

বিশুকে যখন প্রতাপচাঁদ দত্তক নেয়, জয়তী কলকাতায় ছিল না। সে ফিরে এসে ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য নিশানাথকে ধরল। নিশানাথ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেই জানেন না, বেলে-ঘাটার বাড়ি ছেড়ে বিশুকে নিয়ে প্রতাপচাঁদ কোথায় উধাও হয়েছে। প্রথম দিকে আজ না কাল নিয়ে যাব—এই করে করে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দিলেন আর উদ্‌ভ্রান্তের মতো শহরের এক মাথা আরেক মাথায় গোপনে বিশুর খোঁজে ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু বৃথাই। কোথাও বিশুর হদিশ নেই।

এক-একবার নিশানাথের মনে হত, জয়তীকে সব খুলে বলবেন কিন্তু সাহস হত না। তিনি জানতেন, এই ভাইটা ছাড়া আর কেউ নেই জয়তীর। সমস্ত শোনার পর তার কী প্রতিক্রিয়া হবে, ভাবতেও বুকের ভেতরটা আমূল কেঁপে যেত।

নিশানাথ একসময় জয়তীর কাছে ছিল ঈশ্বরের মতো। তাঁর প্রতিটি কথা চোখ বুজে বিশ্বাস করত সে। নিজের মা-বাবাকে বাদ দিলে এমন নির্ভরতা আর কারো ওপর ছিল না। সেই নিশানাথকে ঘৃণা আর সন্দেহ করতে শুরু করেছিল জয়তী। তার মনে হয়েছিল নিশানাথ বিশুকে অনেক টাকা নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল জয়তী। তার চোখে যে আগুন দেখা গিয়েছিল তাতে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন নিশানাথ। শেষ দিকে তিনি আর জয়তীর সঙ্গে দেখা করতেন না।

ডায়েরিতে এই পর্যন্তই লেখা আছে। তারপর কী হয়েছে সে তো সারা দেশ জানে।

এখন এটা পরিষ্কার, এমন ভয়ংকর চাঞ্চল্যকর ঘটনা যে ঘটে গেছে তারজন্য দায়ী প্রতাপচাঁদ। তাপসরা তাকে খুঁজে বার করার জন্য সারা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলেছে।

এদিকে সমরেশ রোজ দু'বার করে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে জয়তীকে দেখে এসেছে। জয়তী এখন অনেকটা সুস্থ।

হাসপাতালে যাওয়া ছাড়া রোজকার রুটিন অনুযায়ী অফিসে যাচ্ছে সমরেশ, কপি লিখছে, তারপর বেশ রাত করে বাড়ি ফিরে আসছে।

আগে বিছানায় শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ত সমরেশ কিন্তু আট বছর বাদে জয়তীকে পুলিশ হাজতে দেখার পর সহজে ঘুম আসে না। বিশেষ করে তাকে খুন করার যে চক্রান্ত হয়েছিল, এই ঘটনাটা সমরেশকে সর্বক্ষণ আতঙ্কিত করে রাখে। দিনের বেলাটা নানা কাজকর্ম এবং লোকজনের মধ্যে কেটে যায় কিন্তু রাতে সমস্ত শহর যখন নিঝুম হয়ে যায়, একা একা শুয়ে থাকতে থাকতে তার শ্বাস আটকে আসে।

আজ অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে পৌনে এগারটা বেজে গিয়েছিল। চটপট হাতমুখ ধুয়ে টিভি চালিয়ে খেয়ে নিয়েছে সমরেশ। মা হালকা ধরনের ঘুমের ওষুধ খেয়ে দশটা নাগাদ শুয়ে পড়েন। এই সময়টা

তাঁকে পাওয়া যায় না।

খেতে খেতে সেকেন্ড চ্যানেলে শেষ বাংলা খবরটা শোনার পর তবে শুতে যায় সমরেশ। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। শোওয়ার পর কিছুক্ষণ ম্যাগাজিন ট্যাগাজিন উল্টে পাল্টে দেখল সে। দেখলই শুধু, ছবি বা ছাপার অক্ষরগুলো কিছুই মাথায় ঢুকল না।

একসময় আস্তে আস্তে উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায় সমরেশ। মধ্যরাতের নিঝুম শহরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কর মতো একটা সিগারেট ধরাতে যাবে, হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে।

একটু অবাকই হয় সমরেশ। এত রাতে কে ফোন করতে পারে? অফিস থেকে ভবতোষদা কিংবা নিরঞ্জনদা কি? কলকাতা শহরে মানুষ যত বাড়ছে ক্রাইমরেটও তেমনি হু হু করে বেড়ে চলেছে। মার্ডার, রেপ, ব্যাঙ্ক ডাকাতি আকছার ঘটে যাচ্ছে এখানে। সেরকমই কি কিছু একটা ঘটনা: খুন টুন হলেই সমরেশকে তৎক্ষণাৎ ছুটতে হয়—তা সে মাঝরাতই হোক কি ভরদুপুরই হোক।

এত রাতে জয়ন্তী যখন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই সময় খবরের সন্ধানে বেরুবার চিন্তাটা সমরেশের মেজাজ খারাপ করে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয় সে একজন জার্নালিস্ট। খবরের গন্ধ পাওয়া-মাত্র ধাওয়া করে যাওয়া তার ডিউটি। পায়ে পায়ে সে ড্রইং রুমে চলে আসে, কেননা তাদের টেলিফোনটা ওখানেই থাকে।

ফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে সুচিত্রার গলা ভেসে আসে। এই মুহূর্তে তার কথা মাথায় ছিল না সমরেশের বেশ অবাকই হয়ে যায় সে, বলে, 'তুই! এই রাত সাড়ে বারোটায়!'

'হ্যাঁ, আমিই।' সুচিত্রা বলে, 'বিশেষ দরকারে ফোনটা করতে হল।'

'এখনও তুই জেগে আছিস! কাল কেস আছে বুঝি? তার পেপার টেপার রেডি করছিস?'

সমরেশ জানে না ইদানীং কিছুদিন ধরে রাতের পর রাত বিনিদ্র কেটে যাচ্ছে সুচিত্রার। তার ঘরের জানলার কাছে বসে তারায়-ভরা আকাশের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সময় কিভাবে কেটে যায় খেয়াল থাকে না।

সমরেশের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুচিত্রা বলে, 'কাল সকাল ন'টা, সাড়ে ন'টায় তোদের ওখানে যাব। ফ্ল্যাটেই থাকিস।'

'কী ব্যাপার ?'

'তখনই বলব।'

সমরেশকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দেয় সুচিত্রা।

পরের দিন ন'টার একটু পরেই সুচিত্রা সমরেশদের ফ্ল্যাটে চলে আসে।

সমরেশ তার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আজকের লেট সিটি এডিসানের কয়েকটা কাগজ দেখছিল। দেখছিলই শুধু, কিন্তু খবর, এডিটোরিয়াল, স্পেশাল আর্টিকল বা চিঠিপত্র কিছুই তার মাথায় ঢুকছিল না। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের টেনশান চলছে। সুচিত্রা এ বাড়িতে প্রায় রোজই আসে কিন্তু মাঝরাতে ফোন করে আগেভাগে জানিয়ে দিয়ে কখনও আসেনি। নিশ্চয়ই প্রচণ্ড জরুরি কোনো কাজ আছে। সেটা না জানা পর্যন্ত রীতিমত অস্বস্তিই বোধ করছে।

কলকাতার বাংলা ইংরেজি সব কাগজই সমরেশ পায়। এজন্য কোম্পানি দাম দিয়ে দেয়। অন্য কাগজ বাড়তি নিউজ কিছু দিল কিনা, কোন কোন বিষয়ে কোন কোন কাগজ তাদের টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসব সকালেই জেনে নিতে হয়। কেননা, বিকেলের দিকে যখন এডিটোরিয়াল বোর্ডের মীটিং বসে, এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে চুলচেরা আলোচনা হয়। পরের দিনের কাগজে এই খামতিগুলো যাতে শুধরে নেওয়া যায়, তাই তৎক্ষণাৎ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তার ব্যবস্থা করে ফেলা হয়।

কয়েকটা কাগজ সমরেশের কাছে রয়েছে। বাকিগুলো নিয়ে ব্যালকনিতে বসেছেন হিরণ্ময়ী। রোজ প্রতিটি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

রান্নাঘরে লক্ষ্মী তাতানো কড়ায় আনাজ টানাজ কিছু বুঝি ছাড়ছে। তার ছ্যাঁক ছোঁক আওয়াজ ভেসে আসছে।

পায়ের শব্দে কাত হয়ে দরজার দিকে তাকায় সমরেশ। ততক্ষণে সুচিত্রা ঘরে ঢুকে পড়েছে। সে বলে, 'কী ব্যাপার, শুয়ে আছিস! শরীর খারাপ নাকি ?'

ব্যস্তভাবে উঠে বসতে বসতে সমরেশ বলে, 'আরে না না, এমনিই। কাগজ পড়ছিলাম। বো'স—'

ঘরের এককোণে লেখার জন্য টেবিল চেয়ার রয়েছে। চেয়ারটা টেনে সমরেশের খাটের কাছে এসে সুচিত্রা বসে পড়ে।

সমরেশ একটু হেসে বলে, 'সমস্ত রাত নাকে বঁড়শি আটকে সাসপেন্সে রেখেছিস। এখন দয়া করে বলে ফ্যাল তোর জরুরি কাজটা কী।'

কোনোরকম ভণিতা না করে সুচিত্রা বলে, 'জয়তী সম্পর্কে তোর একটা ডিসিশান নেওয়া উচিত।' একটু থেমে সোজা সমরেশের দিকে তাকিয়ে একটু নিচু গলায় এবার বলে, 'আমার ধারণা মনে মনে তুই ডিসিশানটা নিয়েও ফেলেছিস কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছিস না।'

সমরেশ একটু চমকে ওঠে। সুচিত্রা কোন সিদ্ধান্তের কথা বলছে তা আন্দাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে না। স্থির চোখে সুচিত্রাকে সে লক্ষ করতে থাকে।

সুচিত্রা এবার বলে, 'ক'দিন ধরে জয়তীর ভবিষ্যৎ আর সিকিউরিটির কথা আমি চিন্তা করেছি। তাকে বাঁচানোর একটা মাত্র পথ খোলা আছে।'

জোরে শ্বাস টানে সমরেশ। রুদ্ধ গলায় বলে, 'কী পথ?'

'তুই ওকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে আয়।' বলতে বলতে সমরেশের একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের দুই করতলে ব্যগ্রভাবে ধরে থাকে।

সমরেশ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, উত্তর দেয় না।

সুচিত্রা তার চোখ থেকে চোখ সরায়নি। গম্ভীর গলায় বলে, 'কী, তুই এই কথাটাই ক'দিন ধরে ভাবছিস-না?'

মেয়েটা কি অন্তর্যামী? না, আজকাল মুখ দেখে মনের কথা পড়ার মতো কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে। ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে মাথা নাড়ে সমরেশ।

সুচিত্রা থামেনি, 'জীবনে তোদের জন্যে জয়তীর অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এখন যদি তুই ওর দিকে হাত না বাড়িয়ে দিস মেয়েটা শেষ হয়ে যাবে।'

আধফোটা গলায় সমরেশ বলে, 'কিন্তু—'

'কী?'

'মা কি রাজী হবে?'

'সে দায়িত্ব আমার।'

'তা ছাড়া—'

'কী ?'

ফের মুখ তোলে সমরেশ। পরিপূর্ণ চোখে সুচিত্রার মুখের দিকে তাকায়। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে, গলায় স্বর ফোটে না, ঠোঁট দুটো থর থর করে শুধু।

সুচিত্রার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে অসংখ্য ঢেউ ওঠে যেন। অদ্ভুত একটা কষ্ট ডেলা পাকিয়ে অস্তিত্বের কোন অচেনা প্রান্ত থেকে উঠে আসে। তার মনে হয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। চোখের কোণ দুটি তার চিক চিক করতে থাকে।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরই দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুচিত্রা। বলে, 'আমি মাসিমার কাছে যাচ্ছি '।

সমরেশ নিজের অজান্তেই বুঝি সুচিত্রাকে আটকানোর জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু তার আগেই ব্যালকনিতে চলে গেছে সে।

কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তার পর আসল প্রসঙ্গে চলে আসে সুচিত্রা। সব শুনে চমকে ওঠেন হিরণ্ময়ী। বলেন, 'কী বলছিস তুই! সমুর সঙ্গে জয়তীর বিয়ে দেবো!'

সুচিত্রা বলে, 'সেটাই তো ঠিক কাজ মাসিমা।'

'যে মেয়ের মাথার ওপর খুনের মামলা, তাকে ছেলের বউ করে ঘরে আনব! লোকে কী বলবে ?'

'খুন ও করেনি।'

'নিশানাথবাবুর ওপর গুলি তো চালিয়েছিল। ভদ্রলোক তখনই মরে যেতে পারতেন।'

'মরেননি তো।'

'দ্যাখ মা, জয়তীর ওপর আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কিন্তু পুত্রবধূ হিসেবে ওকে আমি ভাবতে পারি না।' হিরণ্ময়ী বলতে থাকেন, 'খুনের আসামীকে ঘরের বউ করে আনলে লোকে আমার গায়ে থুতু দেবে।'

মুখটা একটু কঠোর হয়ে ওঠে সুচিত্রার। সে বলে, 'এমন একদিন ছিল যখন সমরেশ ওকে বিয়ে করলে আপনি আপত্তি করতেন না।'

'কী করতাম আর না করতাম, এখন সে সব ভেবে লাভ নেই।'

'আজ জয়তী যেখানে পৌঁছেছে তার জন্যে আপনাদের দায়িত্ব খুব কম নয়। এখন তার সামান্য প্রায়শ্চিত্ত না হয় করলেনই।'

'কিন্তু—'

'বলুন মাসিমা—'

'সমু কি খুনীকে বিয়ে করতে রাজী হবে।'

'হবে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেই তো আপনার কাছে এলাম।'

কিছুক্ষণের জন্য ব্যালকনিতে স্তব্ধতা নেমে আসে। হিরণ্ময়ী এমনিতে নরম ধাতের মানুষ। ধীরে ধীরে নরম গলায় কথা বলেন। কিন্তু হঠাৎ মুখ শক্ত দেখায়। জিজ্ঞেস করেন, 'নিজের কথা একবারও ভেবে দেখেছিস?' তাঁর কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা ফুটে বেরোয়।

সুচিত্রা হকচকিয়ে যায়, 'আমার কথা!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এতদিন তুই আর সমু যে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছিস, তার পেছনে কী ছিল?'

'আপনি তো জানেন মাসিমা, সমু আমার বন্ধু।'

'বন্ধু!' হিরণ্ময়ী প্রায় চেঁচিয়েই ওঠেন, 'আমি অন্ধ? কিছুই আমি বুঝতে পারি না?'

দু হাতে হিরণ্ময়ীকে জড়িয়ে ধরে সুচিত্রা বলে, 'কিছু যদি বুঝেও থাকেন তা মনে করে রাখবেন না। সমুর মতো একজন বন্ধু পেয়ে আমি গর্বিত। একটা দুঃখী মেয়ের জন্যে ও যা করতে চলেছে সে মহত্ত্বের তুলনা নেই।'

'বোকা মেয়ে, মহত্ত্ব তো তোর। নিজের কী ক্ষতি করতে চলেছিস, একবার ভেবে দেখেছিস? এতগুলো বছর দু'জনে—'

হিরণ্ময়ীকে থামিয়ে সুচিত্রা বলে, 'পেছন ফিরে তাকাবার আর সময় নেই মাসিমা।' বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সে।

হিরণ্ময়ী ক্লান্ত স্বরে বলেন, 'আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।'

ব্যালকনি থেকে আবার সমরেশের কাছে ফিরে আসে সুচিত্রা। সমরেশ উন্মুখ হয়ে বসে ছিল।

সুচিত্রা বলে, 'আজ বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে বিয়ের কথাটা বলবি।'

হিরণ্ময়ীর সঙ্গে সুচিত্রার যে কথাবার্তা হয়েছে, সব শুনেছে সমরেশ। সে ব্যগ্রভাবে বলে, 'তুই যাবি না?'

'না। তোর একাই যাওয়া উচিত। আচ্ছা, এখন চলি। রাত্তিরে ফোন করে জয়তী কী বলল, জেনে নেবো। সমরেশকে আর কিছু বলার সময় না দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুচিত্রা।

বিকেলে পুলিশ হাসপাতালে এসে সমরেশ তার সিদ্ধান্তের কথাটা জানাতে জয়তী হকচকিয়ে যায়। জোরে জোরে মাথা নেড়ে সে বলতে থাকে, 'না না না না, এ হতে পারে না।'

গাঢ় মমতায় তার একটা হাত ধরে গভীর আবেগে সমরেশ বলে, 'পারে, পারে।'

'কিন্তু মাসিমা?'

'তাঁর আপত্তি নেই।'

'তিনি রাজী হয়েছেন?'

মা মত দিলেও যে তাঁর মধ্যে কিছুটা দ্বিধা রয়েছে, সেটা আর জানায় না সমরেশ। একটু চুপ করে থাকার পর বলে, 'হয়েছেন।'

হঠাৎ জয়তী জিজ্ঞেস করে, 'আর সুচিত্রা?'

'সে আমার সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু। সে সবার আগে মত দিয়েছে। তা ছাড়া মা যে রাজী হয়েছেন, সেটাও তারই জন্যে।' সমরেশ বলতে থাকে, 'বিয়ের সময় সুচিত্রাই হবে আমাদের প্রথম উইটনেস।'

দু হাতে মুখ ঢেকে জয়তী ঠিক হিরণ্ময়ীর মতোই বলে, 'আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।'

কিছুদিন বাদে জেল হাজতে সমরেশের সঙ্গে জয়তীর বিয়ে হয়ে যায়। ঠিক হয়, সমস্ত ব্যাপারটা আপাতত গোপন রাখা হবে। তাছাড়া কোনোরকম অনুষ্ঠানও করা হবে না।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সমরেশরা। সত্যিই তাদের বিয়ের প্রথম সাক্ষী সুচিত্রা এবং দ্বিতীয় সাক্ষী তাপস।

বিয়ের কয়েকদিন বাদে জামিন পেয়ে যায় জয়তী। কোর্ট থেকে সোজা ফ্ল্যাটে তাকে নিয়ে আসে সমরেশ।

এতদিন চাপা থাকলেও ব্যাপারটা এবার সামান্য জানাজানি হয়ে যায়। অন্য দুটো কাগজের দুই ক্রাইম রিপোর্টার গন্ধ শুঁকে শুঁকে তাদের ফ্ল্যাটে এসে ছেঁকে ধরে। অভিনন্দন জানাবার পর কিভাবে বিয়েটা সম্ভব হল, জানার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন করতে থাকে।

সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না সমরেশ। লাজুক মুখে দু-একটা জবাব দেয়। দৈনিক মহাভারত-এর জন্যও অজানা অকথিত কিছু তথ্য তো হাতে রাখতে হবে।

মিষ্টি টিষ্টি খেয়ে জয়তী এবং সমরেশের ছবি তুলে অন্য কাগজের রিপোর্টাররা চলে যেতে না যেতেই ভবতোষের ফোন আসে, 'কী খবর শুনছি? সত্যি নাকি অ্যাঁ?'

কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা যায়, লোকটার স্নায়ু একেবারে টান টান হয়ে আছে। সমরেশ বলে, হ্যাঁ দাদা, যা শুনেছেন হানড্রেড পারসেণ্ট ট্রু। মানে—'

'তুমি নাকি অন্য সব কাগজের লোককে ইণ্টারভিউ দিয়েছ?'

'তেমন কিছু নয়। এই দু-একটা কথা—'

সমরেশকে থামিয়ে দিয়ে ভবতোষ বলেন, 'এটা কিরকম হল? আমাদের কাগজের তা হলে কী হবে? তোমার ওপর কতটা ডিপেণ্ড করি তা তুমি জানো। শেষটায় কি ডুবিয়ে ছাড়বে! এই রিপোর্ট অন্য পেপারে বেরিয়ে গেলে আমরা কোথায় দাঁড়াব, ক্যান ইউ ইমাজিন?'

সমরেশ বিব্রতভাবে বলে, 'ওদের টেন পারসেণ্টও বলিনি। আপনি রাজেন আর ভাস্করকে পাঠিয়ে দিন। আমি সবটা বলব। ভাস্কর ছবি তুলে নিয়ে যাবে।'

'এক কাজ কর না ভাই—'

'কী?'

'রিপোর্টটা তুমিই লিখে দাও না।'

'তাই কখনও হয় দাদা! নিজের বিয়ের রিপোর্ট আমি লিখব, সেটা ভীষণ খারাপ দেখাবে।

'ঠিক আছে, এক্ষুণি ওদের পাঠাচ্ছি। আরে, অভিনন্দনটাই জানানো হয় নি। 'কনগ্র্যাচুলেসন্স—'

'থ্যাংক ইউ ভবতোষদা।'

'এখন রাখছি। —না না, ছেড়ো না। নিরঞ্জন তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

'দিন।'

একটু পর নিরঞ্জনের গলা ভেসে আসে। অভিনন্দন জানিয়ে সে বলে, 'তুমি ভাই ক্রাইম রিপোর্টারের উপযুক্ত কামটাই করলা। এইর নাম

হইল বিয়া! ফাস্টো কিলাস। এতদিন রিপোর্ট লেইখা সেনসেসান ক্রিয়েট করছ। এইবার নিজেই সেনসেসানের নায়ক হইয়া গেলা।'

হাসতে হাসতে সমরেশ হলে, 'ফাইন বলেছেন দাদা।'

নিরঞ্জন বলে, 'হাসলে চলবে না। একদিন পুলাও মাংস না খাওয়াইলে ছাড়তে আছি না।'

'নিশ্চয়ই। জানেন তো জয়তীয় ঘাড়ের ওপর কী মারাত্মক কেস ঝুলছে। ওটার একটা সলিউসান হয়ে যাক, তারপর বিযে আব বউভাত, ও দুটো অকেসানের জন্যে দু'দিন খাওয়াব।'

'চমৎকার। বাইচা থাকো ভাই।'

সতেরো

জয়তীকে নিয়ে আসার পর সাত দিনের মধ্যে ভাড়াটে খুনীরা বার দুই সমবেশদের হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ে হানা দেয়। দু'বাবই তারা এসেছিল দুপুরের দিকে, যখন ফ্ল্যাটগুলোতে পুরুষেরা থাকে না, যে যার কাজে বেরিয়ে যায়। দু'বারই লিফটম্যান অজয়ের জন্য তারা কিছু করে উঠতে পারেনি। ওদের কথাবার্তায় সন্দেহ হওয়ায় গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে খানিকটা ওঠার পর এলোপাথাড়ি চাবি ঘুরিয়ে সে এমন কিছু করে ফেলে যে লিফটা বিকল হয়ে যায়। ততক্ষণে নানা ফ্লোরে কয়েকজন বাচ্চা কাচ্চাসুদ্ধ ওঠানামার জন্য জমা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর লিফটটা ঠিক হলে বেগতিক বুঝে খুনীরা দ্রুত উধাও হয়ে যায়।

অজয়ের কাছ থেকে খবর পেয়ে বাড়ির সামনে প্লেন ড্রেসের পুলিশ পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করে সমরেশ। মাঝে মাঝে তাপসও সাধারণ পোশাকে একটা বাইকে করে এসে খোঁজ খবর নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়বার হানা দেবার পর কিছুদিন নিজেদের গুটিয়ে রেখেছিল খুনীরা। তারপর একদিন দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি সময়ে আবার তারা আসে। যাতে চেনা না যায় তাই প্রতিবারই আলাদা আলাদা মেক-আপ নেয় তারা। এবারও নিয়েছিল কিন্তু অজয়ের চোখে ধুলো ছিটানো যায়নি। অবশ্য ওরা যখন সমরেশদের ফ্লোরের কাছা-কাছি এসে পড়েছে তখনই তাদের চিনতে পারে অজয়। সঙ্গে সঙ্গে লিফট থামিয়ে আবার নিচে নামার জন্য বোতাম টেপে সে।

ছদ্মবেশ সত্ত্বেও যে ধরা পড়ে গেছে খুনীরা তা টের পেয়ে যায়। একটা থুতনিতে ঝোপড়া দাড়িওলা লোক হিংস্র ভঙ্গিতে অজয়ের গলার কাছটা খামচে ধরে চাপা গলায় গর্জায়, 'এই হারামী, লিফট নিচে নামাচ্ছিস যে! ওপরে নিয়ে চল—'

অজয় চিৎকার করে ওঠে, 'বাঁচাও—বাঁচাও—'

লিফট বিদ্যুৎগতিতে নেমে চলেছে। হঠাৎ দ্বিতীয় ক্রিমিনালটা ধাঁ করে একটা ছুরি বার করে অজয়ের পেটে বসিয়ে দেয়। ফিনকি দিয়ে তাজা গরম রক্ত বেরিয়ে এসে দুই মার্ডারারের জামা আর চাপা ফুল প্যাণ্ট ভিজিয়ে দিতে থাকে। আর সমানে গোঙানির মতো কাতর আওয়াজ করতে করতে পেট চেপে ধরে নিচে পড়ে যায় অজয়।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লিফট গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে আসে। অজয়ের আর্ত চিৎকার শুনে কিছু লোক নানা ফ্লোরের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারা সিঁড়ি দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে নিচে নামতে থাকে। এক তলাতেও আরো অনেকে জমা হয়েছে। সবাই ভয়ঙ্কর কিছু একটা আন্দাজ করে ভীষণ চিৎকার করছিল।

এদিকে লিফট নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিমিনাল দুটো রিভলবার হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। জনতা তাদের দিকে দৌড়ে আসতে গিয়ে রিভলবার দেখে থমকে যায়। 'যে হারামী এগিয়ে আসবে, লাশ ফেলে দেবো।' খুনী দুটো শাসাতে শাসাতে রাস্তার দিকে ছোটে। সেখানে আগে থেকেই ওদের একটা জীপ দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে অপেক্ষা করছিল। ওরা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জীপটা ঝড়ের বেগে ছুটতে থাকে।

তাপস এই সময় তার মোটর বাইকে সমরেশদের বাড়ির পাহারাদারি তদারক করতে আসছিল। লোকজনের হইচই শুনে আন্দাজ করে নেয়, জীপে করে ক্রিমিনালরা পালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মোটর বাইকের মুখ ঘুরিয়ে সে তাদের পিছু নেয়।

কলকাতার রাস্তা দিয়ে মরিয়া হয়ে জীপ চালাচ্ছে ক্রিমিনালরা, তাপস এক পলকের জন্য তাদের চোখের আড়াল হতে দিচ্ছে না। এদিকে পুলিশের একটা পেট্রল ভ্যান ডান দিকের একটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসছিল। চিৎকার করে তাপস সেটাকে তার সঙ্গ নিতে বলে। এখন জিপের পেছনে একটা মোটর বাইক আর একটা কালো রংয়ের ভ্যান।

সেটায় রয়েছে সাত আটটা আর্মড গার্ড।

এই দমবন্ধ করা ভয়াবহ ঘটনাটা যখন ঘটে, সমরেশ তখন তার ফ্ল্যাটে ছিল না, ব্যাঙ্কে গিয়েছিল। এর মধ্যে ফ্ল্যাট বাড়ির লোকেরা অজয়কে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এসে সব শুনে প্রথমেই সে দৌড়য় হাসপাতালে। সেখানে অজয়ের পেটে অপারেশন করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। ডাক্তার জানায়, প্রাণের আশংকা নেই। তবে বেশ কিছুদিন তাকে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে।

হাসপাতাল থেকে সোজা থানায় চলে যায় সমরেশ। সে জানে একসময় না একসময় তাপস ওখানে ফিরবেই। যতক্ষণ না ফিরছে সে অপেক্ষা করবে।

চার ঘণ্টা বসে থাকার পর তাপস সেই মার্ডারার দুটোকে নিয়ে ফেরে। সেই সঙ্গে দশ বারটি অসুস্থ, রুগ্ণ কিশোর—সবার বয়স বারো থেকে সতেরোর মধ্যে। তাদের মধ্যে জয়তীর ভাই বিশুও রয়েছে।

তাপস জানায়, ক্রিমিনাল দুটো জয়তীকে খুন করতে এসেছিল। অজয়কে জখম করে পালিয়েও যাচ্ছিল কিন্তু তাপস এসে পড়ায় এবং পুলিশের পেট্রল ভ্যানের সাহায্য পেয়ে যাওয়ায় ওরা ধরা পড়ে গেছে।

মার্ডারার দুটির নাম অখিল আর ঘটা। টাকা পেলে ওরা না পারে এমন কাজ নেই। ওদের নামে সাত আটটা করে খুনের চার্জ।

অখিলদের স্বীকারোক্তি থেকেই হাওড়ার এক পরিত্যক্ত গুদাম থেকে বিশুদের উদ্ধার করা হয়েছে। এই উদ্ধারের সূত্রে যে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি পাওয়া গেছে তা এইরকম। প্রতাপচাঁদ আগরওয়াল বিশু এবং অন ছেলেদের বিভিন্ন অনাথ আশ্রম থেকে অ্যাডপ্ট করে এনেছিল। আপাতত যেটুকু জানা গেছে বিশুদের ওপর অপারেশন চালিয়ে তাদের তাজা হার্ট, লাংস, কিডনি বার করে নিয়ে অন্যের শরীরে লাগানো হয়েছে। চড়া দামে এই সব অসহায় কিশোরের সতেজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতাপচাঁদ বেচে আসছে। এটাই তার ব্যবসা। মেডিক্যাল চেক-আপ করলে বোঝা যাবে, বিশুদের কার কতটা ক্ষতি হয়েছে।

তাপস বলে, 'এখন আর বসার সময় নেই সমরেশ। এখনই আরেক জায়গায় আমাদের রেইড করতে যেতে হবে।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ?'

'অখিলদের কাছে প্রতাপচাঁদের আসল ঠিকানাটা পাওয়া গেছে। আপাতত সেখানে হানা দেবো। দেরি করলে চিড়িয়া উড়ে যাবে। আই থিংক স্যাটান মাস্ট বী ইন টেইনস দিস টাইম।'

'আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই।'

'নো প্রবলেম। চল।'

কিছুক্ষণ পর এক ভ্যান বোঝাই আর্মড ফোর্স নিয়ে তাপসরা বেরিয়ে পড়ে। বিয়ট রোডের একটা বাড়ি থেকে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে প্রতাপচাঁদকে ধরে আনা হয়। অখিলরা তার সঠিক ঠিকানাটাই দিয়েছিল।

আঠার

এরপর বছর দেড়েক ধরে কেস চলে। একটা মামলার আসামী প্রতাপচাঁদ আগরওয়াল এবং তার ভাড়াটে খুনীরা। দ্বিতীয়টির আসামী জয়তী। তবে প্রতাপচাঁদ ধরা পড়ায় জয়তীর অপরাধের গুরুত্ব অনেকটাই কমে গেছে। তবু নিশানাথ সামন্তকে খুনের জন্য যে গুলি ছুঁড়েছিল, সেটা তো মিথ্যে নয়।

জয়তীকে বাঁচাবার জন্য নানা জোরালো যুক্তি খাড়া করে সুচিত্রা। সে যে নিদারুণ মানসিক বিপর্যয়ের কারণে গুলি ছুঁড়েছিল, সেটা প্রমাণ করে দেয়। তবু জজ তাকে ছ'মাস কারাবাসের শাস্তি দেন।

প্রতাপচাঁদকে এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের যাবজ্জীবন জেলের সাজা দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করে। ফলে তাদের কেস আপাতত চালু থাকে।

রায় বেরুবার পর কোর্ট থেকেই পুলিশ জয়তীকে তাদের ভ্যানে তুলে জেলে নিয়ে যায়। একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করেছিল সমরেশ। সেই গাড়িতে সুচিত্রা আর হিরণ্ময়ীকে নিয়ে সে-ও জয়তীদের গাড়ির পেছন পেছন যায়।

জেল গেটের সামনে গাড়ি দুটো থামার পর সবাই নেমে পড়ে। জয়তী হিরণ্ময়ীর কাছে এসে প্রণাম করে যখন উঠে দাঁড়ায় তার দু চোখ জলে ভরে গেছে।

কেউ কিছু বলে না। শুধু কাঁপা কাঁপা শিথিল হাত জয়তীর মাথায় রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন হিরণ্ময়ী। কাঁপা গলায় কী বলেন কিছুই বোঝা যায় না।

এরপর সুচিত্রার কাছে এসে দাঁড়ায় জয়তী। সুচিত্রা তাকে দু হাতে বুকের ভেতর টেনে নেয়।

যে পুলিশ অফিসার জয়তীকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি পাশ থেকে বলেন, 'আর দেরি করবেন না।'

সুচিত্রার বুকের ভেতর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে স্থির সজল চোখে কয়েক পলক সমরেশের দিকে তাকিয়ে থাকে জয়তী। তারপর একটা কথাও না বলে আস্তে আস্তে জেল গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

স্ত্রীর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সমরেশ শুধু বলে, 'ছটা তো মাস। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা রোজ এসে তোমাকে দেখে যাব।'

একসময় গেটের ওধারে চলে যায় জয়তী। এপাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সমরেশ।